KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : 20 কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা |
| Collection : KLMLGK | Publisher : |
| Title : সমালোচনী | Size : 4.5"x7" 11.43 x 17.78 c.m. |
| Vol. & Number : ৩/১-১২ | Year of Publication : ১৩১১ |
| | Condition : Brittle ✓ Good |
| Editor : | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

# সমালোচনী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

( মাসিক পত্র )

৩য় বর্ষ।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।
১৩১১।

## ৩য় বর্ষের লেখক লেখিকাগণের নাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনারায়ণ রায়। শ্রীযুক্ত অপ্রকটচন্দ্র শঙ্কর। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

---

## সূচী।


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অর্ঘ্য ... ... ... | ২৬৩ |
| অনুনয় ... ... ... | ২৯০ |
| আটকৌড়ে ও আইবড় ... ... | ২৭৫ |
| আদমনন্দন ... ... ... | ২৪ |
| আলোচনা ... ... ... | ২৭৩ |
| আশীর্ব্বাদ ... ... ... | ২৬৩ |
| একটি তারকা ... ... ... | ১৯২ |
| এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান ... ... | ১৪৬ |
| কলিকাতা ... ... ... | ৩৩ |
| কবির প্রতি ... ... ... | ৩৫৩ |
| কবির ফুল ... ... ... | ৬৫ |
| কবিতার উপাদান ... ... | ৫৯ |
| কাব্য ... ... ... | ১৪২ |
| কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রণালী ... ... | ১৯৫, ২৪৩ |
| গুপ্ত তত্ত্ব ... ... ... | ২৬৪ |
| জাতীয় সঙ্গীত ... ... ... | ২৩৩ |
| জাপান প্রবাসীর পত্র ... ... | ১২৭ |
| ডাক্তার সরকারের জীবনী ... ... | ৬৭, ৯৯ |
| তুমি ও আমি ... ... ... | ২৭৪ |
| তুমি ও সে ... ... ... | ৩৩০ |
| নিত্য প্রেম ... ... ... | ৩৮০ |
| প্রথম বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ... ... | ২৮৪ |

প্রবাসে ... ... ... ১৭১
প্রার্থনা ... ... ... ৩৬৭
পূর্ণিমা রাত্রে ... ... ... ২৫৮
ভীষ্ম ... ... ... ২১১
মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব ... ... ৪২
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ... ... ৩৭৪
বাঙ্গালীর বীরত্ব ... ... ... ৫১
বাল্মীকির কবিত্ব ... ... ১
বিশ্বামিত্র আখ্যায়িকা ... ... ১৫৭
বৈধব্য ... ... ... ৩৫
ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার ... ... ১৬৬
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন্ বঙ্গসমাজ ... ১১
লিপি প্রণালী ... ... ... ১৩৬
শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবকবি ... ২৬৭, ২৯১, ৩৩৬, ৩৭৮
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ... ... ৮৫, ১১৪
সৎ মা ... ৯৫, ১২০, ১৫২, ১৭৩, ২২৭, ২৫৯, ৩০৯, ৩২৩
৺ সতীশচন্দ্র রায় ... ... ১২৬
সমালোচনা ... ... ৩২১, ৩৫৪, ৩৮৬
সমালোচনার ধারা ... ... ২২১
সংযম শিক্ষা ... ... ... ৩৩১
সাময়িক প্রসঙ্গ ... ... ... ২৩৬
সাহিত্যে সমালোচক ... ... ৩১৪
স্মৃতি ... ... ... ১৪৫
হকিকৎরাও ... ... ... ১৮১
হীরার কণ্ঠী ... ... ... ৩৫৬



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯


# সমালোচনী।


তৃতীয় বর্ষ। } ১৩১১। { ১ম সংখ্যা।


## বাল্মীকির কবিত্ব।

বাল্মীকি একান্ত নির্ভীক কবি; তিনি কল্পনার সাহায্যে কয়েকটি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিতে সংকল্প করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন নাই। তাঁহার রাম-চরিত্র বিশাল ও মহিমান্বিত; কিন্তু এই বিশালত্ব ও মহিমা পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে কোনরূপ সাবধানতাই অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। সীতাহরণের পর মনের কষ্ট সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাম "সকামা সুখিনী ভব কৈকেয়ী" বলিয়া কৈকয়ীর উদ্দেশ্যে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; সীতা লঙ্কাপুরীতে অশোকবন হইতে উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিতা ও মহার্ঘ অম্বরপরিবৃতা হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমাকে দিয়া আমার কার্য্য নাই;—তুমি বিভীষণ, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব কিম্বা ভরত, ইঁহাদের যাহাকে ইচ্ছা ভজনা করিতে পার।' সীতাদেবী উত্তরে বলিলেন "আর্য্য, আপনি ইতর ব্যক্তির ন্যায় কথা কহিতেছেন কেন?" সুতরাং কবি বিলক্ষণ জানিতেন, এইরূপ অপভাষা রামচন্দ্রের অযোগ্য, তথাপি তিনি রামের একটি বিশুদ্ধ এবং ভদ্র সংস্করণ দিতে ভুলিয়া গেলেন কেন? লক্ষ্মণকে দিয়া তিনি বেদবিধিবির্গহিত কত কথাই

বলাইয়াছেন—"হনিষ্যে পিতরং কৈকয্যাসক্তমানসম্।"—"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।"—"কৈকীয়ঞ্চ বধিষ্যামি"—সুতরাং পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা এ সকলের জন্যই তিনি প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহার এক একটি কথা শুনিলে ধর্ম্মভীরু হিন্দু সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত, অথচ কবি এ সকল কিছুমাত্র গণ্য করেন নাই এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ সকল সত্বেও, লক্ষ্মণ আমাদিগের নিকট চির-পূজ্য বিশাল আত্মত্যাগের জীবন্তমূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছেন। কৌশল্যার মত পতি-দেবতা সাধ্বী রমণীও দশরথকে রামের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা।"

সীতার ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রীর মুখে "কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা যে মিথিলাধিপঃ। রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রীয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥" এরূপ কথা কেমন মনে হয়? এবং এই আদর্শরমণী দণ্ডকারণ্যে লক্ষ্মণের প্রতি যেরূপ অনুচিত ও অক্ষমণীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই। এই সকল খুঁত ধরিতে চাহিলে অনেক আছে কিন্তু এই সমস্ত খুঁত যত্ন পূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়া যাঁহারা বেশী আলোচনা করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের জন্য একটি শ্লোক আছে—"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

বাস্তবিক, বাল্মীকি তাঁহার চরিত্রগুলিকে সমালোচকগণের হাত হইতে আদৌ বাঁচাইবার চেষ্টা পান নাই। সে সকল চিত্র তাঁহার কল্পনা-সৃষ্ট নহে—উহারা যেন তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল, এই জন্যই তাহার কাব্যের সর্ব্বত্র এক অসম্ভব নির্ভীকতা দৃষ্ট হয়; কল্পনা-গড়া চিত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে শ্রীসম্পন্ন করিবার জন্য কিছু না কিছু অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতেন। আদিকাণ্ডে লিখিত আছে, নারদ ঋষি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাল্মীকিকে প্রদান করিয়া গেলে পরে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন, তখন তপশ্চরণবিকশিত অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি মন-



শ্চক্ষে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, রামায়ণের সমস্ত ঘটনা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল;—

"হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্
ততঃ পশ্যতি ধর্ম্মাত্মা তৎসর্ব্বং যোগমাস্থিতঃ
পুরা যত্তত্র নির্ব্বৃত্তং পানাবমলকং যথা।"

তিনি রামায়ণের বিচিত্র ঘটনাবলী করস্থিত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিলেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে তাঁহার চিত্রগুলি এরূপ জীবন্ত! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ কাল্পনিক নহেন—তাঁহারা দর্শক।

বাল্মীকিবর্ণিত চরিত্রগুলির বেদনা বোধ, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম সকলই আমাদের মত অথচ তাঁহারা বিশাল নৈতিকগুণ সমন্বিত। তিনি ধ্যাননির্ম্মল চক্ষে যাহা দেখিতেছিলেন তাঁহার লেখনী একটি যন্ত্রের মত তাহা চিত্রিত করিয়া যাইতেছিল; এ কথাটি কিরূপ হইল, এই স্থলটি একটুকু সংশোধন করিলে বুঝি ভাল হইত, এ সকল বিষয় তিনি চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই, কারণ চিন্তা ও বিবেচনা পূর্ব্বক এই কাব্য রচিত হয় নাই। কোন মূর্ত্তির মুখপ্রান্তে যদি একটা আঁচিল থাকে, তবে চিত্রকর তাহা বাদ দিয়া প্রতিকৃতি আঁকেন না, বাল্মীকি ও তদ্রূপ সজীব প্রাণী আঁকিতে যাইয়া তাঁহাদের অবস্থা বিশেষে উপযোগী বাক্য গুলি কোনস্থানে একটু শ্রীশূন্য হইলেও তাহা বাদ দিয়া যান নাই। ভানুমতির তিলটি পর্য্যন্ত যেন চিত্রপটে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

নাটক ও কাব্য দুই স্বতন্ত্র সামগ্রী। গ্রীসদেশীয় রীতি অনুসারে নাটকের ঘটনা তিন দিনের বেশী ব্যাপক হইবে না, এই তিন দিনে কোন একটি বিশেষ ঘটনার উত্তেজনায় মানবচরিত্র ঠিক এক রকমটি থাকিতে পারে, কিন্তু চৌদ্দ বৎসর কি ততোধিক কাল ব্যাপিয়া যে ঘটনার প্রসার, তাহাতে আদর্শ চরিত্রগুলি যদি সর্ব্বদাই ফুল সম কথাই

বলিতে থাকেন এবং ধরণী-গাত্রের ন্যায় অবিরত উৎপীড়ন ও কশাঘাত সহ্য করিয়া মৌনী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা রক্তমাংসধারী পাঠক-মণ্ডলীর সহানুভূতি হইতে একান্ত বিচ্যুত হইবার কথা। রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রগুলির সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ প্রদর্শিত হয়, সেগুলির একটা ব্যাখ্যা সহজে হইতে পারে, এবং সেই সকল নিন্দিত কার্য্যকলাপ বাদ দিলে কোন্ কোন্ স্থলে চরিত্রগুলি অঙ্গহীন হইয়া পড়িত, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এখন আমরা রামায়ণের নীতির বিষয় লইয়া একটুকু আলোচনা করিব। অনেকে মনে করেন কাব্য ও নীতির এলাকা ভিন্ন ভিন্ন। স্বভাব যেন কবিকে একান্ত উচ্ছৃঙ্খল করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন, উঁহার কোন শাসনের প্রয়োজন নাই,—সৌন্দর্য্য যেন জগতের নিতান্তই আব-দারের জিনিষ, উহার সমস্ত ভঙ্গীই ক্ষমার্হ। নীতিকারকে আমরা সাবধান করি, ঐ স্থানে তোমার শাসন খাটিবে না, ঐ স্থানে সৌন্দর্য্যের লীলা হইতেছে; সুন্দর যেখানে দাঁড়াইবে, সেই খানেই রাজত্ব করিবে, সে একান্তরূপে স্বেচ্ছাতন্ত্র, সে নিজের নিয়মে চলে, পরের শাসন গ্রাহ্য করে না; সে যদি কাদা খুঁড়ে, তাহা হইতে মুক্তা বাহির হয়, সে যদি কুকথা বলে, কণ্ঠস্বরের মোহিণীতে তাহা চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলে, আমরা নীতি ও রুচিকে সমাজ শাসন করিতে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়া সৌন্দর্য্যের পায় নিগড় পরাইতে নিষেধ করি।

কিন্তু উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট নীতির যে সমন্বয় হইতে পারে, তাহা আমরা রামায়ণ পড়িয়া বুঝিতে পারি। সাধু সংসর্গে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং পুণ্য কার্য্যের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। কবি যদি সাধু হন, তবে তাঁহার কাব্য পড়িয়াও হৃদয়ে সেইরূপ ধর্ম্মভাব প্রবল হইবে। কবিতাপদ্ম যে সর্ব্বদাই কুরুচির পঙ্কে জন্মাইবে, এ ধারণা এখনও এক শ্রেণীর পাঠকের মনে বদ্ধমূল আছে, আদিরস



যে অতি নির্ম্মল রস ইহা দেবগণের উপভোগ্য হইতে পারে, ইহা অনেক তথা-কথিত আদিরসের রসিক বিশ্বাস করেন না।

অনেক কবির কাব্যে দৃষ্ট হয়, পাপের চিত্রগুলি রম্য হইয়া উঠি-য়াছে,—পার্শ্বে পুণ্যের চিত্রগুলি পুঁথি-পড়া শ্লোকের সাত নকলের মত নিতান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়া আছে; সেই সকল কাব্যে হয়ত পাপের উৎকৃষ্ট দণ্ডও শেষ অধ্যায় হইতে বাদ পড়ে নাই, তথাপি পুস্তক পাঠান্তে পাপের ছবিগুলির প্রতিই মন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে। যে সকল জিনিষের প্রতি ঘৃণা জন্মান আবশ্যক, তাহাদের প্রতি যিনি এই প্রকার অনুরাগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য-কৌশলের আমরা সুখ্যাতি করিতে পারি না—কাব্যের এই গণিকা বৃত্তিতে বাহা-দুরী—কিছুই নাই; উহা দেখিয়া মনে হয় কবি অন্তর্জাগতিক তত্ত্ব ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধে ভালরূপ অনুভব করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার বিচার-শক্তি তেমন বিকাশ পায় নাই যে, তিনি ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দের মতন করিয়া দেখাইতে পারেন। তাঁহাদের অনেকে বাস্তবের দোহাই দিয়া বলেন, স্বভাব-অঙ্কনেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বভাবে হিমালয়ও আছে স্বভাবে এড়ণ্ড বৃক্ষও আছে স্বভাবের সকল জিনিষই কবির দর্শনীয় নহে—সংসারের সকল সুখই কাব্যের বিষয়োপযোগী নহে। যে সকল সুখ দূর হইতে আহ্বান করিয়া শেষে জীবনটি দগ্ধ করিয়া ফেলে, স্বভাবজ্ঞ ব্যক্তি সেই সুখকে ভয়ের চক্ষে দেখিবেন; আগুণ আঁকিতে যাইয়া যিনি ফুলের ছবি আঁকিবেন, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে পরিচয় এমন কি কবিত্বশক্তিরও আমরা প্রশংসা করিতে পারি না; সেই চিত্রে আকৃষ্ট হইয়া হয়ত অনেক নির্ব্বোধ পতঙ্গ পুড়িয়া মরিবে। দৈবশক্তি সম্পন্ন কবিকে এইরূপ মিথ্যা সুখের দালাল হইয়া বাক্‌চাতুরী বিস্তার করিতে দেখিলে আমাদের বড় কষ্ট হয়। পাপের চিত্র পুণ্যের চিত্রের পার্শ্বেই অঙ্কিত হইয়া থাকে, কিন্তু পুণ্যকে খর্ব্ব

করিয়া পাপের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন শক্তিহীনতার পরিচায়ক মাত্র। রাবণ সীতাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল,—কোন বড় উপন্যাসের নায়ক, উপাস্য নায়িকাকে অবাধে তাহা বলিতে পারিতেন; রাবণের মধ্যে Gallantryর কিছু মাত্র অভাব ছিল না।

"সীতা তোমার পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ খানি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, তোমার স্নিগ্ধ পাদযুগ্ম আমার মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিতেছি,—আমাকে বশীভূত সেবক বলিয়া জান এবং আমার প্রতি প্রসন্না হও *,—আমি তোমাকে বৃথা ভুলাইবার জন্য শূন্য বাক্য বলিতেছি না—রাবণ ইতি-পূর্ব্বে আর কোন রমণীর পদে প্রণাম করে নাই।" † এমন কি শূর্পনখার ন্যায় নায়িকাও রামকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য উচ্চ অঙ্গের কবিত্বপূর্ণ প্রণয় জ্ঞাপন করিতে অশক্ত ছিল না—"ততঃ পর্ব্বতশৃঙ্গানি বনানি বিবিধানি চ। পশ্যন্ সহ ময়া কামী দণ্ডকান বিচরিষ্যসি।" ইত্যাদি কথায় তাহার প্রেমের দৌড় অনেকদূর প্রদর্শিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল সত্বেও শূর্পনখার স্বাধীন প্রেমের চেষ্টা এবং রাবণের Gallantry রামায়ণে অত্যন্ত নিগৃহীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। রামায়ণের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ রাবণ কিম্বা শূর্প-নখার স্বাধীন প্রেমের চর্চ্চা পছন্দ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, এই চরিত্রদ্বয়ের উপর অমিশ্র ঘৃণা, বর্ষিত হইতেছে। রাবণের শয্যাগৃহে, শত সুন্দরী পরিবৃত হইয়া কোজাগর-পরিশ্রান্ত রাজা ঘুমাইতেছিলেন —সেখানে অন্যান্য ভুজসূত্রসম্বদ্ধা নিদ্রিত রমণীবৃন্দকে কবি একবার "অন্যান্য ভুজ সূত্রেন স্রীমালা গ্রথিতা" বলিয়া যেন তাহাদের নীরব ভূষণ ও নূপুর লক্ষ্য করিয়া কবি পুনশ্চ "নিঃশব্দ হংস ভ্রমরং যথা

* এতৌ পাদৌ ময়া স্নিগ্ধৌ শিরোভিঃ পরিপীড়িতৌ,
প্রসাদং কুরুমে ক্ষিপ্রং বশ্যোদাসোঽহমস্মিতে।"

† ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিৎ মূর্দ্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেতহ।



পদ্মবনং মহৎ" প্রভৃতি ভাবের উপমা খুঁজিতেছিলেন এবং এই দৃশ্য পাঠকের চক্ষে প্রায় মনোহর হইয়া উঠিতেছিল, তখন সাধু কবির ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি একটি চূড়ান্ত উপমা দিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু পাঠককে বীভৎস রস হইতে সাবধান করিয়া দিলেন।

"তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতী মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ।"

বাস্তবিক রামায়ণের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, কবিত্ব ও সাধুত্ব এক স্থান হইতে উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক এবং এই দুয়ের সংযোগ মণি কাঞ্চন যোগের ন্যায় সুন্দর। "ন রাম পরদারান্ চক্ষুভ্যাং অপি পশ্যতি" প্রভৃতি কথায় রামচরিত্রের উপর এক মহিমান্বিত শ্রী পতিত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যার গুহালীন রাজধানীর অন্তঃপুরে রমণীগণের বিলাসমুখর কাঞ্চীর নিস্বন ও নূপুর শব্দ শুনিয়া লক্ষ্মণ "লজ্জিতোভবৎ"। হনুমান সীতাকে খুঁজিতে যাইয়া রাবণের রমণীবৃন্দকে প্রসুপ্ত অবস্থায় দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলেন—"জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্ম্ম সাধ্বসশঙ্কিতঃ। পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্। ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি।" এইরূপ দুএকটি ঈঙ্গিত বাক্যে রামায়ণ অপূর্ব্ব নিবৃত্তি-মূলক সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া আছে এবং সেই জন্যই এই কাব্য সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের সর্ব্বকালের পাঠযোগ্য থাকিবে।

কিন্তু পাপকে ঘৃণা করিয়া পাপীকে কৃপা করিবে—ইহাই সুনীতি। বাল্মীকি তাঁহার চরিত্রগুলির কার্য্যকলাপ উদার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, সময় বিশেষে মহাপাপীও তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, যাহার যাহা প্রাপ্য তিনি কোন অবস্থায়ই তাহা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হনুমানের মুখ দিয়া তিনি রাবণ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,— "রাবণ যুদ্ধার্থী বটে কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর, তিনি স্বচক্ষে সর্ব্বদা

সাবধানে নিজ বল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" বিভীষণ রামের নিকট বলিয়াছিলেন—"রাবণ বেদ-বেদান্ত-পারগ মহাতপা ও অগ্নি-হোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা।" সুতরাং যাহাকে বাল্মীকি দস্যু ও লম্পটরূপে কালির বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি স্বভাবতঃ বিদ্বিষ্ট নহেন, এই উদার সহানুভূতির ফলে রাম বনগমনের পর তিনি কৈকেয়ীকেও একস্থলে সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। —"কৈকেয়ী যশস্বিনী" কথা মহাকবির ব্যঙ্গ নহে। ঋষি কবি ব্যঙ্গ জানিতেন না। টেনিসন লিখিয়াছেন—"Mockery is the fume of little hearts."

আমরা নীতিসম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিয়া কাব্যাংশে বাল্মীকির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি। রামায়ণের প্রতি অধ্যায়েই অমর চিত্রপটের বিকাশ রহিয়াছে। অনেকগুলি দৃশ্য চিরদিনের জন্য মনে মুদ্রিত হইয়া যায়; যে স্থানে রাম সীতার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহাকে বনে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন—রামচন্দ্রের পরিরম্ভনাবদ্ধ বিষণ্ণ সাধ্বীর মণির ন্যায় সুন্দর অশ্রু একটি একটি করিয়া শুকাইতে লাগিল এবং রাম আদর করিয়া কণ্ঠলগ্না প্রণয়িণীকে বলিলেন, "ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপি অভিরোচয়ে" সেই চিত্রটি মনে পড়িতেছে—যেখানে চিত্রকূটের বিপুল অরণ্য পুষ্পসম্ভার লইয়া পথিকত্রয়কে আমন্ত্রণ করিতেছিল এবং শৈলোপকণ্ঠে মন্দাকিনী নদী স্খলৎকাঞ্চী মন্থরা রমণীর ন্যায় জঙ্ঘা হইতে অধিত্যকায় অবতরণ করিতেছিল,—রাম এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া সীতাকে বলিলেন—"তোমার সঙ্গে এই সুদৃশ্য স্থানে বিচরণ করিয়া অযোধ্যার রাজ্যসুখ আমার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হইতেছে", সেই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে যেন আমরা দৃশ্যগুলি চক্ষে দেখিতেছিলাম। ইঙ্গুদীমূলে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া সীতার উত্তরীয়স্খলিত স্বর্ণচূর্ণ



চিনিতে পারিলেন, অকস্মাৎ মৌনী হইয়া ভরত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক ডাকিয়া কোন সারা পাইল না, শোককরুণ ভরতের সেই মুহ্যমান দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে। বক্রকেশান্ত সুকেশী সীতার চূর্ণকুন্তলরাজি মুখের উপর দুলিতেছিল, তিনি সুন্দর গ্রীবা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া শিংশপাবৃক্ষে স্থিত হনুমানকে দেখিয়া অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, রামনাম শুনিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—"পঙ্কদিগ্ধেব পদ্মিনী বিভাতি ন বিভাতি চ" এইরূপ শত শত স্থলে রামায়ণকাব্যে হিন্দুস্থানের ভাবী মাইকেল এঞ্জোলো ও র‍্যাফেলগণের জন্য বিচিত্র চিত্রকল্পনার সুযোগ আছে। রামায়ণ পাঠকালে মহাকবি স্বয়ং অদৃশ্য তুলি ধারণ করিয়া অনিন্দ্য বর্ণ ও ছায়াপাতে পাঠকের মানসপটে নীরবে সেই সকল চিত্র অঙ্কিত করেন।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, বাল্মীকির রামায়ণ স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষদুষ্ট, কোন কোন বর্ণনা ছাটিয়া ফেলিলে মূল সৌন্দর্য্যের কোন হানি হইবে না, কোন কোন স্থানের বাহুল্য পাঠকের নিকট ক্লান্তিকর বোধ হইবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র একটি বাগানেই শিল্পীর হস্তস্পর্শের প্রয়োজন। আলঙ্কারিকগণের সূত্রগুলি দিনত্রয়ব্যাপী ঘটনার আখ্যান সম্বলিত নাটকাদির জন্যই বেশী উপযোগী। স্বভাবের বর্দ্ধিষ্ণুতা ও উপচয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর উপযোগী নহে, এজন্য অফল উদ্ভিদ উৎপাটন করিয়া, বহুমঞ্জরীশালী লতার অবান্তর গুচ্ছ ছাটিয়া মালী বাগানটি স্বভাবের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পরিণত করেন।

কিন্তু রামায়ণকাব্য কতকটা এদেশের হিমালয় দৃশ্যের ন্যায়। হয়ত কোনস্থলে বিপুল অরণ্যদৃশ্য বিরাজিত, তাহা হইতে দুএকটি বিশাল তমাল উৎপাটন করিলে কিছু হ্রাস করা গেল এরূপ মনে হইবে না।

হয়ত বহুসংখ্যক পুষ্পস্তবকের পার্শ্বে বহুসংখ্যক গলিত পত্র পড়িয়া আছে কিন্তু এখানে ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করার চেষ্টা বাতুলতা। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোভা নিরীক্ষণ যোগ্য নহে—উহারা স্বভাবেরই অঙ্গীভূত, সুতরাং এস্থলে শোধন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।

কবিত্বের এই মহৎ ঐশ্বর্য্য চিরকাল বিস্ময় উৎপাদন করিবে। ইহার বিরাটত্বে পাঠককে কবির অসীম শক্তির আভাস দিয়া আত্মহারা করিয়া ফেলিবে। ইহা কাটিয়া ছাটিয়া খাট করিবার জিনিষ নহে। এই কাব্যের গতিও কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত নহে। নির্দ্দিষ্ট সৈন্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পরিচালনা করা যায় কিন্তু পুরাকালীয় কোন মহা-সম্রাটের বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য যখন গ্রাম, বন, উপবন ও কান্তার পরিপূর্ণ করিয়া এক মহা সরিৎপতির ন্যায় বিশ্বের একার্দ্ধ পরিপ্লাবন করিত, তখন তাহাতে নিয়ম বা শৃঙ্খলা কোথায় থাকিত; তাহা হইতে দুএক সহস্র বিনষ্ট হইলেও কোন অনুভবযোগ্য ক্ষতির আশঙ্কা হইত না।

রামায়ণকাব্য সেইরূপ বিরাট, ইহা বাহিরের সূত্রের অপ্রমেয়, নিয়ম বা শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করিয়াই এই কাব্য মহান্। ইহা এত বিশাল যে ইহার অভ্যন্তর হইতে সূত্র নিষ্কাষণ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহা অন্য আদর্শের নিরপেক্ষ। ইহা সমালোচকের জন্য নহে—ভাষ্যকারের জন্য। ইহার চরিতার্থতা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসার উপর নির্ভর করে না, যুগ যুগ ব্যাপিয়া এই মহাকাব্য শত সহস্র ভক্তের হৃদয়ের পূজা পাইতেছে—পূজা ভিন্ন ইহার অন্য কোনরূপ সমালোচনা হইতে পারে না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

---



# রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রতি বৎসর যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহার অধিকাংশই কবিতা, উপন্যাস ও গল্পের বহি। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থেরই ভাষা উৎকৃষ্ট, রচনাপ্রণালী মনোহর, উহা কবিত্বাংশেও চিত্তাকর্ষক, এবং কাব্যামোদী ও উপন্যাসপ্রিয় পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতেও সক্ষম। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ আত্মোন্নতি-প্রয়াসী জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদিগের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ।

এই জন্য উত্তম কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা, অত্যুৎকৃষ্ট বাঁধানো কবিতা ও গল্পের বহিগুলির মধ্যে যখনই বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা" বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের "সিরাজউদ্দৌলা" বাবু নিখিলচন্দ্র রায়ের "মুরসিদাবাদ-কাহিনী" মাইকেল মধুসূদন দত্তের ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৌদ্ধধর্ম্ম" পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়ের "গীতা সমন্বয় ভাষ্য" প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় দু চারিখানি সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বাঙ্গলাভাষানুরাগী পাঠকদিগের আনন্দের আর সীমা থাকে না।

অল্পদিন হইল বাঙ্গলাভাষায় এই শ্রেণীর দুখানি শিক্ষাপ্রদ ও সুখ-পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত, দ্বিতীয়খানি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; আমরা "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পাঠ করিয়া যে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি, আজ সেই বিষয়েই কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে একালের লোকেরা ভাল করিয়া জানিতেন কি না, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু সেকালের সুশিক্ষিত ও দেশের অগ্রণী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচরণ সরকার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রায় দীনবন্ধু মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের তিনি যে কেবল বন্ধু ছিলেন, তাহা নয়; তাঁহারা সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চরিত্রবান্ সাধুপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন।

এই সাধুপুরুষ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় যে উৎকট সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ংই একজন বিপ্লবকারী যুবকদিগের অগ্রগণ্য হইয়া প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে কিরূপে যে শিশুর ন্যায় অপার্থিব সরলতা, দেবোপম নিষ্পাপ, সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমান ভাবে অনুরাগ ও প্রীতি, এবং সর্ব্বোপরি এক অতুলনীয় ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বর ভক্তি হৃদয়ে রক্ষা করিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টান, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবক, পুরুষ ও নারী,—এই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন, তাহা ভাবিলে বড়ই বিস্মিত হইতে হয়।

এ বিষয়ে স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিতলেখক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণনগর অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। কথাগুলি আমরা এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। শাস্ত্রী মহাশয় নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে প্রশ্ন করিলেন :—

প্রশ্ন। হাঁহে বাপু, তোমরা কি কৃষ্ণনগরের লোক?



উত্তর। আজ্ঞে কৃষ্ণনগরেরই বল্‌তে হবে, পাশের গ্রামের।

প্রশ্ন। তোমরা কি রামতনু লাহিড়ীকে জান?

উত্তর। কে? আমাদের লাহিড়ী বাবু? তাঁকে কে না জানে?

প্রশ্ন। তিনি কেমন মানুষ?

উত্তর। তিনি কি মানুষ? তিনি দেবতা।

প্রশ্ন। সে কিহে! পৈতাফেলা লোক, হাঁস মুরগী খান, দেবতা কেমন?

অমনি মানুষগুলি ফিরিয়া দাঁড়াইল। "কেগা মশাই, আপনি বুঝি এ দেশের মানুষ মন।"

"না বাপু, আমি এ দেশের মানুষ নই।"

উত্তর। ওঃ তাই ত আপনি ও সব বল্লেন, ও সব করা অন্যের পক্ষে দোষ, ওঁর পক্ষে দোষ নয়, উনি যা করেন তাই শোভা পায়।"

কেবল যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই অন্তরে এই ভক্তি পোষণ করিতেন তাহা নয়। মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি অন্তরে কিরূপ ভক্তি পোষণ করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য খ্যাতনামা লেখক রায় দীনবন্ধু মিত্রের রচনা হইতে গ্রন্থকার যে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা সেই কবিতাটি এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।

বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।"

কবি দীনবন্ধু যে বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।" ইহার এক বর্ণও কবির কল্পিত কথা নহে। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের ন্যায় যাঁহারা সাধু রামতনুর সংসর্গে একবার ও গিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের আদর্শ চরিত্রবান্ পুরুষ মনে করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

এই সাধু পুরুষ পঁচাশি বৎসর মর্ত্তধামে বাস করিয়া ১৮৯৮ সালের আগষ্ট মাসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। স্বর্গারোহণের পর ইহাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অথচ ইঁহার প্রতি ইঁহার ছাত্রদিগের এমনই ভক্তি যে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের তুল্য অনেক গণ্য মান্য হিন্দু সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং রামতনু বাবুর প্রিয়পাত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার একখানি জীবন চরিত রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুরোধে পড়িয়াই লাহিড়ী মহাশয়ের একখানি জীবন চরিত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন।

আমরা এই জীবনচরিত রচনার সংবাদ শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল ও উৎসুক চিত্তে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। আমাদের উৎফুল্ল হইবার কারণ এই যে, সাধুপুরুষের জীবন চরিত লিখিবার ভার উপযুক্ত লোকের হস্তেই অর্পিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন রামতনু বাবুর চরিত্রমাহাত্ম্য ও ধর্ম্মবিশ্বাসের গভীরতা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ আর কে পারিবে? উৎসুক হইবার কারণ এই যে, অমন সাধুপুরুষ—যাঁহার বিনয় ও সরলতাপূর্ণ পবিত্র



মুখচ্ছবি দেখিলে জীবন ধন্য মনে হইত, তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ করিতে পারিব।

বলিতে আনন্দ হয় যে, আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থখানি এতদিনে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও এই সুন্দর সুবৃহৎ গ্রন্থের অতি অল্পাংশেই লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহার সমসাময়িক সামাজিক ইতিবৃত্ত, ও তৎকালের খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত বর্ণিত হইয়াছে; তথাপি আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ ও প্রভূত শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

কারণ কোন উন্নত জীবনের সঙ্গে তৎকালের সামাজিক ঘটনা সকল, এবং সেই সকল ঘটনা সঙ্ঘটনকারী ব্যক্তি দিগের জীবন চরিত জানিতে পারিলে ঐ উন্নত জীবন বিকাশের ক্রম সম্বন্ধেও একটা ধারণা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের সময়ের সামাজিক ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল ও ঔৎসুক্যও নিতান্ত অল্প নহে। আমরা ইংরাজ রাজত্বের এই যে এক অভিনব যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং এক নব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এক নবীন আদর্শের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি;—এ যুগের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত অক্ষয় বাবুর সিরাজউদ্দৌলা এবং নিখিল বাবুর "মুরসিদাবাদ কাহিনী" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থদ্বয়ে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণিত আছে; কিন্তু এই যুগের সামজিক চিত্র, এই যুগের নেতৃস্থানীয় রাজনীতি ও সমাজসংস্কারক এবং সাহিত্য লেখকদিগের জীবনচরিত ধারাবাহিকরূপে কোথাও বর্ণিত নাই। বহুদর্শী ও সাহিত্যিক শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এই নব রচিত গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ভাষায় ঐ সকল সমাজচিত্র ও জীবনচরিত বর্ণনা করিয়া বাঙ্গলা ভাষার একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ

ভাষায় তাঁহার নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক রচনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া স্বদেশে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনায় ব্রতী হইলেও হয় ত তদনুরূপ যশস্বী হইতে পারিতেন।

বাঙ্গলা দেশে কিরূপে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়ায় এদেশের যুবকদিগের চিত্ত কিরূপভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে কিরূপে এদেশে ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল, কোন্ কোন্ শক্তিশালী পুরুষের প্রতিভাবলে ও প্রাণপণ চেষ্টায় সেই পরিবর্ত্তন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, তাহা একজন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এই গ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন; এবং মিঃ ডিরোজিও, স্যার রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি ও প্রদান করিয়াছেন।

এই প্রতিকৃতি সম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে কিঞ্চিৎ মাত্রও শ্রান্তি বোধ হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণনার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, অথচ ইহার মধ্যে এমন একটি ভাবের মাদকতা আছে যে, মনকে সাহিত্য রসে সরস করিয়া তোলে, এমন একপ্রকার উদ্দীপনা আছে যে প্রাণকে মহদ্ভাবে উদ্দীপিত না করিয়া যায় না।

লাহিড়ী মহাশয়ের এই জীবনচরিত গ্রন্থে উল্লিখিত সামাজিক ইতিবৃত্ত ব্যতীত তাঁহার প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এমনই চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ যে, পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করা যায় না। মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের একি নির্দ্দয়তা! তিনি এত শীঘ্র কেন এই মনোরম জীবনকাহিনী সমাপ্ত করিলেন?

স্বর্গীয় রামতনু বাবুর জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজনীয়



এবং কিঞ্চিৎ অপ্রয়োজনীয় কথাগুলিও জানিবার জন্য মন কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে, শাস্ত্রী মহাশয় যদি তাহা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয় ত লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে আরো অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেন আমরা তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতেছি, লাহিড়ী মহাশয়ের দৈনিক লিপি সকল রহিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যদি সেই সকল দৈনিক লিপির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ কিছু কিছু অনাবশ্যক কথাও এই গ্রন্থের মধ্যে থাকিয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে লাহিড়ী মহাশয় আমাদের চক্ষের সমক্ষে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেন।

আমাদের মনে হয় লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত রচনার উপযুক্ত শক্তি ও ভাবসম্পদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচুর পরিমাণেই ছিল; কিন্তু তাঁহার জীবনের ছোট বড় ঘটনা সকল সংগ্রহ করিবার অবসর শাস্ত্রী মহাশয়ের অতি অল্প।

কেমন করিয়াই বা থাকিবে? শাস্ত্রী মহাশয় একটি বৃহৎ ধর্ম্মসমাজের কেবল ধর্ম্মোপদেষ্টা নহেন; তাঁহাকে সেই সমাজস্থ পুরুষও রমণীদিগের আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক চিন্তা লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে হয়; তদ্ভিন্ন তাঁহার শরীরও রোগে ভগ্ন; তজ্জন্য তাঁহার ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ভাল করিয়া বাংলা সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিতে পারেন না। সেইজন্য এই বৃহৎ গ্রন্থের রচনা একেবারে শেষ করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। যখন সময় পাইতেন তখন গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া ছাপাখানায় পাঠাইতেন। আবার সময়াভাবে কিছুদিন রচনাকার্য্য বন্ধ থাকিত। ইহাতে যে সকল দোষ ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা, তাহা এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়।

সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় এই জীবনচরিতের ঘটনাসকল সংগ্রহ করিবার যে উপযুক্ত সুযোগ পান নাই, তাহা বলিতেই হইবে। এ

বিষয়ে সম্ভবতঃ চেষ্টারও কিছু ত্রুটি হইয়াছে। যদি ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী জানিবার জন্য প্রকাশ্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয় ত লাহিড়ী মহাশয়ের পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ কোন নূতন বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারিতেন। আমরা দেখিতেছি লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুর পর "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় তাঁহার তেজস্বিতা সম্বন্ধে যে সুন্দর ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং "দাসী" পত্রিকায় স্বর্গীয় রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মকাহিনীর সঙ্গে রামতনু বাবু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

কিন্তু সে কথা যা'ক্। আমরা এখন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে আমাদের কি শিক্ষার বিষয় আছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথমেই লাহিড়ী মহাশয়ের আশ্চর্য্য সরলতা ও হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাব দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। লাহিড়ী মহাশয়ের ন্যায় সরল ও অকপট ব্যক্তিদিগের কাহিনী আমরা প্রাচীনলোকের মুখে গল্পই শুনিতে পাই, কিন্তু এই কৃত্রিমতার যুগে চক্ষের সম্মুখে আর বড় একটা দেখিতে পাই না। লাহিড়ী মহাশয়ের যেমন সরলতা ছিল, তেমনি তাহার সঙ্গে বিনয় ও পবিত্রতা মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে মনে হয়, তিনি যেন বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়ার পর জ্ঞাতসারে আর কোন পাপে লিপ্ত হন নাই। অথচ সর্ব্বদাই আপনাকে পাপী বলিয়া অনুভব করিতেন।

একবার শৈশবসুলভ চপলতা বশতঃ একটি অন্যায় করিয়া তাঁহার অগ্রজের নিকট তাহা গোপন করিয়াছিলেন। সেই জন্য বৃদ্ধবয়সেও অনুতাপ করিতেন! এই অনুতাপ সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন "যিনি ষাটি বৎসর পরে স্বকৃত একটী বাল্যসুলভ পাপ স্মরণ করিয়া হায়, হায়, করিতে পারেন, তিনি যে কি ধাতুতে গঠিত ছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।"



লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে পবিত্রতা, সরলতা, এবং বিনয়ের সঙ্গে যে সত্যপ্রিয়তা ও তেজস্বিতা ছিল, তাহাও বড় আশ্চর্য্য। তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিতেন। কোন বাধাবিঘ্নের দিকে দৃকপাৎও করিতেন না। যে সময় একজন শিক্ষিত যুবক "গঙ্গাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি না" বলিলে সমস্ত সহরময় আন্দোলন উপস্থিত হইত। সেই সময় একজনমাত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যস্থলে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া উপবীত ত্যাগ করিল;—এই একটি ঘটনাদ্বারাই লাহিড়ী মহাশয়ের সত্যপ্রিয়তা, তেজস্বিতা ও চরিত্রবলের পরিমাণ করা যাইতে পারে।

তবে এই ঘটনাটি হয়ত অনেক প্রাচীনভাবাপন্ন পাঠকের কষ্টের কারণ হইবে। তাঁহারা একজন ব্রাহ্মণ যুবকের উপবীতত্যাগ ব্যাপারটার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সহানুভূতি প্রকাশ করা কাজটা যে বড় সহজ, তাহা বলিতেও সঙ্কুচিত হই, পাছে বা উদারতার অসঙ্গত একটা গর্ব্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের সকল মতের সঙ্গেও সকল সময় ঐক্য হইতে পারিব না, বাহিরের সকল কার্য্যও আমরা সমর্থন করিতে পারিব না। সুতরাং বাহিরের মত ও কার্য্যদ্বারাই মানুষের সাধুতা বিচার করিলে চলিবে না; প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য ও অন্তরের ভাবের দ্বারা বিচার করিলেই মানুষকে ঠিক্ সত্যভাবে বুঝিতে পারিব।

লাহিড়ী মহাশয়ের পৈতা পরিত্যাগ—বাহিরের এই কাজটার হয় ত আমরা প্রশংসা করিতে পারিব না। কিন্তু তিনি যে প্রবল সত্যানুরাগ ও বিবেকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আপনার অন্তরস্থিত বিশ্বাসকে রক্ষা

করিলেন, এবং তজ্জন্য লোকনিন্দা, সমাজের অত্যাচার ও উৎপীড়ন আত্মীয় স্বজনের অশ্রুজল অম্লানবদনে সহ্য করিলেন, আমরা তাহারও কি প্রশংসা করিব না?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ ব্যাপারটা হয় ত প্রত্যেক হিন্দু-দলপতির নিকটই নিন্দনীয়; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে করুণার বশবর্ত্তী হইয়া বালবিধবাদিগের দুঃখমোচনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সেই করুণাও কি নিন্দনীয়?

আমরা এইরূপ নিন্দার ভাব অন্তরে লইয়া যদি মানুষের দোষগুণ বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে কোন সাধুব্যক্তিই আমাদের ধারালো-বুদ্ধির সূক্ষ্ম বিচারে পার পাইবেন না। কারণ, অগ্রেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমার মতের ঐক্য হইবে; এখন আমি যদি আমারই গুটিকয়েক মতের নজীর লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধুতা বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে অনায়াসেই আমি আমার নিজকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিব; তবে তাহাতে জগতের অধিকাংশ সাধুর সাধুতাই অসাধুতা বলিয়া প্রমাণিত হইবে; এবং আমরা এই স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের মহত্ত্ব একেবারেই বুঝিতে পারিব না। কেমন করিয়া বুঝিব? তিনি জাতিভেদকে তাঁহার প্রিয় মাতৃ-ভূমির অমঙ্গলের কারণ বলিয়া মনে করিতেন; হৃদয়ে প্রবল ভক্তির উল্লাস থাকা সত্ত্বেও দেব দেবতায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেন না; বাল্যবিবাহ ও নারীজাতির অবরোধ প্রথারও বিরোধী ছিলেন।

এই জন্যই আমাদের আলোচনার মাঝখানে এতটা বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমরা জানি, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের এক শ্রেণীর সমালোচকের মনে এমন একটি সঙ্কীর্ণভাব আসিয়াছে যে, কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে তাঁহারা মানবত্বের বৃহৎ বিশ্ব-জনীন আদর্শ লইয়া মানবচরিত্র বিচার করিতে চাহেন না, কিন্তু হিন্দুত্বের



একটি ক্ষুদ্র মাপকাটি লইয়া মহাত্মাদিগের মহত্ত্ব বিচার করিতে বসেন। সেইজন্য এখন কোন উপন্যাস বা নাটক রচিত হইলে সমালোচকেরা আগেই দেখেন নায়কনায়িকাগণের জীবন কতটা হিন্দুত্বের আদর্শে পরিচালিত হইয়াছে।

এইরূপ যদি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন সাম্প্রদায়িক আদর্শ লইয়া মানবত্বের বিচার করিতে বসেন, তাহা হইলে স্বাধীন মানবাত্মার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না; এবং মহাত্মাদিগের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পথই বন্ধ হইয়া যাইবে। মনে করুন, আজ যদি "খ্রীষ্টানবান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক বাইবেলের বচন মিলাইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত" সমালোচনা করেন, অথবা "বঙ্গবাসী" সম্পাদক নব্যস্মৃতির শ্লোক মিলাইয়া বাইবেলের বিচার করিতে বসেন, তাহা হইলে পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরই চরিত্রসৌন্দর্য্য উপভোগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

এ বিষয়ে স্বর্গীয় রামতনু বাবু যে উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরনীয়। তিনি মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদের বিরোধী হইয়াও নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের সঙ্গে অকৃত্রিম প্রণয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং স্বর্গীয় ভূদেব বাবুরও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। খ্রীষ্টানু-গত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সমুচিত শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিতেন।

আমাদের প্রবন্ধ দেখিতেছি ক্রমশঃই দীর্ঘ হইয়া চলিল। আমরা এখন কেবল লাহিড়ী মহাশয়ের অতুলনীয় ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তির উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

লাহিড়ী মহাশয়ের, ঈশ্বরের করুণায় এবং পরকালে এরূপ উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল যে এই অর্দ্ধনাস্তিকতার যুগে তাহা চিন্তা করিলেও মন আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার

সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ নবকুমার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের ধর্ম্মশীলা সেবাপরায়ণা কন্যা ইন্দুমতী ভাইয়ের সেবা করিতে গিয়া নিজের শরীরের প্রতি এরূপ অবহেলা করিলেন যে, তিনিও নিদারুণ যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়িনী হইলেন।

তৎপর যখন নবকুমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন ইন্দুমতী দেহত্যাগ করিলেন। অটল বিশ্বাসী রামতনু একমাত্র বিশ্বাসের বলেই শোক জয় করিলেন। তিনি ইন্দুর জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত কিম্বা একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু ইন্দুমতীর মাতা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি "মা রে ইন্দু রে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন লাহিড়ী মহাশয় দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার মুখ আবরণ করিলেন,—"কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে অনেক যন্ত্রণা হ'তে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেন।"

গ্রন্থকার বলিতেছেন, "বাস্তবিক এই বিশ্বাসী সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। * * ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা হইল। উপাসনার মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ "ইন্দু" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। পরে দেখা গেল যে বস্ত্রাঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। উপাসনা ভাঙ্গিলে বলিলেন—"দেখ আমরা হাজার ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলি না কেন, কাজে তাঁকে মঙ্গলময় বলিয়া ধরা কত কঠিন? আমি আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলাম; এটা কি সত্য নয়, আমার ইন্দু এখন তাঁর মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কাঁদি কেন?" এই ক্ষণিক শোকপ্রকাশের জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

"একজন বন্ধু ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছেন, যে আরা হইতে ইন্দুমতীকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রে সর্ব্বদা ইন্দুর সংবাদ লইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন—"তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, ইন্দুমতীর রোগযন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে।"



পত্র পড়িয়া তাঁহার মনে হইল সৌভাগ্যক্রমে কোনও অতর্কিত উপায়ে বোধহয় ইন্দুমতীর পীড়ার উপশম হইয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে ঐ সংবাদ ইন্দুমতীর মৃত্যুসংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সে উপদেশ জীবনে ফলিতে দেখিতেছি।"

"বলিতে কি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতর হইয়া কাঁদিলে তাঁহার সহ্য হইত না। সে ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের কথা শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এ বিষয়ে একদিনকার একটি ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নবকুমারের ও ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া চাঁপাতলাতে একটী বাড়ীভাড়া করিয়া কিছুকাল ছিলেন। সেই সময়ে একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন "আমাদের পাশের বাড়ীতে একটি ছেলে মারা গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রীলোক মিলিয়া কয়দিন কাঁদিতেছেন। দেখ, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের কি দশা হয়! আমি ওদের বাড়ীর পুরুষদিগকে বুঝাতে গিয়াছিলাম। আমি গিয়ে বল্‌লাম আপনারা ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্ত্তা আছেন তাও ত মানেন, তবে এতদিন ধরে' কান্নাকাটি কেন করেন?"

এতক্ষণ লাহিড়ী মহাশয়ের অটল ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা বলা হইল। এখন তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিষয়ে গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ঈশ্বরের নামে সে ভক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর দেখিব! এক দিনের কথা আর ভুলিব না। সেদিন প্রত্যূষে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সকলকে লইয়া একটু ভগবানের নাম করিতে হইবে। তাহাই করা গেল। আমরা চক্ষু খুলিয়া দেখি, তিনি কখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; গলবস্ত্র হইয়া চাদরখানি দুই হস্তের মধ্যে ধরিয়া আছেন; আর খেজুরগাছের নলি দিয়া যেরূপ রস পড়ে, তেমনি সেই শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের আভাতে উজ্জ্বল। আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ করিয়া উপরকার কোনও লোক হইতে কোনও উন্নত জগতের একটি জীবকে কে নামাইয়া দিয়াছে। আমি অনিমেষ নয়নে সেই প্রেমোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে দিন যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা চিরদিন স্মৃতিতে থাকিবে।"

আর উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। পাঠকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহার এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি পাঠ করুন, এবং একটি অমূল্য জীবনের অপূর্ব্বকাহিনীর সহিত পরিচিত হইয়া হৃদয়কে উন্নত করুন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

---

# আদম নন্দন।

শিলাময়ী বনভূমি—সর্ব্বত্রই পাহাড় ও জঙ্গল। ছোট বড় কত পাহাড় পূজামণ্ডপে নৈবেদ্যের মত যেন সাজান রহিয়াছে। মহানৈবেদ্যের মত একটি উচ্চ পাহাড়ের পার্শ্বে বড় বড় শাল গাছের নিবিড় জঙ্গল,



মধ্যে একটি বিস্তৃত গহ্বর। সেই গহ্বর ও শাল বনের ধার দিয়া একটি ছোট নদী অনবরত কুল কুল ধ্বনি করিয়া তলদেশে প্রবাহিত হইতেছে।

সেই গহ্বর পশুরাজ সিংহের বিশ্রাম বাস। একদিন মধ্যাহ্ন কালে নদীতটস্থ শষ্পশয্যায় অর্দ্ধশয়ান হইয়া সিংহ পারিবারিক শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন। সিংহী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। শাবক দুইটি মাঝখানে গুটি মারিয়া, লেজ গুটাইয়া আবার হঠাৎ লম্ফ দিয়া, উড্ডীয়মান পতঙ্গের ছায়া ধরিবার জন্য ব্যস্ত। পশুরাজ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাহাই দেখিতেছিলেন এবং ভেরীরবে নাসিকা গর্জন করিতেছিলেন। অনুচরবর্গ দূরে থাকিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বিশ্রামভোগে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল।

সহসা বনভূমি প্লাবিত করিয়া থর্ থর্ সর্ সর্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সিংহ উঠিয়া থাবা গাড়িয়া বসিলেন। সিংহীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, গামোড়া দিয়া উঠিয়া সিংহের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। শাবক দুটির উল্লম্ফন ক্রিয়া বন্ধ হইল! অনুচরবর্গ সচকিত ভাবে কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

শত শত শশক কাঠবিড়াল বনভূমি ছাইয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। থর্ থর্ সর্ সর্ শব্দ তাহাতেই হইতেছে। নিরীহ পশুগুলির সকলেরই কাতর লোচন, কম্পান্বিত কলেবর; পিছন দিকে দেখিতে ও তাহারা ভয় পায়—দলে দলে, অতিদ্রুত সঞ্চালনে অথচ সন্তর্পণে পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে।

সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া, উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে একবার অভিবাদন পর্য্যন্ত না করিয়া তোমরা ব্যস্ত ত্রস্তভাবে কোথায় যাইতেছ? শশক যাইতে যাইতে কহিল "মহারাজ ক্ষমা করিবেন। এস্থানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, কাজেই আমরা বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া

চলিয়াছি কোথায় যাইব জানি না।" সিংহ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমাদের নিগ্রহ করিয়াছে আমাকে বল আমি এখনই তাহার দণ্ডবিধান করিব।" কাষ্ঠবিড়ালগণ চলিতে চলিতে বলিল "না মহারাজ আমাদের কেহ নিগ্রহ করে নাই আমরা ভয়ে ভয়ে পলাইয়া যাইতেছি।" "কিসের ভয়?" সিংহ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে জন্তুগুলি অদৃশ্য হইল; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিষম উপ্ উপ্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে লাফাইয়া বহুরূপী বানর —সেই পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। বড় বড় বানরের ভরে বড় বড় শাখা মড়্ মড়্ করিতেছে। সেই দিকে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহ কহিলেন—"ঊর্দ্ধচর শাখা মৃগ! তুমি আমার ফলপত্রবৃত্তিভোগী চিরদিনের চর। তোমার অগ্রে কত পশুই না বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেল। তুমি কোথায় আমায় সংবাদ দিবে, না দেখিতেছি তুমি বন বিদলন করিয়া স্বয়ং পলায়নপরায়ন! ব্যাপার কি? কিসের ভয়?"

সিংহের কথায় একটি ক্ষুদ্রকায় মর্কট নিকটস্থ একটি শালতরুর অগ্রভাগে আরোহণ করিল। পশ্চিম দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া তর্জ্জনী সঙ্কেত দেখাইয়া বলিতে লাগিল "মহারাজ দেখুন দেখুন—ঐ আসিতেছে ঐ আসিতেছে সিংহ লম্ফে লম্ফে পর্ব্বতের চূড়ায় অধিরোহণ করিলেন; দেখিলেন, সুদূর পশ্চিমে কৃষ্ণবিন্দুর মত একটি বস্তু যেন অগ্রসর হইতেছে আর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে সহস্র সহস্র পশুপ্রজা পলায়ন করিতেছে। এমন যে পশুরাজ সিংহ তিনিও চিন্তান্বিত হইলেন।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, সত্বর গম্ভীর পদচারণে, শুণ্ড উত্থিত করিয়া পশুপতি গজরাজ সিংহ সকাশে উপনীত হইলেন। শুণ্ড নামাইয়া পশুরাজকে অভিবাদন করিলেন; চিন্তিত সিংহের চমক হইল। সিংহ বলিলেন—যূথপতি! আজি কি মনে করিয়া দলে বলে এখানে আগমন? হস্তী যাইতে যাইতে উত্তর করিলেন "এখানে আগমন নহে; বন হইতে



পলায়ন। আপনার সহিত সন্ধির পর হইতে বড় সুখে ছিলাম, তাই বিদায় লইয়া যাইতেছি" সিংহ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন সকলেই বিদায় লইতেছেন, কিন্তু কেন তাহা কেহ বলেন না।" মাতঙ্গ দূর হইতে উত্তর করিলেন, আপনি কি জানেন না,—বনে যে আদম-নন্দন প্রবেশ করিয়াছেন।" সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "আদম-নন্দন কে? তাহাকে কিসের ভয়?" হস্তী তখন বহুদূর গিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে পবনবেগে হরিণ সকল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল; শাখা প্রশাখাময় শৃঙ্গ সকল লতায় পাতায় জড়াইয়া যায় হরিণগুলা উল্টাইয়া পড়ে; উঠিয়া আবার দাঁড়ায়। ঘোড়ার দল খটাখট্ খট্ খট্ শব্দে আসিতে লাগিল; কাণ লম্বা করিয়া, লেজ খাড়া করিয়া সমানে দৌড়িয়া চলিয়াছে।

হুঙ্কারে গর্জ্জন করিতে করিতে শার্দ্দুলরাজ আসিয়া উপস্থিত। পশুরাজ তুরঙ্গ কুরঙ্গ প্রভৃতিকে কিছু বলেন নাই; বীর ব্যাঘ্রকেও তদবস্থ দেখিয়া সহাস্য আস্যে বলিলেন—কি হে মন্ত্রীবর তুমি ও কি আদম-নন্দনের ভয়ে বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছ? তবে কাহাকে লইয়া আমি মন্ত্রণা করিব? ব্যাঘ্র নত মস্তকে উত্তর করিলেন "আজ্ঞে আমার একমাত্র মন্ত্রণা—অচিরাৎ আপনিও এস্থান পরিত্যাগ করুন, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন না, আদম-নন্দনের অসীম পরাক্রম, সে অতি বিষম শত্রু। আমি বরং রাজকুমারদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া লইতেছি।" রাজকুমার দুটিও অমনই প্রস্তুত। বাঘের পিঠে উঠিবে বলিয়া, তাড়াতাড়ি দুইজনে দুইদিকে আসিল। সিংহ ভ্রূকুটি করিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন। ব্যাঘ্রকে কহিলেন "মন্ত্রীবর তোমাকে অত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না, তুমি আপনার পন্থা দেখ।" ব্যাঘ্র মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে চলিলেন "নিমক খাইলেই ভাল কথা বলিতে হয়।"

তখন পশুরাজ পঞ্চানন চতুষ্পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভাল করিয়া গা ঝাড়া দিলেন, কেশরগুলি ফুলিয়া উঠিল। নয়নদ্বয় ঘুরিতে জ্বলিতে লাগিল। নাসা স্ফীত হইল, নাসানিম্নস্থ লোমগুলা শজারুর কাঁটার মত শক্ত হইয়া উঠিল। সিংহী ও শাবকগণের দিকে একবার কোমল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তিনি আবার সেই পর্ব্বতের স্কন্ধদেশে অধিরোহণ করিলেন। এবার লম্ফ নাই। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপ। সেইখান হইতে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—একটি কৃশকায় দ্বিপদ জন্তু শনৈঃ শনৈঃ ধীরপদবিক্ষেপে পূর্ব্বাভিমুখে, তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই দেখিতে পাইলেন, তাহার মাথায় বড় বড় কাল কাল লোম কেন জানিনা অনেকটা অন্য লোম দিয়া ঢাকিয়াছে, বাহু, উরু, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, সকলই পাত্‌লা লোম দিয়া ঢাকা। লাঙ্গুল নাই বোধ হইতেছে; নখর শৃঙ্গ ত নাইই। কৈ বিশাল দন্ত? না, তাও ত নাই। দেখিতে মন্দ নয় ত? সুন্দর বলিলেও চলে। তবে কিনা বড় কৃশ; নাকের নীচে লোম গুলা কেমন মুচড়াইয়া রাখিয়াছে দেখিয়াছ—উহার পিছনে কি একটা রহিয়াছে, যেন একটা লতাঘরের মত—নয়? তাহার তলায় চারিখানা চন্দ্র সূর্য্যের মত, কেবলই অল্প অল্প ঘুরিতেছে। কৃশকায় ঐটা টানিয়া আনিতেছে। এই যে আমাকে দেখিয়া গুহা পার্শ্বে দাঁড়াইল লম্বা লম্বা চক্ষু কিন্তু কেমন যেন বেশ! এই যে অভিবাদন করিতেছে।

নবাগত। সেলাম পশুরাজ!

সিংহ। কি প্রয়োজন?

নবাগত। এমন কিছুই নয়, তবে কিনা বনভূমি দিয়া যাইতেছি; মনে করিলাম যে একবার মহারাজকে সেলাম করিয়া যাই।

সিংহ (সহর্ষ) বেশ বেশ! ভদ্রের রীতিই এইরূপ। তোমার নাম কি বাপু?



নবাগত। আজ্ঞে আমার নাম আদম-নন্দন।

সিংহ (শিহরিয়া পরে আত্মভাব সম্বরণ করিয়া) এইমাত্র তোমার নাম শ্রুত হইলাম। হাঁ হে বাপু তোমার নাকি অসীম পরাক্রম!

নবাগত। আজ্ঞে দেখিতেইত পাইতেছেন। খরশৃঙ্গ নাই সুচল বক্র নখর নাই, বিশাল গজ-দন্ত নাই। নাসিকায় খড়্গ নাই। পরাক্রম দূরে থাকুক পলায়নেরও ক্রম জানিনা, দুই পায়ে কি দৌড়ান যায়? তুচ্ছ বস্তু পুচ্ছ তাওত নাই।

সিংহ। তা বটে, কিন্তু তুমি নাকি বিষম শত্রু।

নবাগত। আজ্ঞে কার কি শত্রুতা করিয়াছি বলুন। কি লইয়া শত্রুতা করি? সিংহের সহিত কি শশকের শত্রুতা সাজে?

সিংহ। তা ত বুঝিলাম, তোমার নাম শুনিয়াই আমার প্রজাপুঞ্জ পলাইল কেন"

নবাগত। কেহ কাহার দুর্নাম করিলেই পাঁচ জনে অমনই তাহা বিশ্বাস করে। এই যে আমাদের দেশে শুনিয়াছিলাম, সিংহ অতি ভয়ানক হিংস্র জন্তু আজি তাহার বিপরীতই ত দেখিতেছি। কৈ আপনাকে দেখিয়া আমার ত ভয় হইতেছে না। না আপনিই আমার হিংসা করিতে চাহেন?

সিংহ। কেন তোমার হিংসা করিব? দেখিতেছি, তুমি পরম বুদ্ধিমান্ জীব। নবাগত। আপনার প্রসংশা সার্থক হৌক! মহারাজ জয় হৌক্।

সিংহ। তোমার সঙ্গে ওটি কি—গুহা?

নবাগত। হাঁ গুহা বটে। চল্‌তি গুহা। আমরা বলি গাড়ী।

সিংহ। গাড়ীতে কি হয়?

নবাগত। উহার মধ্যে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকা চলে। গো, গর্দ্দভ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, যে ইচ্ছা সেই টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আরোহীর পথশ্রম হয় না, অথচ পরিক্রম হয়।

সিংহ। চল্‌তি গুহায় প্রবেশ করিব কি প্রকারে?

নবাগত। 'এই যে' বলিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। সিংহ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জানু গাড়িয়া বসিলেন। বলিলেন। বেশ! তবে তুমি একবার টানিয়া লইয়া চল।

আদম নন্দন "যে আজ্ঞা বলিয়া" দ্বার বন্ধ করিয়া শৃঙ্খল বিলক্ষণ করিয়া লাগাইয়া দিলেন; ধীরে ধীরে গাড়ী খানি টানিতে লাগিলেন। নদীর ধারে ধারে চলিলেন।

সিংহ। এত বেশ, কেমন ঝুরু ঝুরু হাওয়া লাগিতেছে। যেন ঢুলু ঢুলু ঘুম আসিতেছে, শয়ন, উপবেশন, দণ্ডায়মান হওয়া, ইচ্ছামত করিলেই হইল। পথশ্রম নাই অথচ পথ পরিক্রম হইতেছে। এ বড় ভাল! ভাই আদম-নন্দন একটু শীঘ্র চল, আমি একটু মজা দেখি!

আদম-নন্দন গাড়ীর পিছন দিকে গিয়া বেগে গাড়ী ঠেলিতে লাগিলেন ও দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। পথ নিম্ন ঢালু অতি সত্বর বনভূমির বাহিরে গিয়া পড়িলেন। তখন পড়ন্ত রৌদ্র প্রান্তর-পৃষ্ঠে যেন গড়াগড়ি দিতেছিল। সিংহের মুখেও রৌদ্র পড়িল। সিংহ গাড়ীর পিছন দিকে মুখ ফিরাইলেন। আদম-নন্দন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন। সিংহ বলিলেন, ভাই এইবার বস্ কর, আর ঠেলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি ক্লান্ত হইয়াছ। বিশেষ চল্‌তি গুহার মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আর তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

আদম-নন্দন বলিলেন "না মহারাজ আপনি ইহার মর্ম্ম এখনও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আর একটু পরেই বুঝিবেন বলিয়াই আমি শ্রম করিতেছি।" বলিয়া আদম-নন্দন মন্দগতি অবলম্বন করিলেন গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। ক্রমে প্রান্তরের মধ্যদেশে আসিল।

সিংহ কোষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধশয়ান হইয়া দিঙ্মণ্ডলে বৃক্ষমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ



করিতে লাগিলেন। পলায়নপর পশুপালের কোন চিহ্ন প্রান্তরে নাই। সবৎসা গাভী দুই একটি চরিতেছে। মিঠারৌদ্রে দুই একটি পাখী উড়িতেছে। মেষপাল নিবিড় দলবদ্ধ, তাহার মধ্যে দুই একটা একটু দূরে গিয়া পরস্পর মস্তক ঘর্ষণ করিতেছে। ছাগপাল সেরূপ দলবদ্ধ নাই। দুই চারিটী ছাগ শৃঙ্গে শৃঙ্গে লাগাইয়া পশ্চাৎ পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে। মৃগেন্দ্র ভাবিতেছেন, "এ সকলত বেশ বনভূমিতে এরূপ ত দেখা যায় না। আর এই যে হল্‌দে হল্‌দে মাঠ, তাহার পশ্চিমে বড় বড় গাছের কোলে ছায়া। আর পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর রোদের খেলা এও-ত বড় সুন্দর, বড়ই সুন্দর" এখন সিংহী কোথায়? শাবকেরা কোথায়? ভাই আদম-নন্দন এখন থাম, আমি বনভূমিতে ফিরিয়া যাই।" আদম-নন্দন কোন উত্তর না দিয়া গাড়ী যেমন ঠেলিতেছিলেন তেমনই ঠেলিতে লাগিলেন।

সিংহ। ওহে ভাই শুনিতে পাইতেছ না?

আদম-নন্দন পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর ও ব্যাপৃত।

সিংহ। (স্বগত) কোন পশু রাত্রিতে অধিকতর দেখিতে পায়; কোন কোন পশু একেবারেই দেখিতে পায় না। দ্বিপদ পশুরা কি তবে অপরাহ্ণে বধির হয় না কি? তবে একবার ঈঙ্গিত করিয়া দেখি।

সিংহ হাতের থাবা উঠাইয়া নানারূপ ইঙ্গিত করিলেন। ভীষণ হুঙ্কারে গর্জ্জন করিলেন। প্রান্তরের বায়ু কাঁপিতে লাগিল। আদম-নন্দনের কিন্তু ভ্রুক্ষেপ হইল না।

সিংহ। দ্বিপদেরা কিরূপ জীব বলিতে পারি না অপরাহ্ণে ইহার বাক্‌শক্তি গিয়াছে। বোধ হয় শ্রবণশক্তিও নাই। এমন গর্জ্জনে টলিল না। দৃষ্টিশক্তিও গিয়াছে; নতুবা সঙ্কেত যে বুঝিবে না,—সেই বা কেমন? চক্ষুতে সুন্দর জ্যোতি দেখিয়াছিলাম, তাহাও নাই। নিস্তেজ লোচনদ্বয়ে নিস্পন্দ পক্ষ্মপত্র নামাইয়াই আছে। ইহার বুদ্ধিশুদ্ধিও এখন নাই

নাকি ? যাক্ উহার কথা যাউক, এখন বনভূমিতে যাই ! বলিয়া সিংহ দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার খুলিল না। শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়াছিল।

তখন মৃগেন্দ্রচন্দ্র পশুরাজ মহাক্রোধিত হইলেন। জটাঘটা ছট্ ছট্ করিতে লাগিল। করতাল চক্ষু গন্ধকের মতন জ্বলিতে লাগিল। মুখ-গহ্বর দিয়া লালা নির্গত হইতেছিল। গাড়ী লইয়া নির্ব্বাক নির্ভীক আদম-নন্দন কিন্তু সমানে চলিয়াছেন।

সিংহ লোহার গরাদে গুলায় সজোরে থাবা মারিলেন, টানিয়া ধরিলেন। মাথা দিয়া সেই গুলা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন। মাথায় আঘাত লাগিল। লম্ফপ্রদান করিলেন—মেরুদণ্ডে বিষম ব্যথা পাইলেন। লৌহদণ্ড সকল ভীষণ দন্তে ধরিয়া কামড়াইতে লাগিলেন। কস্ বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। গোঁ গোঁ করিয়া বিষাদ গর্জ্জন করিতে করিতে সেই আপনার রক্ত আপনি পান করিতে লাগিলেন। গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে নির্ভীক নির্ব্বাক আদম-নন্দন কিন্তু সমানে চলিয়াছেন।

সিংহ অনেকক্ষণ জানু পাতিয়া বিশ্রামের সহিত গভীর চিন্তা করিলেন—পরে ধীরে ধীরে সবিনয়ে বলিলেন, "ভাই আদম-নন্দন, তোমার অভিপ্রায় কি ? আদম-নন্দন। "পশুরাজ সিংহকে চল্‌তি গুহার মর্ম্মবোধ করান, আর আপনি আপনার রাজমুখে আমাকে বুদ্ধিমান বলিয়া যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহাই সার্থক করা।"

সিংহ। চল্‌তি গুহার মর্ম্ম কি ?

আদম-নন্দন। আপনাকে বন্দী করা।

সিংহ। তবে কি আমি তোমার বন্দী ! ! কৈ লতাবিতানে ত বাঁধ নাই।

আদম-নন্দন। আমরা বন্ধন না করিয়া বন্দী করি।

সিংহ। তোমরা বিশেষ বুদ্ধিমান্ বটে।

আদম-নন্দন। এতক্ষণে প্রশংসাপত্র সার্থক হইল।



সিংহ। তোমাদের অসীম পরাক্রম না হৌক অসীম সাহস বটে। একাকী তুমি নিঃসহায় হইয়া আমাকে বনভূমির মধ্য হইতে অক্লেশে বন্দী করিয়াছ। তবে বিষম শক্ত বটে। কেননা নিরীহ নির্দ্দোষের নির্য্যাতন করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমান হইয়াও তোমরা নিতান্ত নির্দ্দয়। আমি তোমার কোন অপকার করি নাই তোমরা আমাকে বিনা কারণে কাঁদাইতেছ। সিংহের গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

---

# কলিকাতা।

ছিলে তুমি লুক্কায়িত অরণ্যমাঝার,
উদগ্র বাসনা যেন দরিদ্রের বুকে,
প'রেছ কতই আজি রত্ন-অলঙ্কার
শ্বেতাঙ্গপ্রতাপ সহ উদ্বাহ-কৌতুকে।

অপবিত্র স্পর্শ হ'তে রক্ষিতে তোমায়
গর্ব্বিত ভূধর আজি তুলিছে অশনি,
সজ্জিত কতই শস্ত্রে সাগরের কায়,
মণ্ডিত শৃঙ্খলমালে বসুধা আপনি।

দেশদেশান্তর হ'তে নানা বর্ণ ধরি
সেবিছে সাধক তোমা সিদ্ধি-কামনায়,
অনল, বরুণ আর চপলা সুন্দরী
কিঙ্কর কিঙ্করী ভাবে বান্ধা তব পায়।

বিপুল বিভব-নীরে আছ নিমজ্জিত,
ভু'লোনা—সলিলতলে পলল সঞ্চিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। } ১৩১১। { ২য় সংখ্যা।

## বৈধব্য।

পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বালবিধবার করুণ মুখচ্ছবি সন্দর্শনে কাতর হইয়া আকুলহৃদয়ে তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন আমরা তাঁহাকে ভণ্ড মূর্খ অধার্ম্মিক প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া প্রবল হুহুঙ্কার সহকারে ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়া বিজয়ী বীরের জয়োল্লাস উপভোগ করত পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। তখন সম্ভবতঃ আমাদের মনে হইয়াছিল যে কোন প্রকারে প্রাচীন সংস্কার বা প্রাচীন রীতি নীতি রক্ষা করিতে পারাই পরম পুরুষার্থ। যে ভিত্তিমূলের উপর এই সকল সংস্কাররাজি প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তি সুদৃঢ় আছে বা শিথিল হইয়া পড়িতেছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন মাত্র নাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আপাতমনোরম স্বপ্নমরীচিকা এখন ক্রমশ বিদূরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—এখন কঠোর সত্য ও কবিত্বহীন

বাস্তবের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বৈধব্যের কথা আর একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

হিন্দুর সমস্ত রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কি কৌমারে, কি বিবাহিত জীবনে, কি বৈধব্যে সর্ব্বত্র এই মূলসূত্র পরিস্ফুট। যাহাতে ধীরে ধীরে সংসারের মধ্য দিয়া ক্রমশ ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায় আমাদের সামাজিক রীতিনীতিতে, আচারে ব্যবহারে, ভোজনে, শয়নে, বৈষয়িক জীবনে সর্ব্বত্র ঋষিগণের এই মহান্ চেষ্টা দেদীপ্যমান।

বৈধব্যপালনের অপূর্ব্ব নিয়মাবলীও এই সুমহান চেষ্টার অন্যতর সুফল। বিবাহ ধর্ম্মার্থে, ইন্দ্রিয়তৃপ্ত্যর্থে নহে এই কথা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে বিশদীকৃত।

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আর্য্যমনীষী কল্পনাকুশলী ভাবুকমাত্র ছিলেন না। কেবল কতকগুলি উচ্চ কল্পনামাত্র তাঁহারা সমাজনীতি বলিয়া প্রচার করিয়া যান নাই। যাহাতে এই সকল উচ্চ ধারণা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় সেজন্য তাঁহারা বিধিমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যাহাতে অতিশয় দুরূহ বিষয় সকল সহজে আয়ত্তাধীন হয় সে দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং এই সকল কৌশল আবিষ্কারে তাঁহারা অসাধারণ প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তি ব্যতীত কোন ধর্ম্ম স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। তাই হিন্দু বালকের প্রথম শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্য—হিন্দু বালিকার একনিষ্ঠা পতিভক্তি।

কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য লাভ সহজ নহে—এজন্য শিক্ষা চাই, সাধনা চাই—অনুকূল পারিপার্শ্বিক ( environments ) প্রয়োজন। তাই হিন্দুঋষি অসাধারণ অধ্যবসায় ও অমানুষী সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে



আহার, বিহার, সমাজ, অনুষ্ঠান, সমস্তই সংযত করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচর্য্যলাভের জন্য হিন্দু বালকবালিকার সে অতুলনীয় শিক্ষা জগতে দুর্লভ—সে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সমাজশৃঙ্খলা, ধর্ম্মের সে সদাজাগ্রত সর্ব্বব্যাপী প্রভাব, তাহারও তুলনা জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

কাজেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য তখনকার দিনে হিন্দুর চরিত্রগত হইয়াছিল—বানপ্রস্থ বা বৈধব্য নিতান্ত সুন্দর স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হায়! সেদিন গিয়াছে। পবিত্রতা, সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের স্থানে এখন স্বার্থপর বিলাসিতা এবং ধর্ম্মহীন যথেচ্ছাচারিতার ভীষণ তাণ্ডব সমাজদেহ বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। তবু আমরা শুদ্ধ প্রাচীন সংস্কারবলে সনাতন রীতিনীতি প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ চেষ্টা বাতুলের কল্পনা—কাণ্ডজ্ঞানহীনের নিষ্ফল প্রয়াস। বন্ধন যাহার খুলিয়া গেছে তাহাকে কতক্ষণ একত্র রাখা যায়? হয় বন্ধন দৃঢ়ীভূত কর নয় তাহাকে ছাড়িয়া দাও—ইহা ভিন্ন তৃতীয় উপায় কিছুই নাই। যে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা হিন্দুসমাজের সঞ্জীবনী শক্তি তাহা বহুদিন সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমানকালে বালকবালিকার শিক্ষা ও চরিত্র কিছুমাত্র মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন আজকাল বালকবালিকারা সংযম ও ধর্ম্ম কি পরিমাণে শিক্ষা পায়। সমাজও উৎসাহ দান করে। বাল্যকালের এই সব কুশিক্ষায় বাসরগৃহ হইতে কুৎসিৎ ভাব নবদম্পতীর চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠে—ফুলশয্যায় সেই ভাব স্ফুটতর হয়—যাহা বাকী থাকে নানাবিধ অশ্লীল পুস্তকাদি পাঠে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এইরূপ সুন্দর সুমহান্ শিক্ষার পর পতিহীনা বালিকাকে বৈধব্য পালন করিতে বলা যে নিতান্তই কঠোরতার

পরিচায়ক—দৃষ্টিহীন সমাজের মস্তিষ্কমধ্যে সে কথা আদৌ প্রবেশ করে না।

যে বাল্যকাল হইতে মোটেই সংযম শিক্ষা করে নাই, বিবাহিত জীবনে স্বামীকে বিলাসের উপকরণ মাত্র ভাবিতে শিক্ষা পাইয়াছে—স্বামীদেবতা যাহাকে স্বয়ং "বিদ্যাসুন্দর" ও "রসমঞ্জরী" পাঠ করাইয়াছেন—সেই বিলাসিনীকে সহসা ব্রহ্মচারিণীতে পরিণত করিলে তাহাকে যে কি প্রকার প্রাণান্তকর কষ্টদান করা হয় তাহা যে সমাজ বুঝে না, ইহা আমার বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়।

শুধু ইহাই নহে। আজকাল সমাজবিপ্লবে স্বার্থপরতা ক্রমশ সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। ফলে যৌথপরিবার প্রথা ধীরে ধীরে এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। যেখানে আছে সেখানে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে সেরূপ ভাবে থাকা অপেক্ষা বিলুপ্ত হওয়া বহুগুণে শ্রেয়স্কর।

এ কথা বোধ হয় বুঝিয়া উঠা কঠিন নহে যে যৌথপরিবারপ্রথা বিলুপ্ত হইলে সাধারণ বৈধব্য টিকিয়া থাকিতে পারে না; শুদ্ধ অন্নাভাবই বিধবাকে গত্যন্তর অবলম্বনে বাধ্য করিতে সক্ষম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিনও দূরবর্ত্তী নহে। আজিকার দিনেই বহুতর ভ্রাতৃ-গৃহে বা দেবরাদির গৃহে অসহায়া বিধবার দারুণ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন দর্শন করিলে অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। এই সকল অনাথা দুঃখিনীর জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সমাজ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

ধর্ম্মহীন ব্রহ্মচর্য্যবিমুখ সমাজে আরও এক উপসর্গ সম্প্রতি দেখা যাইতেছে।

এখন অনেকেই ক্রমশ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য-পালনের বিপক্ষ হইয়া উঠিতেছেন।



বিধবা মনোমত আহার করে, বেশ বিন্যাস ও অলঙ্কার পরিধান করে, ভগ্নীপতির সঙ্গে রসিকতা করিয়া থিয়েটার দেখিয়া বেড়ায়, ইহাতে অনেকেরই কিছুমাত্র আপত্তি নাই—বর্ত্তমান সাহিত্যেও ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

অথচ এরূপ অসংযমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যপালন নিতান্তই দুষ্কর।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যের মূলসূত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া বৈধব্যপালনের চেষ্টায়, সমাজে যে কি অশান্তি ও কি পাপ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে—তাহা বলা যায় না।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বহুকালের দৃঢ়সংস্কারের বশীভূত হইয়া এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বহুকষ্টে শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ক্রমশ ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে—অপরিমিত বিলাসলালসা হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে—এরূপ অবস্থায়, গুরুতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীর্ঘকাল যে তাহারা স্বাভাবিক প্রবণতাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে এমন আশা করা যায় না। এবং না পারিলেও তাহাদিগকে অপরাধী করিবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

পর্ব্বতপরিবেষ্টিত উপত্যকাভূমে যখন ধীরে ধীরে জলরাশি সঞ্চিত হয় তখন সুকৌশলে নীরবে সেই জলরাশি নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া সুকঠিন নহে; কিন্তু যখন সেই বর্দ্ধিতায়তন জলরাশি ভীষণ হুঙ্কারে গিরিগাত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলে তখন তাহাকে বাধা প্রদান করিতে যাওয়া বাতুলতামাত্র; এবং তখন তাহাকে তাহার চাপল্যের জন্য তিরস্কার করা বিশুদ্ধ হাস্যরসের উদ্দীপক।

সুতরাং আমাদের সমাজের হিতৈষীমাত্রেরই এখন হইতে এ বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন।

শৈশবে ধর্ম্মশিক্ষা যাহারা প্রাপ্ত হয় না—বিবাহ যাহারা ইন্দ্রিয়সুখের নিদানমাত্র জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে, বিবাহিত জীবনে যাহারা কিছুমাত্র সংযম ও চিত্তশুদ্ধি অভ্যাস করে না—তাহাদের পক্ষে যে সহস্র গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহিয়া যথেচ্ছাচার প্লাবিত শৃঙ্খলাবিহীন অন্তঃপুরে বৈধব্যপালন করা সহজ শুধু তাহাই নহে; আর কিছুদিন পরে একান্নবর্ত্তিতার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এই দুরূহ ব্রত যে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ করিনা।

অথচ এখনো এদিকে কাহারও দৃষ্টিমাত্র দেখা যায় না।

আমরা উদ্বেলিত বিশ্বপ্রেমে সুদূর জাপানে আর্ত্ত ও আহতের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি অথচ আমাদের গৃহে কত অনাথা বিধবার শোকার্ত্ত হৃদয় সমাজের অত্যাচারে—শুধু সুখের অভাবে নহে, বহুস্থলে অন্নাভাবে—চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আমাদের না আছে অবসর—না আছে প্রবৃত্তি!! কিন্তু এখন এই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কি করা আবশ্যক?

আমি সামাজিক বিপ্লবের পক্ষপাতী নহি। আমাদের ধর্ম্মে ও সমাজে বিদেশীয় রীতি অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করে ইহাও আমার অভিলাষ নহে। সুতরাং আমাদের ঘরে ঘরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হউক একথা বলিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

অমঙ্গলকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলাই মঙ্গল; তাহাকে নব নব আচরণে আবৃত করিয়া শোভন করিয়া তোলা সুবুদ্ধি সঙ্গত নহে। কারণ ইহাতে ক্রমশ সমাজ অবনতির গহ্বরে অবতরণ করিতে থাকে। বিশেষতঃ প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় বিশেষত্ব আছে—সেই বিশেষত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহার অস্তিত্ব বিলোপের গুরুতর আশঙ্কা।

সুতরাং আমি সমাজকে বৈধব্যের মহিমাময় আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক নহি; কারণ আমাদের সমাজের মূলভিত্তি যে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহা আজও এই বৈধব্যের অনুষ্ঠানে সুস্পষ্ট প্রতিভাত। মহামহিমধর্ম্মপ্রাণ সমাজের এই শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু বিলুপ্ত করিতে সহজেই প্রাণে গভীর বেদনা জন্মে!



কিন্তু এ ভাবে আর চলে না। বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল ধর্ম্মবিমুখ সমাজের গতি ও পরিণতি যে দিকে বৈধব্যের স্থান সে দিকে নাই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়।

সুতরাং যদি আবার বৈধব্যকে তাহার পুণ্যময় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজের আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

বালক বালিকা উভয়কে আবার সেই আশ্রম ধর্ম্মের পুণ্যময় প্রভাবের মধ্যে লইয়া গিয়া ধর্ম্ম ও সংযম শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন কিন্তু সে কাজ একদিনের নহে। যে পথ বহুদিনের অব্যবহারে কুশকণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে তাহাকে আবার ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া সময় সাপেক্ষ।

যতদিন তাহা না হয় ততদিন বালবিধবা দিগকে উপযুক্ত শিক্ষকাধীনে রাখিয়া অন্ততঃ কিছুকাল ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ও নিস্বার্থপরতা শিক্ষা দিবার জন্য কোন তীর্থস্থানে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে বোধ হয় কিছু উপকার হইতে পারে। ধর্ম্মের প্রতি অনুকম্পা জন্মিলে বিলাসময় সমাজ সহজে তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না এবং তাহার সুদৃষ্টান্তে অশান্তিময় গৃহে কিছু শান্তিসঞ্চার হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহারা দরিদ্রা, আশ্রয়হীনা বা উৎপীড়িতা তাহাদের জন্য চিরকাল সেই আশ্রমে থাকিবার ব্যবস্থা থাকাও কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা কথঞ্চিৎ এই অমঙ্গল দমিত থাকিতে পারে, ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকারের জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

এ সকলের যদি কোন ব্যবস্থাই না হয় তবে সমাজে ব্যভিচারের স্রোত ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, তখন অনাথা উৎপীড়িতা—বিধবার

পদস্খলনে দোষ দিবার অধিকার কাহারো সমাজ যদি অবনত হয় তাহার সঙ্গে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইবে—কেবল কোন বিধিবিশেষ অবিকৃত থাকিবে এ আশা অন্যায়। সুতরাং চক্ষু মুদিয়া অমঙ্গলকে অগ্রাহ্য করা সকল সময়ে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যাঁহারা মূলসূত্রের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া শুদ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলন মাত্র ব্যর্থ করিয়া সুখনিদ্রায় বিভোর আছেন, একদিন যে উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবের প্রলয়চিত্র তাঁহাদের অবসন্ন হৃদয়কে চকিত বিস্মিত স্তম্ভিত করিয়া দিবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের কোন কারণ আমি দেখিনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব।

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সজীবনস্পর্শে উর্ব্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষ সম্মুখে আপন সুদীর্ঘ-পর্য্যটন, অতলস্পর্শশান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হয়, সেই সাগরসঙ্গমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন, সীমাশূন্য, বিপুল বিরাম সমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে, সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা



করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্ব্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভসূর্য্য-কিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষার-বেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছধারা কখনও আলোক, কখনও অন্ধকার, কখনও আশা, কখনও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা, প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণ বেগে উদ্বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্ব্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশঃ বৃহৎ হইয়া বিস্তৃত হইয়া লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল, দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল, বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক্।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য্য একটী প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে, এই ত আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে,

ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, —আমার আর কি চাই! হায়রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব—"যেনাহংনামৃতস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্দ্ধকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কি চাই! ঐশ্বর্য্যের ইহাই বিড়ম্বনা—দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্য্যই চরম সার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্য্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধন মানের দ্বারা নীরন্ধ্রভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনি ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল যে, ইসাবাস্যমিদং সর্ব্বং—যাহা কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে —যিনি ঈশানাং ভূতভব্যস্য—যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনী সন্তান কেমন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রভাবের ঊর্দ্ধে সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্য্যাদার সম্মান—তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না!



আবার যেদিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য অকস্মাৎ এক দুর্দ্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন উপন্যাসের দানবের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন সমস্তই গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল—তখনও—পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্দ্ধে আপনাকে সূর্য্যকিরণের দিকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্দ্ধে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুব-জ্যোতির দিকে উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ্ যাঁহাকে অমৃত-লাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্ম-জ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ্ ধূলিশায়ী, তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্ম-সম্পদ্-বিতরণের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্তহস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্য্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম্ম ইঁহাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি—কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম্ম, আরামের ধর্ম্ম, তাহা অন্ধভাবে জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মের সেই আরাম সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের

আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনীগৃহে যাহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড় ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনমতেই সহজ নহে—বিশেষতঃ বৈষয়িক সঙ্কটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণ বয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাধিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা, প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দ্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্ম্মও সেইরূপ নানাসমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া নানা বিভিন্ন-কণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্য সত্যকে চারিদিক্ হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষসাধনায় বিশেষ-ভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষলাভ করে তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের



ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, কিন্তু তথাপি হিন্দুবিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ্, এবং খৃষ্টানবিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষলাভ; তাহার কোনটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্ব-ভৌমিক, কিন্তু তথাপিও ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই তথাপি এই পার্থক্য বশতই মেঘ আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপরে কমে না, কিন্তু জগতের ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়া-ছিল, যখন ধর্ম্মের স্বদেশীয় রূপরক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন —ইহাতে তাঁহার অনুবর্ত্তী অসামান্য-প্রতিভাশালী ধর্ম্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদস্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্ত্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে

সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে—যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি—তেমনি একবার বর্ত্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম—দেখিলাম উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না—হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরমদুর্দ্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব-আশা, নব-উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্ব্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন!

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া, নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটী-কুটিল-রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত-বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্নমুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দ্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাহার কর্ণে ধর্ম্মের মাভৈঃবাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলবৃদ্ধি-দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে পরমসহায়ের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর, অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া



দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ-বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্ব্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়াছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্ভাসিত। কর্ম্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্ব্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থক জীবনের শান্তিসৌন্দর্য্যমণ্ডিত শেষরশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, এইখানে আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্ত্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি—ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোট জিনিষ বড় হইয়া উঠে, অনিত্যজিনিষ নিত্যজিনিষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়—এই জন্যই পিতৃদেবের এই জন্মাদনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটী বিশেষ শুভ অবসর—যে পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেই পরিমাণ দূরে আসিব,

তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্ম্মল শান্তির মধ্যে দেব-প্রসাদে অক্ষুণ্ণ আনন্দরশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্যপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্ব্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব, যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্ব্বপ্রধান পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনও আরামের জড়ত্বে কোনও নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্মনিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণ মেঽস্তু

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জান যে, সত্যমেবজয়তেনানৃতং—ইহা জান যে, ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহা জান যে আমরা যাহাকে সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ্ নহে, যাহাকে বিপদ্ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে, আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদবিপদের অতীত যে



পরমা শান্তি তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ কর। এই প্রার্থনা কর, আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে স্বপ্রকাশ আমার নিকটে প্রকাশিত হও—আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্যজীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বাঙ্গালীর বীরত্ব।

দক্ষিণ আফ্রিকাক্ষেত্রে ইংরেজের অনবগাহ বুদ্ধি কৌশল ও ভীম বিক্রমের পরিচয় পাইয়া জগৎ বুঝিয়াছে যে ইংরাজ জগতে অজেয়, পরন্তু সমস্ত জগৎ শাসনের উপযোগী সম্রাট। কি ধনবল কি বুদ্ধিবল, কি অস্ত্রবল, কি নৌবল, কি বাণিজ্যবল জগতের মধ্যে ইংরাজ সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ইংরাজের প্রতাপে ভারতবর্ষীয় প্রবল শিখজাতির দর্প খর্ব্ব হইয়াছে, দুর্দ্দান্ত তুর্কতনয়ের মস্তক অবনত হইয়াছে, শ্রমসহিষ্ণু তেজস্বী মহারাষ্ট্রজাত ক্রীতদাসের ন্যায় সেবাপরায়ণ হইয়াছেন, সিপাহীরা চূর্ণ

* গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের অষ্টাশীতি বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

বিচূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ভূপতিবৃন্দ পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃতির অগাধজলে নিক্ষেপন পূর্ব্বক দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ইংরাজের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেছেন, বীরাগ্রগণ্য গুরখাজাতি সন্ত্রস্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতেছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা শুনিলে অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন, উন্মত্তের প্রলাপবাক্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই।

যে জাতির অভেদ্য বুদ্ধি কৌশল এবং বাহুবলের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইংরাজ একপ্রকার বিনাযুদ্ধে ভারতবিজয় সাধন করিয়াছেন, যে জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিখ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বীর জাতির দর্প খর্ব্ব করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে জাতিকে ভীরু কাপুরুষ নামে অভিহিত করিলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা সাধন ভিন্ন আর কিছুই হয় না। সত্য-বটে বাঙ্গালীরা শ্বেতাঙ্গের সবুট পদপ্রহারের ভয়ে সতত অস্থির হৃদয়ে কালক্ষেপ করে, সত্যবটে ব্যবসায়, কৃষি প্রভৃতি লাভ জনক বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘৃণিতদাসত্ব অবলম্বন করিয়া বঙ্গসন্তানের দারুণ জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করিতে হয়, সত্য বটে স্বজাতি দ্রোহিতা, হিংসা, দ্বেষ, নীচতা, বৃথাভিমান, অসারল্য প্রভৃতি দোষ বাঙ্গালীর মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তা বলিয়া তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জগতের চক্ষে হেয় করিতে যাওয়া নিতান্ত নীচতা বলিয়া বোধ হয়।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে ১৯ জন অশ্বারোহী-সৈন্য লইয়া বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গবিজয় কার্য্য সাধন করিলেন, ঐতিহাসিকের বৃথাকল্পনাময় এই অযথা উক্তিকে ধ্রুব সত্যবোধে যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা বাঙ্গালী জাতিকে যে আখ্যায় অভিহিত করুন না কেন, যাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র বিচার শক্তি আছে তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, যখন ১৯ জন লোকে একজন সামান্যগৃহস্থের বাটীতে দস্যুতা করিতে সাহসী হয় না তখন



বক্তিয়ারের ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ এবং বঙ্গেশ্বরের যবন সমাগম শ্রবণে ধনরত্ন স্ত্রীপুত্র পরিবার প্রভৃতি প্রাণাধিক প্রিয় পদার্থ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চাদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক পলায়ন ইহা গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর এই সকল অযথা অসঙ্গত, সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব ইতিহাস আখ্যায় অভিহিত এবং জগতে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীজাতির অযথা গ্লানি ভূমণ্ডল ঘোষণা করিতেছে। বক্তিয়ার খিলিজি যদি ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সত্য সত্যই বঙ্গবিজয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, তবে তাহার মধ্যে একটী গভীর রহস্যময় চক্রান্ত নিহিত আছে। পলাসীর যুদ্ধ বিজয় পূর্ব্বক মুসলমানের হস্ত হইতে বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যা কাড়িয়া লইবার সময় লর্ডক্লাইব কয়জন সৈন্যের সাহায্যে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিপুল সেনানীর সম্মুখীন হইয়া পলাশীর যুদ্ধ জয় করিলেন, কি উপায়ে নবাবের সৈন্য সমূহ যুদ্ধে নিরস্ত হইলে, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র কয়জন ইংরাজ ও কয়জন ভারতবাসীর শোণিতে রঞ্জিত হইল, ইতিহাস চিরকালই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মোট কথা যেখানে অল্পশক্তির সাহায্যে প্রবলশক্তিকে পরাস্ত করিতে হয় সেই খানেই বিনা কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। যে সময়ে বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইয়াছিল সে সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থার কথা অথবা বাঙ্গালীর প্রকৃতির কথা যখন কোন ঐতিহাসিকই অবগত নহেন, তখন যে সকল ঐতিহাসিক ঐরূপ অবিশ্বাস অতিরঞ্জিত উপন্যাসের দ্বারা ইতিহাসের কলেবর পরিপুষ্ট করেন তাঁহারা যেরূপ প্রতারক, আর যাঁহারা ঐ সকল কল্পনাময় অতিরঞ্জিত উপন্যাসকে সত্যবোধে আস্থা করেন তাঁহারাও সেইরূপ নির্ব্বোধ।

যাহা হউক বক্তিয়ার খিলিজী যে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসীর স্বাধীনতা বিনাশ পূর্ব্বক বঙ্গরাজ্যে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন করিয়া-

ছিলেন এবং তদবধি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সাতশত বৎসর বাঙ্গালী পরাধীন, পরপদ দলিত, পরমুখাপেক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছে ইহা যে সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সপ্তশতবৎসর পরাধীন থাকিয়া কোন্ জাতি আজিও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে? সপ্তশতবৎসর ক্রমাগত বৈদেশিক দিগের অত্যাচার ও শাসন সহ করিয়া যে জাতি আজিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জীবনধারণ করিতেছে, যদি তাহাদিগকে কাপুরুষ ভীরু প্রভৃতি গ্লানিসূচক আখ্যায় অভিহিত কর তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব যে ইতিহাস পাঠ কর নাই। ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জ রোমানদিগের করায়ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ব্রিটীশনন্দনেরা স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছিল, রোমবাসী স্বাধীনতা হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে, গ্রীস দেশ যদিও তাহার সন্তানের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হওয়ায় কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সক্ষম হইয়াছিল কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রীক্-জাতি—যাহাদিগের জ্ঞান গরিমার আলোকে আজ ইউরোপ আলোকিত সেই প্রাচীন গ্রীক জাতির অস্তিত্ব চিরদিনের মত কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে—এইরূপে ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা কর দেখিতে পাইবে মিসর, পারশ্য, গ্রীক, রোম প্রভৃতি প্রাচীন জাতি রাজশক্তি বিহীন হইবামাত্রই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। আবার দেখ রণজিতের বিশাল রাজ্য ইংরাজের করায়ত্ত হইবার অল্পকাল পরেই শিখ জাতি স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে যে রাজপুত জাতি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বরাবর আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাও আজ স্বাধীনতা হারাইয়া বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, যে মহারাষ্ট্র জাতি দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশে "বর্গি" নামে অভিহিত হইয়া আবালবৃদ্ধ বণিতার মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন রাজশক্তি বিহীন হইবার পরেই তাঁহারা জাতি গৌরব হারাইয়া উদরান্ন সংস্থানের জন্য বিশ্বপর্য্যটন ব্রত



অবলম্বন করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর দেখিতে পাইবে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার নিমিত্ত যে সমস্ত নীচতা আসিতে পারে তদ্ব্যতীত বাঙ্গালী-হৃদয়ে জাতীয়ভাব সমভাবে রহিয়াছে। দীর্ঘকাল বহু বিপ্লবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াও বাঙ্গালী প্রকৃত বীরের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা এবং প্রাচীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়কালে জগতের প্রায় সমস্ত জাতিই মস্তক অবনত করিল, এমন কি মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত, অশোক পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বল এবং যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক বাঙ্গালীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বঙ্গসন্তান ফুৎকারে রাজশক্তির বিপুল বিক্রম উড়াইয়া দিল, তাহার পর ইসলামের প্রবল শক্তি এক হস্তে কোরাণ এবং অন্যহস্তে তরবারির সাহায্যে বঙ্গসন্তানকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত এবং সমস্ত বঙ্গদেশে মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বঙ্গসন্তান অটলভাবে সহ্য করিয়া তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিল, পরন্তু তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ বৈদেশিক ইংরাজের হস্তে তুলিয়া দিল। ইংরাজও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার, বন্ধুভাবপ্রদর্শন, হোটেল প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক বঙ্গবাসীকে নূতনতন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক প্রকারে প্রলোভিত করিলেন, মিশনরীরাও বিদ্যালয়াদির স্থাপন দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার প্রচার, জেনানা-মিশনি নিয়োগপূর্ব্বক বঙ্গরমণীর চিত্তাকর্ষণ প্রভৃতি বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীকে ধর্ম্মত্যাগ করাইবার জন্য কতই চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাঙ্গালী ইংরাজের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া একই ভাবে উন্নত মস্তকে আজিও অবস্থান করিতেছে। ইহা কি সামান্য বীরত্বের পরিচায়ক? সাতশত বৎসর রাজশক্তি বিহীন হইয়া, প্রতিনিয়ত বিধর্ম্মীদিগের প্রতিকূলাচরণ সহ্য করিয়া যে জাতি স্বাতন্ত্র্য রক্ষায়

সমর্থ হয় যদি সেই জাতি ভীরু কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত হয় তবে জগতে পুরুষকার কোন জাতির আছে তাহাও বলিতে পারি না! যাহারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জাতি ও বিধর্ম্মীর সংঘর্ষে আপনার শিরায় প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যরক্ত প্রবাহিত রাখিতে পারিয়াছে তাহারা হইল কাপুরুষ আর যে সকল জাতির শিরোমধ্যে আর্য্য অনার্য্য উভয় রক্ত বহিতেছে, আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া জেতৃজাতির সহিত রক্ত বিনিময় করিয়াছে তাহারা হইল বীরপুরুষ ইহা যিনি স্বীকার করিতে হয় করুন, যাঁহাদের বিন্দুমাত্র বিবেচনাশক্তি আছে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন না।

আরও একটু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন জাতি অপর জাতিকে স্বদেশে আনয়ন করিলে জেতৃজাতি প্রথমে বিজিত জাতিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিবার একমাত্র কারণ বিজিত জাতিকে অসম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। বিজিতজাতিকে সর্ব্বতোভাবে মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিতে না পারিলে জেতৃজাতি কখনই দেশশাসনে কৃতকার্য্য হয় না। এই নিমিত্ত রোমানদিগের আধিপত্য কালে তাঁহারা বিজিত জাতিদিগের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতেন, এবং তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেন ইংরাজ ও রোমানদিগের পন্থানুবর্ত্তনপূর্ব্বক বিজিত জাতিদিগকে অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করিয়া এবং তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জগৎশাসনে সমর্থ হইতেছেন। অস্ত্র আইনের কল্যাণে মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী জাতি ইংরাজের প্রসাদলাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া জীবন যাপন করিতেছে, অস্ত্রত্যাগ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বল নাই, মনে বিন্দুমাত্র সাহস নাই, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, সাহসসহকারে ইংরাজের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতে ঐ সকল জাতির হৃৎকম্প



উপস্থিত হয়। ইংরাজজাতি তাহাদিগকে মনুষ্য মধ্যেই পরিগণিত করেন না।

পক্ষান্তরে বাঙ্গালী জাতি সকল বিষয়েই ইংরাজের সমকক্ষতা লাভ করিতেছে। সাতশত বৎসরের পরাধীন জাতি অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইংরাজ জাতির মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। যে জাতি প্রবল পরাক্রম প্রভাবে জগৎ শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বাঙ্গালীর লেখনীকে তাঁহারা শঙ্কিত নেত্রে দর্শন করেন। বাঙ্গালীর লেখনী সঞ্চালনে বাধা প্রদান করিবার জন্য লর্ড লিটনের সময় হইতে লর্ড কর্জ্জনের সময় পর্য্যন্ত এই অষ্টাবিংশতি বৎসর কতই চেষ্টা হইল, কতই নূতন নূতন আইনের সৃষ্টি হইল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাঙ্গালীজাতিকে খৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্ববশে আনিবার জন্য ইংরাজ ও মিশনরীরা উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনাদির দ্বারা কতই চেষ্টা করিলেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা বঙ্গীয় ললনাবৃন্দের মন স্বধর্ম্মবিরত করিবার জন্য জেনানা মিশনি পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া কতই যত্ন করা হইল, কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালীর চেষ্টায় জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল, নিরস্ত্র বাঙ্গালীজাতি অস্ত্রগ্রহণে উদ্যত হইল, লুপ্তপ্রায় আর্য্যধর্ম্ম পুনরায় জাগিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

আজ প্রবল প্রতাপ ইংরাজ বাঙ্গালীর ভয়েই সতত অস্থির, বাঙ্গালীরা সভাসমিতি করিলে গবর্ণমেণ্ট অলক্ষ্যভাবে ডিটেক্‌টিভ নিয়োগ করিয়া থাকেন, বাঙ্গালীর সংবাদপত্রের অনুবাদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উচ্চ বেতনে শিক্ষিত অনুবাদক নিযুক্ত করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে সরকারে কাগজ পত্রের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার আইন করিয়া বাঙ্গালীর লেখনী ভীতির পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন।

এত করিয়াও গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিলেন

না। বাঙ্গালী-লেখনী-সঞ্চালন নিবৃত্ত করিবার জন্য লর্ড কর্জ্জন উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আর এই যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক আসামের অঙ্গপরিপুষ্টিকরণের চেষ্টা হইতেছে এই যে কিণ্ডারগার্টেন প্রথার প্রবর্ত্তনের দ্বারা শিক্ষার মস্তকে অশনি নিক্ষেপ করা হইতেছে ইহাও কি বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের তীব্রতা হ্রাস এবং বঙ্গবাসীর একতাবিনাশের চেষ্টা নহে? কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর লেখনী তীব্রতাবিহীন হইয়া জগজ্জয়ী সম্রাটের ভয়ে তাঁহাদিগের অন্যায় অত্যাচারমূলক কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ছাড়িতেছে? জিজ্ঞাসা করি ক্রমাগত এত চেষ্টা, এত কৌশল, এত ভীতিপ্রদর্শন করিয়াও মহাবল পরাক্রান্ত ইংরাজ বাঙ্গালীর লেখনীর তীব্রতা রুদ্ধ করিতে পারিলেন না কেন? অষ্টাবিংশতি বর্ষ নিয়ত চেষ্টা করিয়াও যাহাদিগের লেখনীর তীব্রতা হ্রাস হইল না, কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াও যে জাতির মনে প্রবল প্রতাপ ইংরাজ বিন্দুমাত্র ভীতির সঞ্চার করিতে পারিলেন না, সমরশায়ী ক্ষত্রিয় বীরের গৌরব জ্ঞানের ন্যায় কঠোর মুদ্রাযন্ত্রের আইনের দায়ে যাহারা ইংরাজের নরকসদৃশ কারাগারে গমনও গৌরবজনক বলিয়া বিবেচনা করে, যাহাদিগের তীব্র প্রতিবাদের ভয়ে দিগন্তব্যাপী আন্দোলনের আশঙ্কায় ইংরাজের ডিটেক্‌টিভবিভাগ বিনিদ্রনয়নে রাত্রি যাপনে বাধ্য হয়, কি ভারতপ্রবাসী, কি ইংলণ্ডবাসী সমস্ত ইংরাজসমাজ প্রবল পরাক্রমশালী হইয়াও সশঙ্ক মনে কালাতিপাত করিতেছেন, যদি তাহারা কাপুরুষ হয় তবে জানিনা প্রকৃত বীরত্ব কোন জাতির হৃদয়ে, কোন জাতির বাহুতে বিদ্যমান আছে, ইংরাজ অস্থিজীবীর বীরদম্ভ একমুহূর্ত্তে বিলুপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু মসীজীবী বাঙ্গালীর দর্প কিছুতেই খর্ব্ব করিতে পারিবেন না, বঙ্গবাসীর স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য। বৌদ্ধদিগের জ্ঞান বিস্তার, মুসলমানদিগের তরবারির আঘাতে যাহা বিনষ্ট



হয় নাই, ইংরাজের মোহিনীমায়ার প্রভাবে বা ভয়প্রদর্শনে তাহা বোধ হয় বিনষ্ট হইবে না।

ইংরাজ শিক্ষাবিস্তারের ব্যপদেশে বাঙ্গালী সন্তানকে মহাভারত রামায়ণের ভীষ্ম বা রামচরিত্রের পরিবর্ত্তে বিড়ালকুকুরের গল্প পড়াইয়া তাহাদিগের মস্তিষ্কবিকৃতি সাধনের চেষ্টা প্রতিনিয়ত করিতেছেন, জেলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে ভূরি পরিমাণে মদিরালয় স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জের নৈতিক চরিত্রমূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, ব্যবসায় বাণিজ্যে অত্যধিক শুল্কস্থাপন করিয়া বাঙ্গালীকে দাসত্বজীবী করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইতে পারিয়াছেন কি? অতএব যাহারা সপ্তশত বৎসর রাজশক্তিবিহীন এবং এই দীর্ঘ সময় মধ্যে প্রতিনিয়ত বিধর্ম্মীদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া বীরের ন্যায় উন্নত রহিয়াছে; তাহাদিগকে যে ব্যক্তি কাপুরুষ ভীরু বলিয়া বিদ্রূপ করে সে নিতান্ত অজ্ঞান। যে সকল কাপুরুষতা বা নীচতা তাহাদিগের হৃদয়ে আশ্রয় করিয়াছে সে কেবল দীর্ঘকাল পরাধীনতার বিষময় ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্য জাতি হইলে এতদিনে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত, বাঙ্গালীর বনিয়াদ নাকি খুব পাকা তাই এত বিপ্লবেও কেবল কতকগুলি দোষরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আজিও সে জীবিত আছে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

---

# কবিতার উপাদান।

সেদিন Walt Whitmanএর কবিতা পড়িতে পড়িতে এক কথা বার বার মনে উঠিতেছিল—হুইটম্যানের লেখাকে কবিতা কেন বলিব? গদ্য হইতে পৃথক করিবার জন্য পদ্যের মধ্যে এমন কি আছে

যাহা পদ্যকে পদ্য করে? ছন্দ কি কবিতার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে? হুইটম্যানের ছন্দমাত্রবিবর্জ্জিত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের এই যে ভাষাপ্রবাহ ইহাকে অন্য যে আখ্যাতেই অভিহিত করিনা কেন কিন্তু ইহা কি কবিতা? পক্ষান্তরে আমাদের দেশে আজকাল যে নিষ্ফল অনুকরণের ব্যর্থচেষ্টার সাক্ষীভূত কবিতা পুঞ্জ, যাহা 'শুধু কথার গাঁথুনী' মাত্র যাহা শুধু বিচিত্র শব্দ চয়নের অকারণ বাহুল্যে এবং ললিত ছন্দের মোহন ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া আধুনিক বঙ্গ ভাষার কবিতাকুঞ্জকে আলোক-লতার মত বেষ্টন করিয়া উঠিতেছে—তাহা কি কবিতা? তাহা যদি না হয় তবে কবিতার মূল উপাদান কি? জ্যামিতির সংজ্ঞা নিরূপণের মত আমরা যদি কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাই, তাহা হইলে কবিতা বলিলে যাহা বুঝা যায়, যাহা অনুভব করা যায় তাহা কখনই মনে আসিবে না, মনে হইবে যেন কথাটা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—ঠিকটি যেন বলা হইল না। তাই আমরা কবিতার কোন সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা না করিয়া ইহার মূল উপাদানগুলি যথাসাধ্য বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রাণ যেমন অতি সুনিপুণ ব্যবচ্ছেদকের ছুরিকাকেও এড়াইয়া যায় এবং যতই কেন আমরা মনুষ্যদেহকে খণ্ড খণ্ড করি না তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না তেমনি কবিতার যাহা প্রাণ তাহা যে এরূপ বিশ্লেষণে ধরা পড়িবে সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

কবিতার প্রথম উপাদান ছন্দ। এই ছন্দ লইয়া আলোচনা করিলে গদ্যের সহিত পদ্যের মূলগত পার্থক্য কতক বুঝিতে পারা যায়। কবিতার কারবার feeling লইয়া সেইজন্য তাহার আত্মগোপন করিবার এত চেষ্টা, এত আয়োজন। যাহা আমার হৃদয়ের গোপন কথা, যাহা কেবল মাত্র আমারই কথা, যাহা পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিগত—personal, সে কথা যদি আমি সোজাসুজি বলিয়া ফেলি তাহা হইলে সকলের নিকটেই প্রত্যাখ্যাত হইবে—কেন না সে কথা শুনিবার গরজ আর কাহারও নাই—



কবিতা তাই নিজের সেইটুকু সযত্নে আবৃত করিয়া সকলের সমক্ষে বাহির হয়। তাই তাহার এত সাজসজ্জা, তাই তাহার এত প্রসাধন বাহুল্য, এত অলঙ্করন-নৈপুণ্য। এ সম্বন্ধে স্ত্রীপ্রকৃতির সহিত তাহার অত্যন্ত মিল—কেন না দুয়েরই কারবার ঐ feeling লইয়া। তাই উভয়েই আপনার চারিদিকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের গণ্ডি সৃজন করে, তাই তাহাদের আত্ম গোপনের এত প্রয়াস। feeling জিনিষটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু তাহাকেই গোপন করিবার জন্য এত আয়োজন। প্রত্যাখ্যান ভয়ে নিজের দৈন্য ঢাকিয়া রাখিয়া তাহাদের পরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়। তাই—রঞ্জিত বসনে, কেয়ূরকঙ্কণে সিন্দূরবিন্দুপাতে, কজ্জলরাগে, প্রসাধনশিল্পের সাহায্য লইয়া তাহাকে পরের হৃদয় মুগ্ধ করিতে হয় তখন আর গরজ যেন তাহাদের নহে দর্শকের। তাই তাহাদের এত চেষ্টা করিয়া নিজের অকৃত্রিমতা লুকাইয়া কৃত্রিম হইতে হয়। এই জন্যই কবিতার ভাষা ছন্দোবদ্ধ—ছন্দ সম্পদে সুসজ্জিত। পক্ষান্তরে গদ্য যুক্তিপ্রধান সেখানে গরজ পাঠকের—তাই তাহাকে মনোরঞ্জনের জন্য এত লাবণ্যের সংগ্রহ করিতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ছন্দ অস্বাভাবিক নহে। নির্ঝরিণী যেমন পর্ব্বতগৃহ ছাড়িয়াই আপন মোহন কলঝঙ্কারের সঙ্গীত গাহিয়া উঠে, কবিতা তেমনি আপনার ছন্দসম্পদ লইয়াই কবিহৃদয়ে জন্মলাভ করে ছন্দোবদ্ধ হইয়াই সে বাহির হয়। যে মহান্ ছন্দ সমুদ্রকল্লোলে, যাহা স্রোতস্বতীর কলধ্বনিতে, যাহা পিককূজনে, যাহা মর্ম্মরমুখর মহারণ্যের মধ্যে, যাহা অনন্ত আকাশে চিরবিরাজিত কবি তাহাদেরই কাছে ইহা লাভ করিয়াছেন। গানের সুর যেমন,

"মেলি দিয়া সপ্ত সুর সপ্ত পক্ষ মর্থভারহীন,"

হৃদয়কে অনন্তের সহিত যোজনা করিয়া তাহার সহিত আমাদের একটা

নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করে, চিত্রের বিচিত্র বর্ণবিন্যাস যেমন তাহাতে জীবনদান করে—ছন্দও তেমনি "মানবের জীর্ণ বাক্যে" নূতন শক্তি, নূতন প্রাণ দিয়া,

"অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে পক্ষবান অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি—"

সে আমাদের মর্ত্তের এই অর্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ ভাষাকে লইয়া,

"যাবে চলি মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে
কথারে ভাবের স্বর্গে মানবেরে দেবপীঠ স্থানে।"

কবিতার দ্বিতীয় উপাদান ভাব সূচনা ( suggestiveness )। চিত্রকর যেমন তাঁহার মোহিনী তুলিকাস্পর্শে রেখামাত্রপাতে আমাদের চক্ষের সমক্ষে স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেন, কবিও তেমনি ভাষার কুহকে আমাদের হৃদয়কে কল্পনালোকে লইয়া যান; অন্যত্র যে কথা শুধু শব্দমাত্র তিনি তাহারই চতুর্দ্দিকে ভাবের ছায়ালোকপাতে আমাদের হৃদয়কে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে উপস্থিত করেন। তখন কথা শুধু কথা নহে, তাহা ছবি, তখন "move is meant than ,meets the ear," —তখন তাহা আমাদের মনে সৃজনীশক্তি উদ্রেক করে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ, জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতার" সহিত কুমারসম্ভবের শ্লোকের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ইহার মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে, সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দ সঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।" এ কথা কবিতামাত্রেই প্রযোজ্য। এই ভাবসূচনাই কবিতার "সোণার কাঠি" যাহার স্পর্শে সে রোমাঞ্চ কলেবরে না



জাগিয়া থাকিতে পারে না। তখন তাহার একটি কথা আমাদিগের নিকট ভাবের জীবন্ত প্রস্রবণ হইয়া উঠে।

কবিতার তৃতীয় উপাদান কল্পনা। এই কল্পনা লইয়া আমাদের একটু মুস্কিল আছে। কবিতার একটি প্রধান অঙ্গ যে কল্পনা এ বিষয়ে কাহারো সহিত আমাদের মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই; অথচ গোলযোগ এইখানেই—তাহার কারণ জিনিষটাকে লইয়া নহে ইহার মাত্রা লইয়া। হৃদয় যেমন মনুষ্যত্বের একটা প্রধান উপাদান, কিন্তু সেই হৃদয় যখন মাত্রা ছাড়াইয়া বুদ্ধিবিবেচনা গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়ায়—তখন তাহাকে sentiment না বলিয়া আমরা sentimental nonsense নামে অভিহিত করিয়া থাকি। কবিতার মধ্যে কল্পনা সম্বন্ধে একথা বেশ খাটে। কল্পনাকে আমরা কবিতার হৃদয় বলিতে পারি। মনুষ্য-হৃদয়ে যেমন সংযম আবশ্যক, কল্পনার তেমনি সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। জগতের এই যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উদ্দাম শক্তিপুঞ্জ ইহাদিগকে মানবের কাজে আনিতে হইলে তাহাদিগকে নানা উপায়ে নিয়মিত—সংযত করিয়া লইতে হয়; তেমনি আমাদের এই "পক্ষবান অশ্বরাজ সম উদ্দাম" চপলগতি কল্পনাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইলে ইহার গতি সংহত করিয়া লইতে হইবে। সঙ্গীতের সুর যেমন মাত্রার গণ্ডিতে আবদ্ধ; কম হইলেও বেসুরা বেশী হইলেও বেসুরা। কবিতার মধ্যে কল্পনা সম্বন্ধেও তাহাই;—কম হইলে ইহা common-place, prosaic, পক্ষান্তরে মাত্রা বেশী হইয়া গেলে ইহা কোলরিজের "কুবলাখাঁ"র মত অহিফেনসেবীর স্বপ্নাবস্থায় কথিত, অসংবদ্ধ প্রলাপ বাণীর মত শুনায়। সুনিয়মিত, সুসংযত কল্পনা যে কেবল কবিতাতেই আবশ্যক তাহা নহে, বিজ্ঞানের ইহা চিরসহচরী এবং দর্শনের ইহা নিত্য সহায়। তাই বলিতেছিলাম কবিতার হৃদয় এই কল্পনার দোষ গুণ মাত্রায়।

কল্পনার অভাবে কবিতা হৃদয়হীন ইহার আধিক্যে কবিতা উচ্ছ্বসিতের প্রলাপমাত্র, কবিতা নামের অযোগ্য।

কবিতার চতুর্থ এবং প্রধান উপাদান—সত্য। কল্পনা যদি কবিতার হৃদয় হয় তবে সত্য কবিতার প্রাণ। প্রকৃত কবিত্ব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহা কবিতার মেরুদণ্ড। সত্যের অভাবে কবিতা শুধু ছন্দোবদ্ধ সুললিত ভাষার খেলামাত্র শুধু প্রাণহীন সুন্দর মৃৎপুত্তলিকা। সেইজন্য সুবিজ্ঞ সমালোচক Mathew Arnold কবিতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Poetry is nothing but the most perfect speech of man in which he comes to nearest to utter the truth."—এই সত্য প্রচারই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য এবং ইহার সাধনাই কাব্যের চরমোৎকর্ষ। কিন্তু 'সত্য' কথাটায় একটু গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। অনেকে হয়ত বলিবেন যে সত্য যদি কবিতার প্রধান উপাদান হয় তাহা হইলেও ইতিহাস ছন্দোবদ্ধ লিখিলেই, উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে। এবং এ হিসাবে বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, সেক্‌সপিয়ার প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য-সকল কবিত্ব মাত্রহীন। "সত্য" অর্থে আমরা ঐতিহাসিক সত্য বা truth of factsএর কথা বলিতেছি না। কাব্যের সত্য এবং বাস্তব সত্য এক নহে। মনুষ্যজীবনের যাহা প্রাত্যহিক ঘটনা কাব্যের তাহা বিষয়ীভূত নহে। ইতিহাসের রাম অথবা সীতার জীবন যাহাই হউক না কেন কবির নিকট তাহার কোন সত্তা নাই। আমরাও সেজন্য কবির নিকট কোন কৈফিয়ৎ চাহি না। বরঞ্চ আমরা কবির সহিত বলিয়া উঠি—

"সেই সত্য যা, রচিবে তুমি
ঘটে যা' তা' সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"



সেইজন্য কোন লেখক কবিতাকে apparent pictures of unapparent realities বলিয়াছেন। কবিতা বহুকাল হইতে "imitation of nature" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—ইহার অর্থ এমন নহে যে কবিতা কেবল প্রকৃতিদেবীর নিখুঁত অনুকরণ—বিশ্বসংসারে যাহা আছে বা হইতেছে তাহারই অবিকৃত রিপোর্ট লেখা কবির কার্য্য নহে। মানব জীবনের বিশ্লেষণ তাঁহার কাজ। "কি আছে" তাহা দেখাইবার ভার তাঁহার নহে কিন্তু "কি হইবে" বা কি "হওয়া উচিত" তাহারই চিত্র তিনি আঁকিবেন। তাই Hegel বলিয়াছেন—

That which exists in Nature is something purely individual and particular. Art, on the contrary is essentially destined to manifest the general."

এই "manifestation of the general" ইহাই সত্য। জগতের এই যে বিচিত্রতা ইহারই মধ্যে সেই নিত্য সেই সত্যের প্রকাশ। কাব্য তাহাকেই ভাষা দান করে। কবি এই বিচিত্রের মধ্যে সেই সামঞ্জস্যের উপলব্ধি করেন। এই সামঞ্জস্যলাভে যে আনন্দ, কবিতা তাহা হইতেই জন্মলাভ করে এবং কাব্য তাহারই প্রকাশ।

---

## কবির ফুল।

( ফাল্গুন মাসের "নব্যভারতে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিত "কলিকা ও ফুল" প্রসঙ্গে )

১

কবি, বলনা আমায়, আছে কি ধরায়
এখনো তোমার ফুল হে,

আমি একটী পর্ণ কনক বর্ণ
ছিঁড়িয়া গড়াব দুল হে।
শেষে, ফিরে এসে যবে, সোহাগের ভরে
গৃহিণী দেবীরে ডাকিয়া,
দিয়া আপন হস্ত করিব ন্যস্ত,
সোনাটুকু যাবে বাঁচিয়া।

২

কবি, কত সাধ মনে, শুনিব শ্রবণে,
কতকাল সেই কলিকা
ছিল বসন্ত রাজার আনন্দ বাজার
উজলি, লাজুক বালিকা।
সেই মধুমাস গুলি একবার খালি
হাসিত না কি হে বছরে,
আর সারাটি বছর কে হে, কবিবর,
তুষিত তাহারে আদরে?

৩

সেই কুসুমশোভন যেই কুঞ্জবন
করিতেছে আজি আলো হে,
মোরে দাও না দেখায়ে, পড়িব লোটায়ে,
মাটীটুকু বড় ভালো হে।
কবি, করো না হে ভয়, এ পোড়া হৃদয়
চাহে না তোমার ফুলটী,
শুধু একটী পর্ণ সোণার বর্ণ
দিও হে গড়াতে দুলটী।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩১১। ৩য় সংখ্যা।

## ডাক্তার সরকারের জীবনী।

"Not in the camp his victory lies
Or triumph in the market place,
Who is his Nation's sacrifice
To turn the judgment from his race."

পৃথিবীর যে কোন স্থানেই হউক 'ডাক্তার সরকার' বলিতে একমাত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকেই বুঝায়। মহেন্দ্রলালের যশোরশ্মি কেবল ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে—তাহা সুদূর আমেরিকায়ও প্রতিভাত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মনি, বেলজিয়ম, ইটালি, গ্রীস্, রুষিয়া, মেক্সিকো, ব্রেজিল, জামাইকা, কিউবা—সকল দেশীয় সভ্য সমাজেই ডাক্তার সরকারের নাম পরিচিত। অষ্ট্রেলিয়া হইতেও তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মতামতের জন্য পত্র আসিত। তাঁহার নির্ব্বাচিত ঔষধি সর্ব্বদেশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। সামান্য কৃষককুলে জন্মিয়া অন্নহীন, পিতৃমাতৃহীন, অসহায় মহেন্দ্রলাল কি গুণে সমস্ত সভ্যসমাজের বরেণ্য হইয়াছিলেন তাহা বঙ্গবাসী কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

অদ্য আমরা মহৎ জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিব।

ডাক্তার সরকার হাবড়ার ১৮ মাইল পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ খৃঃ অঃ ২রা নভেম্বর এক অতি দরিদ্র সদ্‌গোপ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺তারকনাথ সরকার; মাতার নাম ৺আতরমণি দাসী। তারকনাথের সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কোনরূপ কায়-ক্লেশে দিনাতিপাত হইত; কিন্তু তেজস্বিতা ও সরলতা উক্ত বংশের প্রধান গুণ ছিল। ডাক্তার সরকার বলিতেন "আমার চরিত্রে যদি আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন গুণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের নির্ভিকতা ও স্বাবলম্বনপ্রিয়তা; তাঁহারা স্বার্থের জন্য কখন আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দেন নাই।" ডাক্তার সরকার যে বংশে জন্মিয়াছিলেন সে বংশকে লোকে চাষা বলিয়া উপহাস করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাষা পদবী উপহাসের সামগ্রী নহে, যে দিন হইতে মানুষ চাষ করিতে শিখিয়াছে সেইদিন হইতেই তাহারা সভ্যতার পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। 'আর্য্য' কথার একটি অর্থ ই চাষা। ডাক্তার সরকারের অধিকতর গর্ব্বের বিষয় এই যে সামান্য কৃষক বংশে জন্মিয়া তিনি উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহাকে 'চাষা' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিত তাহাদিগকে তিনিও কর্ণের ন্যায় গর্ব্বের সহিত বলিতে পারিতেন—

"চাষা বা চাষা পুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্
দৈবায়ত্তং কুলে জন্মঃ মদায়ত্তঃ পৌরুষম্।"

যখন মহেন্দ্রলালের বয়স ৫ বৎসর মাত্র, তখন ৩২ বৎসর বয়সে তারকনাথের মৃত্যু হয়, পিতার মৃত্যুর পর সংসার অচল হইল, মাতা মহেন্দ্রলাল এবং ৬ মাসের আর একটী শিশু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা নেবুতলায় ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের আলয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারকনাথের মৃত্যুর সময় মহেন্দ্রলাল



মাতুলালয়েই ছিলেন, কেবল পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য একবারমাত্র পাইকপাড়া গিয়াছিলেন, এই তাঁহার জন্মভূমির নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রলাল প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের নিকট সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা লাভ করেন, পরে ৺ঠাকুর দাস দেবের নিকট ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরদাস বাবু অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার বিমল চরিত্র ও ছাত্র বাৎসল্য অল্প-দিনেই মহেন্দ্রলালের কোমল হৃদয় আকর্ষণ করিল। যদিও মহেন্দ্রলাল দেড় বৎসর কালমাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তথাপি আজীবন ঠাকুরদাসের নামের সহিত তাঁহার গভীর ভক্তি ও ভালবাসা জড়িত ছিল। ঠাকুরদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি তিনি নিতান্ত স্বজনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

ডাক্তার সরকারের পিতার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে তাঁহার জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল জীবন প্রভাতেই পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত হন, জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াও মহেন্দ্রলাল সে দুঃখ ভুলিতে পারেন নাই। পথে যখন গাহিত—

হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার
যাহে সর্ব্বলীলে প্রকাশিলে, প্রসবিলে ত্রিসংসার।

* * * * * * *

মাতৃহীন বালক যারা কি দুঃখে দিন কাটায় তারা
জানেন মা তারা।
তারা দীন হীন কাঙ্গালের পারা চক্ষে ধারা অনিবার।

তখন তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। একদিন বেহালার সহিস গায়ক গাহিতেছে—

"ওই বদনভরা মা কথাটীর তুল্য কথা নাই হে আর।" মহেন্দ্রলাল বসিয়া শুনিতেছিলেন, দুইফোঁটা আঁখিজল শাসন টুটিয়া কপোলতলে

গড়াইয়া পড়িল, চক্ষু মুছিয়া ডাক্তার বলিলেন—'কথাটা বড়ই সত্য'। মহেন্দ্রলালের ভ্রাতা চুণীলাল সরকার ২৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন; সেই ভ্রাতার কথাও তিনি দুঃখের সহিত কতবার উল্লেখ করিতেন।

১৮৪০ খৃঃ অঃ মহেন্দ্রলাল হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন, কিন্তু পীড়িত থাকায় অনেক দিন স্কুল কামাই হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নাম কাটিয়া দেন, কিন্তু উমাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুগ্রহে তিনি পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি হইতে অনুমতি পান। উমাচরণবাবুর নাম ডাঃ সরকার কৃতজ্ঞতার সহিত বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। হেয়ার স্কুলের হেড-মাষ্টার উমাচরণ বাবু ডিরোজিওর মত ছাত্রগণের বড়ই প্রিয় ছিলেন, তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও মধুর ছিল, তিনি ভাল ভাল ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করিয়া ছাত্রগণকে শুনাইতেন। শিশু মহেন্দ্র-লাল প্রথম হইতেই প্রিয় শিক্ষককে অনুকরণ করিতেন, সেইজন্যই পরিশেষে মহেন্দ্রলাল বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণের জন্য যশোভাজন হইয়া-ছিলেন। মহেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই সুন্দর ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহার শিক্ষক মিঃ টুনটিম্যান তাঁহার প্রবন্ধ আহ্লাদের সহিত বন্ধু বান্ধবকে শুনাইতেন।

১৮৪৯ খৃঃ অঃ মহেন্দ্রলাল হেয়ার স্কুলের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি হিন্দু কলেজেও সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। তাঁহার ছাত্র জীবন সমুজ্জ্বল ও সুখকর। তিনি ক্ল্যাসে কখন দ্বিতীয় হন নাই, প্রাইজ মেডেল তাঁহার একচেটিয়া ছিল। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। সিনিয়র বৃত্তি লাভের পর মহেন্দ্রলাল আর হিন্দু কলেজে থাকিতে চাহিলেন না, শিক্ষকগণ তাঁহাকে আরো কিছুদিন সাহিত্যাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তখন মহেন্দ্রলালের জ্ঞান পিপাসা



অতিশয় প্রবল, Mills Logic প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি একটা প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারি-লেন না, কোনরূপে শিক্ষকগণের অনুমতি লইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতেই মহেন্দ্রলালের মন বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি কোন নূতন বস্তু দেখিলেই তাহা কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এই জ্ঞান পিপাসা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবল ছিল। তিনি কোন বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। নূতন তত্ত্ব জানিবার জন্য ঔৎসুক্য তাঁহার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। যখন মেডিকেল কলেজে পড়িতেন তখন মহেন্দ্রলালের মাতুল তাঁহাকে Rev. Milner প্রণীত Tour round the creation নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিতে দেন। মহেন্দ্রলাল পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। সৃষ্টির বিশালত্ব মনে করিয়া, ভক্তিপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। সময় সময় বিমনা হইয়া নগ্ন পদে পথে পথে পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। তিনি শেষ বয়সে গাহিয়াছেন—

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগন মণ্ডল
কি শোভা ধরেছে সেথা গ্রহতারা দলে
যেন প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পদলে
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণ কমলে

* * * * * *

ছড়ায়ে ধূলি একমুষ্টি তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধূলাখেলার ছলে।
শঙ্কর মহাপ্রলয় করিতে নিবারণ—
বন্ধন করেছেন তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলে।

বিজ্ঞানকে তিনি জীবনের সাথী করিয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগের ফল "বিজ্ঞান সভা"।

যখন মহেন্দ্রলাল মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় (১৮৫৬ বৈশাখ মাসে) তাঁহার বিবাহ হয়, পত্নী 'রাজকুমারীর' বয়স তখন ১০ বৎসর। মহেন্দ্রলালের শ্বশুর মহাশয় অতি সদাশয় লোক ছিলেন, তিনি লোককে খাওয়াইতে ও দান করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহার হৃদয় ভরা স্নেহে মহেন্দ্রলাল প্রকৃতই মুগ্ধ হইতেন। মহেন্দ্রলালের দাম্পত্যজীবন অতিশয় সুখকর, তাঁহার পত্নীর গুণগ্রাম তিনি সকলের সমক্ষে আহ্লাদের সহিত বলিতেন, উহাঁদের পরস্পরের ভালবাসা সাংসারিক জীবন অতিশয় শান্তিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ডাঃ সরকার পত্নীকে যেরূপ সম্মান ও ভালবাসার সহিত ব্যবহার করিতেন তাহা ইদানীং বিরল। তিনি আজি কালিকার যুবকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেন। স্ত্রীজাতির উপর তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—

"I must, say, however that my devotion to woman as the guardian angel of infant humanity, my reverence for woman as our first preceptor, my love of woman as the sweetener of life, have not been derived from Western education, nor from our sastras. They are inherent in me and the great wonder with me is, how any man can be void of them.

১৮৬০ সালে মহেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল এম এস, এফ সি এস,এর জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র অনুগত, পত্নী প্রিয়বাদিনী, তাঁহার দুঃখেও সুখ, ডাঃ সরকারের শৈশব ভিন্ন সমস্ত জীবনই অতি সুখকর ও শান্তিময়—চাণক্য বলিয়াছেন—



অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে।

ডাক্তার সরকার এ সুখ জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা ডাক্তার সরকারের ছাত্রজীবনের কথা বলিতে বলিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মেডিকেল কলেজে ডাক্তার সরকার প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে প্রথম হইতেন, 'মেডিসিন', সার্জ্জারি, মিডওয়াইফারী, এনাটমী সকল বিষয়েই মেডেল পাইতেন, বৃত্তি মেডেল প্রভৃতিতে মহেন্দ্রলালের সমস্ত কলেজজীবন বিভূষিত। তিনি ছাত্রজীবনেই চিকিৎসা বিষয়ক নূতন নূতন পুস্তক ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করিতেন। সময় সময় তিনি এ বিষয়ে তাঁহার অধ্যাপকগণেরও অগ্রগামী ছিলেন। যখন মহেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন তখন একদিন তিনি একটী আত্মীয়ের পীড়া দেখাইবার জন্য outdoorএ যান, তিনি ঔষধ লইয়া আসিতেছেন এমন সময় ডাঃ আর্চ্চার পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে চক্ষুবিষয়ক একটী প্রশ্ন করেন; ছাত্রেরা উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায়, মহেন্দ্রলাল দূর হইতে সেই প্রশ্নের উত্তর দেন। ডাঃ আর্চ্চার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তর কে দিল'? মহেন্দ্রলালকে অনেকেই চিনিত। তাহারা বলিল 'একজন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র' ডাঃ আর্চ্চার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় বলিলেন 'দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে? তাহাকে ডাকো' মহেন্দ্রলাল উপস্থিত হইলে ডাঃ আর্চ্চার উপর্য্যুপরি কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন করিলেন, মহেন্দ্রলাল সকলগুলির উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়ায় ডাঃ আর্চ্চার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মহেন্দ্রলালকে নিয়মিত চক্ষুচিকিৎসাগারে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। যখন ডাঃ সরকার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণকে তিনি আলোক সম্বন্ধে উপদেশ

দিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অঃ তিনি এম ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গৌরব মুকুট ধারণপূর্ব্বক কলেজ পরিত্যাগ করেন।

যখন মহেন্দ্রলাল যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে আশার উজ্জ্বল মূর্ত্তি, হৃদয়ভরা উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। দিন দিন তাঁহার সুনাম ও সুচিকিৎসার গুণ প্রচার হইতে লাগিল, সুখ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল, চিকিৎসককুল সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ডাঃ ফেরার তাঁহার গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে যখন British Medical Associationএর ভারতীয় শাখা স্থাপনের 'উদ্যোগ সমিতি' গঠিত হয় তখন মহেন্দ্রলালকে তিনি সভাপতি মনোনীত করেন। ডাঃ সরকার প্রথমে ঐ সভার সম্পাদক ও পরে উহার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন।

ডাক্তার সরকার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নাম এদেশে কেহ জানিত না। কেবলমাত্র বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দুএকজন রোগীকে ঐ চিকিৎসা দ্বারা উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার করিতেছেন মাত্র, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই ডাক্তারী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন বলিয়া, চিকিৎসার তত প্রচার হয় নাই। ডাক্তার সরকার প্রথমে হোমিওপ্যাথির নাম শুনিয়াই উপহাস করিতেন। 'জলপড়া' চিকিৎসাকে তিনি কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি British Indian Association সভায় হোমিওপ্যাথির অশেষ নিন্দাবাদ করেন। কিন্তু শত্রু মিত্র হয়, নিন্দুক ভক্ত হয়, এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে। শত্রু যখন মিত্র হয় তখন তাহার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ, তখন সে মিত্রের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দেয়, জগত একে তন্ময় দেখে, নিন্দুক ভক্ত হইলে তাহার নিন্দাবাদ প্রশংসায় পরিণত হয়, সমস্ত অভক্তি প্রগাঢ় ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত দোষে অন্ধ হইয়া সে তাহার গুণ রাশিতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে।



ডাক্তার সরকারেরও তাহাই হইল। তিনি রাজেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রথমে quack বলিয়া উপহাস করিতেন; কতবার তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ডাক্তার সরকার চিরকালই সত্যের সেবক, সত্যের পূজক, যাহা সত্য তাহা ডাক্তার গ্রহণ করিতে নিমেষের জন্যও সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন। যখন তিনি গোপনে দেখিতে লাগিলেন রাজেন্দ্র দত্ত কয়েকজন উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন, যখন দেখিলেন হোমিওপ্যাথি মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতেছে তখন ডাক্তারের দৃঢ় বিশ্বাসের মূল কিঞ্চিৎ শিথিল হইতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ তিনি Morgan's Philosophy of Homœopathy নামক একখানি পুস্তক Indian Fieldএ সমালোচনার জন্য পান। তিনি এতদিন হোমিওপ্যাথির অমূলকতা ও ভ্রমপ্রদর্শনের অবকাশ খুঁজিতেছিলেন, এ শুভ সুযোগ ছাড়িবেন কেন? আহ্লাদের সহিত হোমিওপ্যাথির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন, পুস্তকখানি প্রথমবার পড়িলেন, দ্বিতীয়বার পড়িলেন, তৃতীয়বার পড়িলেন, যে ডাক্তার পুস্তক প্রাপ্তির সময় বলিয়াছিলেন 'ইহার আবার সমালোচনা কি? ইহা অবৈজ্ঞানিক, আমি এখনি ইহার ভ্রম দেখাইয়া দিতেছি' সেই ডাক্তার পুস্তক পাঠান্তে বলিলেন 'হোমিওপ্যাথি অবৈজ্ঞানিক নহে, ইহার ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর ন্যস্ত।' এই সময় রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসায় তাঁহার মাতুল অসাধ্য শূলরোগ হইতে আরোগ্য হওয়ায় ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল।

ডাক্তার সরকার যখন বুঝিলেন হোমিওপ্যাথি অবৈজ্ঞানিক নহে, তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রকাশ্য সভায় সমগ্র এলোপ্যাথি ডাক্তারগণের সম্মুখে বলিলেন 'হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালী, আমি ইহাতে বিশ্বাস করি এবং এই প্রণালী মতে চিকিৎসা করিব'। চারিধারে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, এলোপ্যাথি ডাক্তারগণ

মহেন্দ্রলালকে 'একঘরে' করিবার প্রস্তাব করিলেন। ঘৃণার চক্ষে সহপাঠিগণ সরকারের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। দরিদ্র মহেন্দ্রলাল সবেমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থ ও সম্মান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, অন্নহীন কৃষকপুত্র অর্থের লোভ ছাড়িয়া সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া, কলঙ্কের কণ্টকমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া পদে পদে, রোষ, ঘৃণা, দরিদ্রতা, অপমান সহ্য করিয়া নূতন পথে প্রয়াণ করিতে সাহসী হইবেন কি? এ বড় বিষম সমস্যা, যাহার অনশনের সম্ভাবনা, যাহার একদিনের অন্ন নাই সে কোন সাহসে, অপরিচিত মার্গে গমন করিবে? উদরান্নের সমস্যা, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, ডাক্তার সরকার কি তাহা বুঝিতেন না? বুঝিতেন। কিন্তু কি করিবেন তিনি সত্যের অপমান করিতে অসমর্থ। তিনি অর্থের পিয়াসী বা সম্মানের ভিখারী নন। যখন ডাক্তার ফেরার বলিলেন 'মহেন্দ্র কর কি? তোমার ব্যবসা যে মাটী হইবে, জীবিকা নির্ব্বাহের বিষয় একবার ভাবিয়ো'। মহেন্দ্রলাল অবনত মস্তকে বলিলেন—'ক্ষতি লাভের কথা গণনা করিতে পারিতেছি না, যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহা না করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে'। সমস্ত ভুলিয়া ডাক্তার সরকার সত্যের অনুসরণ করিলেন।

নব পথাবলম্বী মহেন্দ্রলালকে অন্যান্য ডাক্তারগণ অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। যখন ডাক্তার সরকার ভারতীয় British Indian Associationএর 'On the supposed uncertainty in Medical science and on the Relationship between Diseases and their Remidial Agents.' নামক বক্তৃতায় হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার বিশ্বাস স্বীকার করেন তখন চিকিৎসকগণ রোষে জ্ঞানহীন হইয়া উঠিলেন; ডাঃ ওয়ালার ক্রুদ্ধবচনে বলিলেন "Dr. Sircar! If you speak a word more we will turn you out of the room." ডাক্তার সরকার ধীরভাবে সকল আক্রমণ সহ্য করিয়া গৃহে ফিরিলেন, তিনি সেদিনের ঘটনা উল্লেখে বলিয়াছেন—But I was conscious of my position as defender, however humble of a Fact in science, and I knew full well that to lose temper would be but to lose my cause, at least for the time being. Backed by its omnipotence, I held on them and I hold on still in the firm belief—'Great is truth and will prevail.' হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অবলম্বন করিলে ডাক্তার সরকারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা তিনিই সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন—Persecution has already commenced. Professional combination has become strong against me, and is likely to be stronger. Every man's arm seems to be raised against me, but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been and be raised against none. It is probable my bread will be affected, but I shall spoke as never man spoke that as beings instinct with Reason and made in the image of our Creator, we must not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of god. এই সময়ের প্রথম ৬ মাস ডাঃ সরকারের একটী ডাকও হয় নাই, তিনি এই কয়মাস দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে হোমিওপ্যাথি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। জ্ঞান পিপাসু মহেন্দ্রলালের জীবনে এ মাস কয়টী অমর।



মহেন্দ্রলাল সত্যের জন্য সত্যকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরিশেষে সত্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিল। সত্যের জয়

চিরকাল। মহেন্দ্রলালের জয় হইল। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্রলালের চিকিৎসা প্রণালী চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল, দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য নরনারী অসাধ্য রোগ হইতে তাঁহার চিকিৎসা গুণে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল, মহেন্দ্রলালের যশোসৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, চিফ জষ্টিস্, লাট, কৌন্সিলের মেম্বর, রাজা, মহারাজা—প্রভৃতি শত শত মহোদয় রোগ মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইতে লাগিলেন। ইংরাজ বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল জাতিরই তিনি সমভাবে প্রিয় হইয়া উঠিলেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। অভ্যস্থ অধ্যবসায়ে, মস্তকে রৌদ্র জল ধরিয়া ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত দরিদ্র ও অসমর্থ রোগীগণকে বিনা-মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। এখন পর্য্যন্ত সমভাবে সেই ঔষধ বিতরণ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পিতৃকীর্ত্তি লোপ হইতে দেন নাই। আপনার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রতিদিন প্রভাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রোগী দেখিয়া ঔষধ বিতরণ করেন।

১৮৭০ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ইহার ৮ বৎসর পরে তিনি সেনেট কর্ত্তৃক চিকিৎসা বিভাগের সভ্য মনোনীত হন, কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা চিকিৎসকগণের ষড়যন্ত্রে তিনি সে বিভাগে আর স্থান পান নাই। ঐ সকল চিকিৎসকই একদিন তাঁহার এম ডি ডিক্রি কাড়িয়া লওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮৯৩ খৃঃ অঃ তিনি faculty of arts এর সভাপতি নিযুক্ত হন, ঐ পদে তিনি ৪ বৎসর ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ৪০ বৎসর সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। লর্ড রিপন মহেন্দ্রলালের গুণগ্রামে বিমোহিত হইয়া সি,আই,ই,উপাধি দান করেন। ১৮৮৭খৃঃ অঃ



তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন, ৪ বৎসর কাল তিনি ঐ পদে ছিলেন পরে শরীরের অসুস্থতা প্রযুক্ত স্বইচ্ছায় উক্ত পদ ত্যাগ করেন। সার বিচার্ড গার্থ তাঁহাকে কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত করেন। ১৮৯৮ খৃঃ অঃ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি,এল,উপাধি পান। লর্ড কর্জ্জন তাঁহার অনেক প্রশংসাবাদ করেন ও আপনার পার্শ্বে বসাইয়া স্বীয় অশ্বযানে আরোহণ করাইয়া অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রষ্টী ও এসিয়াটিক সোসাইটীর কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন, ইহা ছাড়া তিনি ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকার অসংখ্য সভার সভ্য ও অসংখ্য পত্রিকার লেখক ছিলেন। তিনি জীবনে কত কার্য্য করিয়াছেন তাহার সমস্ত বিবরণ বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তিনি শিক্ষা রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা কার্য্য করিয়াছেন। কি রোগীর শয্যাপার্শ্বে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি লাট সভায়, কি মিউনিসিপাল সভাগৃহে তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা ও গভীর জ্ঞানের জন্য সম্মানিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চান্সালরের অনুপস্থিতিতে তিনিই তাঁহার কার্য্য করিতেন। তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার কার্য্য তৎপরতার, সহিষ্ণুতার ও মনীষার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান সভা স্থাপন তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিশুকাল হইতেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়, the child is the father of man জীবন প্রভাতে যাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, জীবন মধ্যাহ্নে তাহাই সুমহান বৃক্ষে পরিণত হইল। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ ডাক্তার সরকার Calcutta Journal of Medicine প্রকাশ করেন, তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই পত্রিকার জন্য একাকী খাটিয়াছেন। এই পত্রিকায় ১৮৭০ খৃঃ অঃ ৩রা জানুয়ারী বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হয়। অশেষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৭৬ সালের

১০ জুলাই সার রিচার্ড টেম্পল দ্বারা সভার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের গণ্য মান্য অনেক লোক এ বিষয়ে ডাক্তার সরকারের বিপক্ষতা আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু পরিশেষে ডাক্তার সরকারেরই জয় হইল, বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা হইল। রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা কালে ডাক্তার সরকার বলিয়াছেন—

"I am in the habit of building castles in the air, and some how or other they come down on solid earth and become durable structures. One of these castles goes by the name of the Science Association in Calcutta.

এই বিজ্ঞান সভার জন্য ডাক্তার সরকার আপনার ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন, অর্থ সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে দিনরাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যদি তিনি ঐ সময় আপনার ব্যবসায়ে ন্যস্ত করিতেন তাহা হইলে সমস্ত অর্থ একাকী দান করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে বিজ্ঞান সভা সাধারণের হয়, নিজস্ব করিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই তিনি সাধারণের সহানুভূতির জন্য তাহাদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।

ডাক্তার সরকার সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর প্রকৃত অভাব ও তাহার বিমোচনের উপায় জানিতে পারিয়াছিলেন। যখন বঙ্গদেশ মোহনিদ্রায় অভিভূত, যখন নভেল ও পয়ার কাব্যের স্রোতে বঙ্গবাসী দেহ ভাসাইয়া দিয়াছে, যখন বঙ্গবাসী কাল্পনিক জগতের সুখস্বপ্নে বিভোর, তখন ডাক্তার সরকার তাঁহার গগনভেদী সুবর্ণ বিধানের সুগম্ভীর নিনাদে মোহান্ধ ভ্রাতাগণের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান আলোক হস্তে স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে সুপ্রশস্ত উন্নতিমার্গ দেখাইয়া দিলেন। তিনি নিজে উন্নত হইয়াই সুখী হইতে পারেন নাই স্বদেশীয়গণের অন্ধতায় তিনি হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। উন্নতি মার্গের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি মরীচিকান্বেষী ভ্রাতৃবৃন্দকে



স্নেহস্বরে বার বার ডাকিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান সভা কেবল তাঁহারই কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে তাহা নব যুগের স্মৃতিস্তম্ভ। বিজ্ঞান সভার স্থাপনের সহিত নব যুগের সূচনা হইল। মহেন্দ্রলাল পূজনীয় পুরাতন ঋত্বিকের ন্যায় প্রথম বিজ্ঞান হোমবহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। বিজ্ঞান সভা রোমদেশীয় ভিষ্টাল ভারজিনের মত পুতঃ বিজ্ঞানবহ্নি সন্দীপিত রাখিয়াছে। ডাঃ সরকার মহর্ষি মুষার ন্যায় জ্ঞানশৈল হইতে নব বিজ্ঞান জগতের বিমোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, ক্লান্ত ভারতবাসী অচিরে যে সেই সুখ রাজ্যে উপনীত হইবে তাহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু তিনি দেখিতে পাইয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি বার বার তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সমুদ্রবক্ষে সমুজ্জ্বল আলোক গৃহের ন্যায় বিপথগামী জাতীয় জীবন তরণীকে বিঘ্নহীন সুন্দর পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি ভারত গগনের ধ্রুবতারা; তিনি যে উজ্জ্বল প্রভাতের সূচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা কত সুন্দর কত রমণীয় হইবে কে বলিতে পারে। তাঁহার জীবনব্যাপী এই আশা ছিল যে ভারতবাসী একদিন হিমালয়ের ন্যায় উচ্চতায় সমস্ত জগতের আদর্শ হইবে।

বিজ্ঞান সভা স্থাপনে ডাঃ সরকার ফাদার ই লাফোঁ Father Lafont সাহেবের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। লাফোঁ সাহেবের সহিত ডাক্তারের এই উপলক্ষে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তাহা চিরদিন অটুট ছিল। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি সুপ্রসিদ্ধ Hindoo Patriot পত্রিকায় প্রথমাবধি বিজ্ঞান সভার উপকারিতা দেখাইয়া বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান সভা স্থাপন হওয়ার সংবাদে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহ অতিশয় আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। এই সময় একখানি ইংরাজ চালিত পত্রিকা যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

Dr. Sircar's idea has found Practical realization...At one time his enterprise seemed so helpless that many men would have set him down, as some we suppose did set him down, as an unpractical dreamer. He seemed like a gifted architect spending his life and genius in planning an edifice for the erection of which no materials existed. Time and the result have already justified him and we doubt not that coming generations will preserve his name as one of the worthiest pioneers of the splendid future which we all hope is in store for India. বিজ্ঞান সভা সাধারণের সম্যক সহানুভূতি পায় নাই বলিয়া ডাঃ সরকার কতবার দুঃখ করিয়াছেন। জনসাধারণের উপযুক্ত সহানুভূতি না পাইলেও 'বিজ্ঞান সভা' স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছে।

১৯০০ খৃঃ অঃ কনভোকেশনে Lord Curzon বলিয়াছেন—"You have I believe in your own midst a society which on a humble, because it is only possessed of humble means, attempts to diffuse scientific knowledge among the educated population of Bengal.—I allude to the Indian Association for the cultivation of science—(applanse) to which Dr. Sircar has I believe devoted nearly a quarter of a century of unremitting and only partially recognised labour (applanse). I often wonder why the wealthy patrons of science and culture with whom Bengal abounds do not lend a more strenuous helping hand to so worthy and indigenous an institution." এই উপলক্ষে চিফ জষ্টিস সার ফ্রান্সিস্ ম্যাকলিন ডাক্তার সরকার সম্বন্ধে বলেন—"An Indian votary of science who has been devoting a life long service in preparing the ground for the cultivation of science by his countrymen."



ডাক্তার সরকার আমাদের জন্য আপনার ক্ষতি করিয়াছেন, তিনি বিজ্ঞান সভা স্থাপন করিতে যে সময় ব্যয় করিয়াছেন তাহা যদি বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিয়োজিত করিতে পাইতেন তাহা হইলে, তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন।

ডাঃ সরকারের জ্ঞান ও প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, তিনি সাধারণ ডাক্তার গণের ন্যায় কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, এখনকার ডাক্তারগণের প্রধান দোষ এই যে তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতির চর্চ্চা অতি অল্প রাখেন, কিন্তু ডাক্তার সরকার সে দোষে দোষী ছিলেন না। তিনি Marie Corelliতে যেরূপ আমোদ পাইতেন Spencer এ ও সেইরূপ, জর্জ্জ ইলিয়ট George Elliot যেরূপ আগ্রহের সহিত পড়িতেন Renanও সেইরূপ, ডারউইন Darwin পুস্তক যেরূপ ভাবে পড়িতেন হানিম্যানও তদ্রূপ। সেক্‌স্‌পিয়রকে যেমন ভাল বাসিতেন, Newton কেও সেইরূপ, Kant Hegel যেরূপ আহ্লাদের সহিত পড়িতেন বৈজ্ঞানিক পুস্তকও সেইরূপ ভাবে পাঠ করিতেন। Bible, গীতা কোরাণ যেরূপ ছাত্রের ন্যায় পড়িতেন সেখসাদী, মিল্‌টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেইরূপ। তাঁহার সাধারণ জ্ঞান বিশ্বব্যাপী ছিল বলিয়াই তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ছাত্রজীবন, বাঙ্গালীছাত্র পরীক্ষার পূর্ব্বে যেরূপভাবে দিবারাত্রি অধ্যয়ন করে, মহেন্দ্রলাল আজীবন সেইরূপভাবে নিয়মিত পড়িতেন। পুস্তক হস্তে ভিন্ন তাঁহাকে আমি মুহূর্ত্তের জন্য দেখি নাই, নূতন নূতন পুস্তক পাঠ ও মাসিক ও দৈনিক সংবাদপত্র

পাঠই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। বার্দ্ধক্য জীবনে এবং মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়াও সমভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এরূপ জ্ঞান পিপাসা প্রকৃতই বিরল। যখন প্রবল পীড়ার আক্রমণে অস্থির হইতেন তখনও তিনি পুস্তকের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিয়ৎক্ষণ শান্তি পাইলেই পড়িতে আরম্ভ করিতেন। তাঁহার লাইব্রেরীর ন্যায় লাইব্রেরী খুব কমই আছে। নূতন কোন ভাল পুস্তক পাইলে ডাক্তার সরকারের হৃদয়ে মহা উৎসব বহিয়া যাইত, একখানি পুস্তক হারাইলে বা কোন ক্রমে নষ্ট হইলে ডাঃ সরকারের কষ্টের সীমা থাকিত না, তিনি যাহাকে দেখিতেন তাহারি নিকট পুস্তক হারাণর কথা তুলিয়া দুঃখ করিতেন। যতদিন না পুনরায় সেই পুস্তক ক্রয় করিতেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে স্বস্থি থাকিত না। তিনি মাসিক নিয়মমত প্রচুর পরিমাণে পুস্তক ক্রয় করিতেন। তাঁহার পুত্র বার বার নিষেধ করিয়াও পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে অধ্যয়ন হইতে বিরত করিতে সক্ষম হন নাই। সেথ সাদীর 'For the sake of knowledge consume thyself like a candle' এই কথাটী তাঁহার জীবনের বীজমন্ত্র ছিল। ডাক্তার সরকার হঠাৎ কোন নূতন বিষয় বিশ্বাস করিতেন না, তিনি দ্রুত শ্রেণীকরণ (hasty generalisation একেবারে ঘৃণা করিতেন, প্রত্যেক বিষয় অতিশয় সতর্কতার সহিত পর্য্যালোচনা না করিয়া তিনি কোন (রায়) অভিমত প্রকাশ করিতেন না। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিলেন, প্রত্যেক কার্য্যের কারণ ধীর ভাবে অনুসন্ধান করিতেন, কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে বড়বেশী স্থানাধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ স্থিরদৃষ্টি মহেন্দ্রলাল যে চিকিৎসা ব্যাবসায়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ক্রমশ।

---

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

## শ্রীম কথিত।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্ত সঙ্গে।

[ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত কথা। ]

শুক্রবার আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি; ১৫ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্যামপুকুরের একটি বাড়ীতে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন, ঠাকুর দোতালার ঘরে আছেন, বেলা ৯টা বাজিয়াছে, মাষ্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন; মাষ্টার ডাক্তার সরকারের কাছে গিয়া পীড়ার খপর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন।

ঠাকুরের শরীর এত অসুস্থ; কিন্তু কেবল ভক্তদের জন্য চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল, বেশ স্বভাব, মনীন্দ্রের প্রকৃতি ভাব, কি আশ্চর্য্য! চৈতন্য চরিত পড়ে ওর ঐটি মনে ধারণা হইয়াছে, গোপীভাব। সখীভাব, ঈশ্বর পুরুষ আর আমি যেন প্রকৃতি।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

পূর্ণচন্দ্র স্কুলের ছেলে; বয়স ১৫।১৬, পূর্ণকে দেখিবার জন্য ঠাকুর বড় ব্যাকুল হন কিন্তু বাড়ীতে তাহাকে আসিতে দেয়না, প্রথম প্রথম তাহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে একদিন রাত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাৎ মাষ্টারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন,

মাষ্টার পূর্ণকে বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে কিরূপে ডাকিতে হয়, তাহার সহিত এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান।

মনীন্দ্রের বয়সও ১৫।১৬ হইবে, ভক্তেরা তাঁহাকে খোকা বলিয়া ডাকিত, এখনও ডাকে। ছেলেটি ভগবানের নাম গুন গান শুনিলে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিত।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### [ ডাক্তার ও মাষ্টার ]

বেলা ১০½ টা। এখন মাষ্টার ডাক্তার সরকারের বাড়ী গিয়াছেন। ডাক্তারের সঙ্গে বসিয়া কথা কহিতেছেন। রাস্তার উপর দোতালার বৈঠকখানার ঘরের বারাণ্ডা, সেইখানে উভয়ে কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথা কহিতেছেন, ডাক্তারের সম্মুখে কাঁচের আধারে জল, তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে; ডাক্তার মাঝে মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া দিতেছেন।

এক একবার ডাক্তার সরকার ময়দার গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়ুই পাখীদের আহারের জন্যে ফেলিয়া দিতেছেন। মাষ্টারও দেখিতেছেন, ডাক্তার ( মাষ্টারের প্রতি সহাস্যে ) এই দেখ এরা ( লালমাছ ) আমার দিকে চেয়ে আছে কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিইছি তা দেখে নাই। তাই বলি শুধু ভক্তিতে কি হ'বে জ্ঞান চাই।

( মাষ্টারের হাস্য )

"ঐ দেখ চড়ুই পাখি উড়ে গেল; ময়দার গুলি ফেললুম ওর দেখে ভয় হলো। ওর ভক্তি হলোনা। জ্ঞান নাই বলে, জানেনা যে খাবার জিনিষ।



ডাক্তার বৈটকখানা ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন, চতুর্দ্দিকে স্তূপাকার বই আল্‌মারিতে রহিয়াছে। ডাক্তার একটু বিশ্রাম করিতেছেন, মাষ্টার বই দেখিতেছেন ও এক একখানি লইয়া পড়িতেছেন। শেষে একখানি বই কিয়ৎক্ষণ পড়িতে লাগিলেন Canon Farrars Life of Jesus.

ডাক্তার মাঝে মাঝে গল্প করিতেছেন। কত কষ্টে হোমিওপ্যাথিক hospital হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়িতে বলিলেন, আর বলিলেন যে ঐ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta journal of Medicine এ পাওয়া যাইবে, ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির উপর খুব অনুরাগ।

মাষ্টার আর একখানি বই বাহির করিয়াছেন Munger's New Theology. ডাক্তার দেখিলেন, ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি); Munger বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। এ তোমার চৈতন্য অমুক কথা বলেছে, কি বুদ্ধ বলেছে কি যাশুখ্রীষ্ট বলেছে তাই বিশ্বাস ক'রতে হবে তা নয়,

মাষ্টার—চৈতন্য বুদ্ধ নয় তবে ইনি।

ডাক্তার—তা তুমি যা বল।

মাষ্টার—একজন ত কেউ বল্‌ছে তা'হলে দাঁড়ালো ইনি।

( ডাক্তারের হাস্য )

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন. গাড়ি শ্যামপুকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা সাড়ে দুইপ্রহর হইবে। দুইজনে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন।

ডাক্তার ভাদুড়িও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন; তাঁহারই কথা পড়িল।

মাষ্টার ( সহাস্যে ) আপনাকে ভাদুড়ি বলেছেন ইট পাট্‌কেল থেকে আরম্ভ ক'রতে হবে।

ডাক্তার—সে কি রকম ?

মাষ্টার—আপনি মহাত্মা, সূক্ষ্ম শরীর এ সব মানেন না কিনা। ভাদুড়ি মশায় বোধহয় Theosophist. তা ছাড়া আপনি অবতার লীলা মানেন না, তাই তিনি বুঝি ঠাট্টা ক'রে বলেছেন এ বার মলে মানুষ জন্ম ত হবেই না কোন জীব, জন্তু, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন না। ইট, পাট্‌কেল থেকে আরম্ভ ক'রতে হবে, তার পর অনেক জন্মের পর যদি কখন মানুষ হন।

ডাক্তার :—ও বাবা !

মাষ্টার—আর বলেছেন আপনাদের যে Science নিয়ে জ্ঞান সে মিথ্যে জ্ঞান। এই আছে এই নেই, তিনি উপমাও দিয়েছেন, যেমন দুটি পাতকোয়া আছে, একটি পাতকোয়ার জল নীচের spring থেকে আসছে, দ্বিতীয় পাত কুয়োর spring নাই তবে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সে জল কিন্তু বেশীদিন থাকবার নয়। আপনার Science এর জ্ঞানও বর্ষার পাতকুয়োর জলের মত শুকিয়ে যাবে।

ডাক্তার—( ঈষৎ হাসিয়া ) বটে।

গাড়ি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সরকার প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন, তিনি গতকল্য ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ। ]

ঠাকুর সেই দোতালার ঘরে বসিয়া আছেন, কয়েকটি ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন, ডাক্তার সরকার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।



ডাক্তার। ( ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি ) আবার কাশি হয়েছে ? ( সহাস্যে ) তা কাশীতে যাওয়া ত ভাল ( সকলের হাস্য )।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ) ; তাতে ত মুক্তি গো ! আমি মুক্তি চাই না ; ভক্তি চাই। ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন।

প্রতাপ ডাক্তার ভাদুড়ির জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেখিয়া ভাদুড়ির গুনগান করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( প্রতাপের প্রতি ) আহা তিনি কি লোক হয়েছেন ! ঈশ্বর চিন্তা শুদ্ধাচার, আর নিরাকার সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাষ্টারের বড় ইচ্ছা যে ইট পাটকেলের কথাটা আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন। ইট পাটকেলের কথাটা ভাদুড়ি কি বলেছেন মনে আছে ? শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ডাক্তারের প্রতি ) আর তোমায় কি বলেছেন জান, তুমি এ সব বিশ্বাস করনা ; মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। ( সকলের হাস্য )

ডাক্তার। ( সহাস্যে ) ইট্ পাটকেল্ থেকে আরম্ভ করে অনেক জন্মের পর যদি মানুষ হই আবার এখানে এলেই ত ইটপাটকেল থেকে আবার আরম্ভ ! ( ডাক্তারের ও সকলের হাস্য )।

ঠাকুর এত অসুস্থ তবুও তাঁহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদা কন ; এই কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ—কাল দেখে গেলাম ভাবাবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে আপনি আপনি হয়ে গিয়েছিল ; বেশী নয়।

ডাক্তার—কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—( ডাক্তারের প্রতি ) কাল যে ভাবাবস্থা হয়েছিল তাহাতে তোমাকে দেখ্‌লাম। দেখলাম জ্ঞানের আকর—কিন্তু মজক একেবারে শুক—আনন্দরস পায় নাই।

(প্রতাপের প্রতি) "ইনি (ডাক্তার) যদি একবার আনন্দ পান তা হলে অধঃ উর্দ্ধে পরিপূর্ণ দেখেন! আর আমি যা বল্‌ছি তাই ঠিক্, আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়" এ সব কথা তাহলে আর বলেন না—আর হ্যাংক ম্যাংক লাঠিমারা কথাগুলো তাহলে আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও জীবনের উদ্দেশ্য ]

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তার সরকারকে বলিতেছেন—

"মহীন্দ্র বাবু! কি টাকা টাকা করছো!—মাগ, মাগ!—মান, মান করছো? ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে এক চিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দেও—ঐ আনন্দ ভোগ কর।

ডাক্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন, সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ন্যাংটা জ্ঞানীর ধ্যানের কথা বল্‌তো। জলে জল, অধো ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ জীব যেন মীন, সেই জলে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখ্‌বে।

"অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই, তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে, বাহিরে ভিতরের জল, জ্ঞানটী দেখে অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটা কি! ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তর বাহির বোধ হচ্ছে, 'আমি' ঘট থাক্‌লে এই বোধ হয়। ঐ আমিটি যদি যায় তাহলে যা আছে তাই; মুখে বলবার কিছু নাই।

"জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ; তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে পাখা বিস্তার করে। চিদাকাশ, আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরেনা!

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া এই ধ্যানযোগ কথা শুনিতেছেন, কিয়ৎক্ষণ



পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ (সরকারের প্রতি) ভাব্‌তে গেলে বটে সব ছায়া।

ডাক্তার—ছায়া যদি বললে তবে তিনটি চাই। সূর্য্য, বস্তু আর ছায়া। বস্তু না হলে ছায়া কি! এদিকে বল্‌ছো God real আবার creation unreal! creationও real.

প্রতাপ—আচ্ছা আর্শিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি মনরূপ আর্শিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার—একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিম্ব।

ছোট নরেন—কেন ঈশ্বর বস্তু।

ডাক্তার চুপ করিয়া রইলেন।

[ জগৎ চৈতন্য ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) একটা কথা তুমি বেশ বলেছো। ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয় এটি আর কেউ বলেনি! তুমিই বলেছো।

"শিবনাথ বলেছিলো বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বে-হেড্ হয়ে যায়। বলে জগত চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়! যিনি বোধ স্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে তাঁকে চিন্তা করে কি অবোধ হয়।

(ডাক্তারের প্রতি) আর তোমার science এটা মিশ্‌লে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়; ওগুলো চিন্তা করলে বরং অবোধ হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে।

ডাক্তার। ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মাষ্টার—তবে মানুষে আরও দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও বেশী দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশী প্রকাশ।

ডাক্তার—হাঁ মানুষেতে বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্য্যন্ত

চেতন হয়েছে, হাত পা শরীর নড়ছে। বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাইতেই হাত পুড়ে গেল।

"হাঁড়িতে ভাত ফুট্‌ছে। আলু বেগুন লাফাচ্ছে, ছোট ছেলে বলে আলু বেগুনগুলো আপনি নাচ্‌ছে, জানে না যে নীচে আগুন আছে। মানুষ বলে ইন্দ্রিয় বা আপনা আপনি কাজ করছে, ভিতরে যে সেই চৈতন্য স্বরূপ আছে তা ভাবে না।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার সরকার গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার—বিপদে মধুসূদন, সাধে তুঁহু তুঁহু বলায়, গলায় ঐটি হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বল এখন ধুনুরির হাতে পড়েছো, ধুনুরিকে বলো। তোমারই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আর বল্‌বো।

ডাক্তার—কেন বলবে না। তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগ্‌ছি আর ব্যারাম হলে বোলবোনা তবে কাকে বল্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক ঠিক। এক একবার বলি। তা—হয়—না।

ডাক্তার—আর বল্‌তেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে) একজন মুসলমান নামাজ কর্‌তে কর্‌তে হো আল্লা হো আল্লা বলে চীৎকার করে ডাক্‌ছিল। তাকে একজন লোক এসে বোল্‌লে তুই আল্লাকে ডাক্‌ছিস্ তা অতো চেঁচাচ্ছিস্ কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নুপুর শুন্‌তে পান।



শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁতে যখন মনের যোগ হয় তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে, হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

"কিন্তু আর একটি কথা আছে যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন স'রে আসবে। ভক্তমালে একজন ভক্তের কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে রোজ যেত। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়ীতে বাপমায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরী হয়েছে! শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে। তার এত একাগ্র মন বেশ্যার দিকে যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন খান দিয়ে যাচ্ছে এ সব কিছু হুঁস নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুঁজে ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছিল। তার গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে, যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠলো, কি তুই দেখ্‌তে পাচ্ছিসনা। আমি ঈশ্বরকে চিন্তা কচ্ছি তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস। তখন সে লোকটি বোললে আমায় মাফ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আমার বেশ্যাকে চিন্তা করে হুঁস নাই আর আপনি ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছেন আপনার সব বাইরের হুঁস আছে; এ কি রকম ঈশ্বর চিন্তা, সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল, বেশ্যাকে বলেছিল তুমি আমার গুরু কেননা তুমিই শিখিয়েছ কি রকম ক'রে ঈশ্বরে অনুরাগ কর্‌তে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।

ডাক্তার—এ তান্ত্রিক উপাসনা। জননী রমণী!

(সংসারীর শিক্ষা)

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখো একটা গল্প শোনো। এক রাজা ছিল, একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুন্‌তো, প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বল্‌তো রাজা বুঝেছো, রাজাও রোজ বল্‌তো তুমি আগে বোঝো। ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে যে রাজা

রোজ এমন কথা বলে কেন, আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উল্‌টে বলে তুমি আগে বোঝো! একি হলো। পণ্ডিতটি সাধন ভজনও কর্‌তো, কিছুদিন পরে তার হুঁস হলো যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, জন, মান সম্ভ্রম—সব অবস্তু; সংসার সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ কোল্লে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে রাজাকে বলো যে আমি বুঝিছি।

"আর একটা গল্প শোনো। একজনের একটি ভাগবতের দরকার হয়েছিল, পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বোল্‌বে। এমন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক খোঁজার পর একটি লোক এসে বোল্‌লে, মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি। লোকটি বোল্‌লে তবে বেশ হয়েছে তাঁকে আনো। সে বল্‌লে একটু কিন্তু গোল আছে। তাঁর কথানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে—তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাক্‌তে হয়, চাষ দেখ্‌তে হয়, একটুও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পণ্ডিত দরকার সে বল্‌লে ওহে যার লাঙ্গল আর হেলে গরু আছে এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছিনা, আমি চাচ্ছি এমন লোক যাঁর অবসর আছে আর আমাকে হরি কথা শুনাতে পারেন।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝলে।

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে পণ্ডিতরা অনেক জানে শোনে—বেদ, পুরাণ তন্ত্র, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে! বিবেক বৈরাগ্য চাই, বিবেক বৈরাগ্য যদি থাকে তবে তার কথা শুন্‌তে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে তাদের কথা নিয়ে কি হবে।

"গীতা পড়লে কি হয় দশবার গীতা গীতা বল্‌লে যা হয়। গীতা গীতা বল্‌তে বল্‌তে ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায় সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি



ত্যাগ হয়ে গেছে আর যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে সেই গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতা সব—বইটা পড়বার দরকার নাই। ত্যাগী ত্যাগী বল্‌তে পারলেই হলো।

ডাক্তার—ত্যাগী বল্‌তে গেলেই একটা য ফলা আকার আন্‌তে হয়।

মাষ্টার—তা য ফলা আকার না আন্‌লেও হয়—নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে পেনেটিতে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনেটিতে মহোৎসব দেখতে গিছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বল্‌ছিলেন, তখন গোস্বামী বল্‌লেন তগ্ ধাতু ঘঙ্ তাগও হয়: তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে তাগী হয়; তাগী ও ত্যাগী এক মানে।

ডাক্তার—আমায় একজন (রাধা) মানে বলেছিল' সে বল্‌লে রাধা মানে কি জানো? ঐ কথাটা উল্‌টে নেও অর্থাৎ ধারা ধারা (সকলের হাস্য)।

আজ তাহলে রাধা পর্য্যন্তই রহিল। ক্রমশ।

---

## সৎ-মা।

(আত্মকাহিনী)

১

১৪ চৌদ্দ বৎসর বয়স হইল, বিবাহের সম্বন্ধ আর জুটে না। মা অন্ন-জল ত্যাগ করিলেন। পিতা দুই বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গ্রামের মাইনর স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোন বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ অবস্থায় আজ কালের দিনে বিবাহ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কাজেই মাতার

শোকানল পরিবর্দ্ধিত করিয়া ভাগ্যহীন কৌমার্য্যে আমি দিনে দিনে পরিপুষ্ট হইতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার সৌভাগ্যক্রমে (অন্ততঃ আমার সমবেদনা-পরায়ণ প্রতিবেশী বর্গের মতে) হরিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামধন বসুর পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে পত্নীবিয়োগ ঘটিল। রামধন বাবু ও তাঁহার পরিবার বর্গ এই দুর্ঘটনায় অবশ্যই পরিতপ্ত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু আমার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ ইহারই মধ্যে আমার শিথিলিতাশ বিবাহের ক্ষীণ আলোক রেখা দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গরজ বড় বালাই।

বসুজের প্রথমা পত্নীর প্রতি প্রেমাভাব ঘটিয়াছিল অথবা তাঁহার বিগলিত প্রেমস্রোতের পাত্রাভাবে অপব্যয়িত হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না, বসুজ কিন্তু আমারে দেখিয়া একমাসের মধ্যেই বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

মাতা আমার বিবাহ দিয়া দুর্ভাবনাযুক্ত হওয়ার গভীর স্বস্তি অনুভব করিবার সুযোগ পাইলেও, বিবাহ বাসরে তাঁহার ভাবী জামাতাকে দেখিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন, এবং আমার এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীমা একেবারে গলা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমার কিন্তু সেই কর্ত্তিতগুম্ফ ও কেশহীন মস্তক বিশিষ্ট ধনুবৎ অবনত দেহ লাল গর্ণেট ও লাল চেলিতে মণ্ডিত দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল!

আমার এই সমুচ্চকলহাস্য সূচিত বুদ্ধিহীনতাদর্শন উপযুক্তকালে সংযত করিবার জন্য আমার দুই একটী দূরদর্শী আত্মীয়কে যে ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল তাহা যে নিতান্ত সুমিষ্ট ও সুরুচিসঙ্গত তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না।

অবশেষে বিবাহ হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজনের অস্ফুট রোদন মধ্যে সুখময় শ্বশুরালয় চলিলাম।



২

এইবার আমাদের গৃহস্থালীর কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ বালিকা বধূর এতশীঘ্র শ্বশুরালয়ের সকল বিষয় পরিদর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি একেবারে "মা" হইয়া ঘরে আসিয়াছিলাম "বৌ" হইয়া নহে যে আমাদের বাড়ীটী একটী ক্ষুদ্র কুটীর। প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন—গৃহলক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা জন্য সপ্রতিমাত্র কোন প্রকারে তাল পত্রের দ্বারা সমাবৃত।

বাটীতে দুইখানি শুইবার ঘর—এক খানিতে রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার।

সম্পত্তির মধ্যে একটী প্রাচীন আমকাঠের সিন্দুক এবং একটী বৃদ্ধা গাভী।

ঘরের লোকের মধ্যে আমার স্বামী ও তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের একবিংশতিবর্ষীয় পুত্র।

আমি যখন প্রথমে আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইলাম তখন প্রতিবেশিনীগণে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সকলে নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

সকল মন্তব্যের সারমর্ম্ম এই যে "যাহা যায় তাহা আর হয় না।" সুতরাং সকলে বসুমহাশয়ের উদ্দেশে কিছু কিছু দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

আমি যখন বাটী পৌছিয়াছিলাম পুত্রবর তখন সম্ভবতঃ কোন বন্ধুগৃহে তাসক্রীড়া ও ধূমপানে ব্যাপৃত ছিলেন। এখন ফিরিয়া আসিয়া আমার দিকে একবার কোপকুটিল কটাক্ষ করিলেন।

এই স্নেহশীল পুত্র ও জরাগ্রস্ত স্বামী পাইয়া আমি সংসার যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

বসুমহাশয়ের যত্নের ত্রুটি ছিল না। তিনি মুহুর্মুহু অন্তঃপুরে আসিয়া আমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিবার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে নানাবিধ ছলোনুসন্ধান করিতেছিলেন,—এবং মধ্যে মধ্যে বাহিরে গিয়া মৎস্য-

জীবী দিগকে মৎস্য সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ দান করিতেছিলেন।

আজ আহারের আয়োজনটা হইয়াছিল ভাল—আজ "বৌভাত" কি না।

"বৌভাত" অনেক স্থলে নামেই বৌভাত। বৌ কিছুই করে না অপর সকলে রাঁধিয়া বাড়িয়া ঠিক করিয়া দেয় বৌএর শুধু নামটাই সংলগ্ন থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু তাহা হইল না। আমি "বৌভাত"কে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া দিলাম। মাছ কোটা হইতে মাছের অম্বল পর্য্যন্ত কোন বস্তুকেই আমার পদ্ম হস্তের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত রাখিলাম না।

যথাকালে সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত বর্গের শুভাগমন হইল—কবিরাজ ব ঠাকুর ও মদক ঠাকুরপো উভয়েই আহার করিয়া পরিতোষ প্রকাশ করিলেন।

কর্ত্তা নিভৃতে আহার করিবার লোভে সঙ্গে বসিলেন না।

তৃতীয় প্রহরে কর্ত্তাকে আহার করাইয়া আমি আহার করিলাম।

কর্ত্তা পত্নী প্রেমের প্রাবল্যে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিলেন আমি কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

আমার আশঙ্কা সফল হইল। সন্ধ্যার পরে কর্ত্তা স্ফীত উদরে হতাশ হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলেন।

পুত্রবর আহারান্তে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, রাত্রে আর ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্যজ্ঞান করেন নাই।

সুতরাং আমাকেই তৈল ও জল লইয়া স্বামীসেবা আরম্ভ করিতে হইল।

এইরূপে অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে আমাদের "ফুল-শয্যা"র মধুর মিলন সম্পন্ন হইয়া গেল। ক্রমশ

---

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩১১। ৪র্থ সংখ্যা।

## ডাক্তার সরকারের জীবনী।

তিনি যখন চিকিৎসা করিতে যাইতেন সঙ্গে একটী প্রকাণ্ড পুস্তকের মোট যাইত, তিনি রোগীর প্রত্যেক symptom পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেন। তিনি কখন তাড়াতাড়ি ঔষধ দিতেন না, যতদিন পর্য্যন্ত রোগের বিষয় স্থির নিরাকরণ এবং তাহার প্রকৃত কারণ না জানিতে পারিতেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনি কোনরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন না। সময় সময় তিনি কেবলমাত্র সামান্য আহার্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি ঔষধের অপেক্ষা পথ্যের উপর অধিক নির্ভর করিতেন, অনেকে মনে করিত ডাক্তার সরকার রোগীর উপর experiment করেন, কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল, তিনি অধিক ঔষধ সেবন করান পাপের ন্যায় বিবেচনা করিতেন, তাহা অপেক্ষা ঔষধ না দেওয়া তাঁহার মনে সমীচীন বলিয়া বোধ হইত। তিনি দুর্লভ মানব জীবন experiment এর উপযোগী মনে করিতেন না, তিনি রোগীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। পাছে অন্য ঔষধ

কিম্বা অধিক ঔষধ system খারাপ করিয়া দেয় এই ভয়ে তিনি ঔষধ না দিয়া কেবলমাত্র পথ্যের উপর নির্ভর করিতেন। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তিনি ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। গৃহেও তাঁহার ঐ নিয়ম ছিল, তিনি পুত্র পৌত্রাদির চিকিৎসা কালে প্রায়ই ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার পত্নীর সাংঘাতিক পীড়ার সময়ও তিনি এক-বিন্দু ঔষধ দেন নাই, পরে যখন পীড়া একেবারে ভীষণভাব ধারণ করিল তখন কেবলমাত্র একবিন্দু ঔষধে তাঁহাকে আরোগ্য করেন। তিনি কেবলমাত্র পথ্যের দ্বারা কত রোগী আরোগ্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। সেই চিররোগী ইংরাজ মহিলার কথা অনেকেরই মনে আছে, তিনি কোনরূপে আরোগ্য না হওয়ায় ডাঃ সরকারের শরণাপন্ন হন, ডাক্তার সরকার কেবল তাঁহার আহার্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া আরোগ্য করেন, বিদায় লইবার সময় উক্ত ইংরাজ মহিলাটী বলেন—sorry doctor you have cured me without a drop of medicine. তিনি রোগীর বড় প্রিয় ছিলেন; তাঁহার উপর অনেকের এমন বিশ্বাস ছিল যে তিনি আসিয়া দেখিলেই সকল পীড়া আরোগ্য হইবে। ছোট ছোট ছেলেদের পীড়ার সময় ডাক্তার সরকার নানাবিধ খেলনা লইয়া যাইতেন, নানা চিত্রাদি দিয়া তাহাদিগকে ভুলাইতেন। রোগীর পথ্যের দ্রব্য ডাক্তার সরকার নিজগৃহে সঞ্চিত রাখিতেন, ঐ পথ্যদ্রব্য অনেক রোগীই তাঁহার নিকট পাইত। সময় সময় রোগীর জন্য গৃহ হইতে পথ্য-দ্রব্য তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইতেন। কখনও বা তাহাদের বাটীতে স্বহস্তে তৈয়ার করিয়া দিতেন।

রোগীকে সযত্নে পীড়ার সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-তেন, কেহ কোন জ্ঞাতব্য বিষয় গোপন করিলে অতিশয় কুপিত হই-তেন। সেইজন্য তাঁহাকে কেহ কেহ কর্কশ বলিত; কিন্তু বাস্তবিক এই উপায়ে তিনি আবশ্যকীয় গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া লইতেন। তিনি



একবার একজন ডাক্তারের চিকিৎসার সময় ডাক্তার প্রকৃত কথা না বলায় এত রাগিয়া উঠেন যে ডাক্তারকে তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ডাক্তার ভয়ে মহেন্দ্রলালের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন, কোন বিষয় গোপন রাখিলেন না। ডাক্তার সরক্যর তাঁহাকে ঔষধ দিলেন, কিছুদিন পরে আরোগ্য হইয়া সেই লোকটী পুনরায় ডাঃ সর-কারের সহিত দেখা করিতে আসিলে, ডাক্তার বলিলেন—বাপু! আমি চাষা! গোঁয়ার! যদি তোমাকে না বকিতাম তুমি কি ও সকল কথা প্রকাশ করিতে? রোগের কারণ না জানলে কি প্রতীকার হয়?" প্রথমেই বলিয়াছি পথ্যই ডাক্তার সরকারের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ, তিনি যেরূপ পথ্যের কথা বলিয়া দিতেন তাহা সময়ে সময়ে কঠিন বোধ হইত বটে কিন্তু পথ্যের ত্রুটী হইলে ডাঃ সরকার অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। ডাক্তার সরকার রোগীর আত্মীয়গণকে নিয়মিত রোগীর ডায়রী রাখিতে বলিতেন, temperature, ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাখিতে হইত, আহার, মল মূত্রাদি ত্যাগের সময় বিশেষ ভাবে লিখিয়া রাখিতে বলিতেন, পথ্য নিয়-মিত সময়ে তাঁহার কথিত পরিমাণে দিতে হইত। রোগীকে কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন ও লোভ সম্বরণ করিতে হয় তাহা ডাক্তার সরকার নিজে দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি আজীবন সংযতভাবে আহার করিতেন, কখন কোন উৎসবে আহারাদি করিতেন না। তিনি দারুণ হাঁপানি রোগের জন্য ৮ বৎসর অন্নাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ৪ বৎসর জলবিন্দু পান করেন নাই। তিনি একে একে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র পটোল, আলু, ভয়সাঘৃত, দুগ্ধ ও রুটী খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি মূত্রকৃচ্ছ্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অবধি রীতিমত ডায়রী রাখাইতেন। প্রথমতঃ দুইখানি রুটী খাইয়া জল খাইতেন কিন্তু দেখিলেন যেদিন জল খান সেইদিন গলা ফুলে, যেদিন না খান কমে; এই-রূপ দুইমাস দেখিয়া জলপান ত্যাগ করিলেন, দেখিলেন বৈদ্যুতিক

পাখা যেদিন চলে রাত্রিতে মাথা ধরে, যেদিন না চলে সেদিন মাথা ধরে না, একমাস দেখিয়া বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ করিলেন। এইরূপে তিনি shift' করিয়া সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র যৎসামান্য আহার করিতেন। ডাক্তার সরকারের ধৈর্য্য সীমা ছিল না, তিনি অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন, দারুণ বেদনায় যখন ডাঃ সরকার কষ্ট পাইতেছেন, যখন ডাক্তারগণ প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিতেছে, তখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। তিনি সহজ মানুষের ন্যায় এলোপ্যাথি কিম্বা অধিক হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিতেন, কেহই তাঁহাকে ও বিষয়ে সম্মত করিতে পারিত না। তিনি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ষ্টোইকের ন্যায় সহ্য করিতে ও লুকাইতে পারিতেন, বিষম পীড়ার সময়ও তিনি পৌত্র কচিবাবুর সহিত হাসিয়া কথা কহিতেন, পাছে শিশু মনে কোনরূপ দুঃখ করে সেইজন্য সহাস্যমুখে তাহাকে সম্বোধন করিতেন। কর্ম্মবীর ডাক্তার সরকার এত পীড়াতেও যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা কয়জন যুবক করিতে পারেন? Calcutta Journal of medicine তিনি সমানভাবে চালাইয়াছেন, Cholera treatment দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া লিখিয়াছেন, এই সংস্করণে উক্ত অমূল্য পুস্তকখানি প্রায় তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি জীবনের একমুহূর্ত্তও বিফলে নষ্ট করেন নাই। কর্ত্তব্য ডাক্তার সরকারের মহাব্রত এবং কার্য্য তাঁহার সাধনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি আলস্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বার্দ্ধক্যে তিনি যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করিতেন। তিনি কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকল কার্য্যই আগ্রহের ও আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য যেরূপ আগ্রহের সহিত দেখিতেন, গৃহের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকার্য্যও সেইরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধেও বলা যায়—'True to the kindred points of heaven and home'।



ডাক্তার সরকারের স্বভাবে একটা মৌলিকতা ছিল, হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তি হইত বটে কিন্তু তাঁহার কথায় তাঁহার উপর ভালবাসা আকৃষ্ট হইত না, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি হৃদয়ে একটা আনন্দ আনিয়া দিত বটে কিন্তু তাহাতে যেন ততটা মাধুর্য্য অনুভূত হইত না। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেন—তাঁহার হৃদয় কত গভীর, কত সরল, কত কোমল। ডাক্তার সরকারের একজন বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন 'তোমার স্বভাব ঠিক ডাবের মত উপর কিছু কঠিন কিন্তু ভিতর বড় মধুর, বড় শান্তিকর। ডাক্তার সরকারের স্নেহ যিনি পাইয়াছেন তিনিই জানেন তাহা কত মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সহিত যত মেশা যাইত ততই তাঁহার গুণগ্রাম দেখিয়া মোহিত হইতে হইত। তাঁহার গুণ রামধনুর ন্যায় চক্ষে প্রথম দর্শনেই ভাসিয়া উঠিত না; প্রথম দর্শনে তাঁহার গুণসমূহ আবিষ্কার করা কাহারও পক্ষেই সহজ ছিল না। শুক্তির মধ্যে উজ্জ্বলমুক্তার ন্যায়, রত্নাকরের গর্ভে মণিমাণিক্য রাশির ন্যায় তাঁহার গুণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিহিত ছিল। যিনি একবার তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতেন তিনিই মোহিত হইতেন। ডাক্তারের স্বভাব বালকের ন্যায় ছিল, গর্ব্ব হিংসা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। নীচচিন্তা তাঁহার বিশাল নয়নের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইত। স্বার্থ কখন ডাঃ সরকারকে মস্তক অবনত করাইতে পারে নাই। তিনি সকল কার্য্য নিঃস্বার্থ ভাবে করিতেন। জীবনে তিনি কখন কাহাকেও প্রণাম করেন নাই। বলিতেন "ঈশ্বরের নিকট ছাড়া এ মস্তক নত হইবে না।" তাঁহার মস্তক যেমন কখন অবনত হয় নাই, মনও তেমনি চিরকাল উচ্চ, কখন নিমেষের জন্য নত হয় নাই। তিনি তোষামুদী করিতে জানিতেন না। কখন কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলেন নাই, যাহা সত্য তাহাই সুন্দর তাহাই কর্ত্তব্য জানিতেন, সমস্ত শত্রু মণ্ডলীর

সমক্ষেও তিনি বীর বিক্রমে তাহাদের দোষ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি স্বীয় মুখে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'I have an absolute hatred for everything false, and my love of nature...which means truth and reality... is unbounded. This makes me outspoken to rudeness, but for I could have been popular. Pardon me the egotism when I say that beneath a rough interior there is some tenderness, is, and in association with a most veritable disposition and an empetuous temper there is the greatest caution as a physician and a scientific experimenter and researcher. I have often from a sense of duty attended on patients for days and months without remunertion, when convinced of their poverty and their lives depended upon my care and treatment.

ডাক্তার সরকার বাহ্যাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না, তিনি সামান্য তালতলার চটি, একখানি থান ধুতি ও একটী সামান্য জামা গায়ে দিয়া বাহির হইতেন, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখন বিদেশীয় বেশ পরিধান করিতেন না। চরিত্র ও সাজসজ্জায় তাঁহাকে রোমান Cato কেটোর সহিত তুলনা করা যায়, সামান্য বেশ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি (will power), অসাধারণ সংযম, এবং 'plain living and high thinking' এ তিনি Catoর সদৃশই ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল কিন্তু কর্ত্তব্যের সময় বজ্রবৎ কঠিন ছিল। তিনি নীরবে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন, বৈদ্যনাথে কুষ্ঠাশ্রম তাঁহার মূর্ত্ত দয়া; তিনি দরিদ্র ও আতুরগণকে কত ভাল বাসিতেন, তাহাদের যন্ত্রণায় কত



মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেন 'রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম' তাহার নিদর্শন। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত একপ্রাণে কুষ্ঠাশ্রমের জন্য খাটিয়াছেন, যোগীন্দ্রবাবু প্রথমে কুষ্ঠাশ্রমের কথা উত্থাপন করায় ডাক্তার সরকার আহ্লাদের সহিত কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ১০০০ সহস্র টাকা দান করেন।

ডাক্তার সরকার ৮।১০ বৎসর কাল নানাবিধ পীড়ায় ভুগিয়াছেন কিন্তু রোগ তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই, তাঁহার সুগম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তিরও রোগে কোন বিকার হয় নাই। বার্দ্ধক্য তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার হৃদয় এ বয়সেও শরৎগঙ্গার ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল। অনুতাপের আবিলতা কখন তাঁহার হৃদয়ের বিমলতা নষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। জীবন সংগ্রামে জয়ী মহেন্দ্রলালকে যখন দেখিতাম তখনই হৃদয়ে একটা আনন্দলহরী বহিয়া যাইত। ডাঃ সরকারের বার্দ্ধক্য দেখিয়া প্রকৃতই বলিতে ইচ্ছা করিত

'An old age serene and bright
And lovely as the lapland night.'

একজন গাহিয়াছেন

'জীবনের মহাব্রত করিয়াছ উদ্যাপন
অনুতাপ পশেনি হিয়ায়
তোমার বার্দ্ধক্য যেন বিমল শারদনিশি
দেখ শুধু ভরা জোছনায়।'

বার্দ্ধক্যের দোষরাশি ডাক্তার সরকারকে স্পর্শ করিতে পারে নাই শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল বটে কিন্তু মনের কিছুমাত্র বিকার হয় নাই। লোকের সহিত হাস্যমুখে নানা বিষয়ক বাক্যালাপ করিতেন, কেহ কোন নূতন তত্ত্ব বলিলে ছাত্রবয়সের আগ্রহের সহিত শুনিতেন, ভ্রমণ-কাহিনী এবং নানা দেশের কথা শুনিতে সর্ব্বাপেক্ষা তিনি ভাল

বাসিতেন। বারাণ্ডার পশ্চিমপার্শ্বে ম্যাপ খাটাইয়া তিনি ছাত্রের ন্যায় প্রত্যেক নূতন স্থানের অবস্থিতি স্থান নিরীক্ষণ করিতেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস C. I E. মহাশয়ের সহিত হিমাচলের কথা, তিব্বতের কথা কহিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। বার্দ্ধক্যেও তিনি সত্য কথা মুখের উপর বলিতেন, যখন বিখ্যাত রাসায়নিক প্রোফেসার Ramsay তাঁহার গৃহে দেখা করিতে আসেন এবং এদেশীয় ইংরাজ বিজ্ঞান ব্যবসায়ীগণের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন ডাক্তার সরকার গম্ভীরভাবে বলিলেন "তাহারা প্রকৃতই জুয়াচোর, কাহাকেও কোন বিষয় শিখাইতে চায় না, আমার স্বদেশীয় ভ্রাতাগণ একটা কাচের কারবার খুলিয়াছিল কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের অসাধুতায় তাহাতে তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই, উক্ত কর্ম্মচারীগণ কোনক্রমেই কাচের উৎকৃষ্ট কার্য্য শিখাইতে চায় না"। Ramsay সাহেব উত্তরে বলিলেন, ডাক্তার! আমি অতিশয় লজ্জিত হইলাম, যদি কখন দরকার হয় আমায় বলিবেন, উত্তম কর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিব।' আর একদিন একজন বঙ্গীয় লেখক, তাঁহার পুস্তক কয়খানি ডাঃ দরকারকে উপহার দেন এবং পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত চান। পুস্তক ক'খানি ইংরাজীর অনুবাদ, ডাঃ সরকার বলিলেন 'তিন মাস পরে আসিয়ো ইংরাজীর সঙ্গে মিলাইয়া পড়িব পরে আমার অভিমত প্রকাশ করিব।' ৩ দিন পরে উক্ত গ্রন্থকার পুনরায় আসিয়া ডাঃ সরকারকে বলিলেন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া অদ্যই আপনার 'opinion' মত লিখিয়া দেন আমার বড়ই আবশ্যক, অনেকেই না পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া তিনি ২।৪ জন বড় বড় লোকের নাম করিলেন। ডাক্তার সরকার চিরকাল মিথ্যাকে ঘৃণা করেন, তিনি গ্রন্থকারের নিকট এই কথা শুনিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন, 'impartinent'! আমি না পড়িয়া মিথ্যা লিখিব এরূপ বলিতে তোমার লজ্জাবোধ



হইতেছে না, এই তোমার বই ফেরৎ লইয়া যাও, আমার কোন দরকার নাই। বড় বড় লোকের নিকট প্রশংসাপত্র লওগে, এ চাষার নিকট কেন আসিয়াছ? আমি কোন ক্রমেই না পড়িয়া প্রশংসাপত্র বা অভিমত প্রকাশ করিতে পারিব না।" বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অবস্থা বিশেষে কর্কশ হইতেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উপর তাঁহার আস্থা ছিলনা তিনি বলিতেন 'Universities are the graves of talent' আপনার পৌত্রদিগকে থার্ড সেকেণ্ডক্লাস পর্য্যন্ত গৃহে পড়াইয়া তবে স্কুলে দিতেন। কালেজে থিয়েটার এবং বালকের স্ত্রীলোকের Part অভিনয় করা তিনি ভাল বাসিতেন না, মুখে রং দেওয়া তিনি বারম্বার নিষেধ করিতেন। মহাভারত ও রামায়ণের অংশ বিশেষ অভিনয় তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। বেণীসংহার, হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবগৌরব প্রভৃতির অভিনয়ের তিনি খুব প্রশংসা করিতেন, 'রাজারাণী' 'ভ্রমর' প্রভৃতির কথা তিনি তত উল্লেখ করিতেন না। রামপ্রসাদের সঙ্গীত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। নীলকণ্ঠ ও দাশরথি রায়ের গানও তিনি শুনিবার জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। গীত শুনিতে শুনিতে ডাঃ সরকার তন্ময় হইয়া যাইতেন, দরদর ধারে অশ্রু পড়িত, কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না। আগ্রহের সহিত তিনি অনেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন নীলকণ্ঠের গীতাবলী কি ছাপা হইয়াছে? মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব্বে আমি একখানি নীলকণ্ঠের গীতাবলী আনিয়া দিই, তিনি আহ্লাদের সহিত উহা পাঠ করেন।

তিনি পুরাতন দ্রব্য অতি যত্নের সহিত রাখিতেন। পুরাতন পুস্তক, পুরাতন খেলনা, পুরাতন বাসন, পুরাতন টিকিট তিনি সঞ্চিত রাখিতেন, একটী প্রিয় কাকাতুয়ার মৃতদেহ তিনি stuff করিয়া যত্নের সহিত রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্রের শৈশবকালের ধামিটীও যত্নের সহিত

রক্ষিত আছে। পুরাতন ভৃত্যগণের ও দাসীগণের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ ছিল। তাঁহার সহিত যাহাদের মিশিবার সুযোগ হইত এবং যাহাদের চরিত্রাদি ভাল, তাহাদিগকে ডাঃ সরকার আপনার বালক বালিকার ন্যায় ব্যবহার করিতেন, পুত্র পৌত্রাদির ন্যায় তাহারা বাটী নিঃসঙ্কোচে খাদ্যাদি চাহিত ও আহ্লাদের সহিত গৃহকর্ত্রী তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতেন। এ বিষয়ে ডাক্তার সরকারের পুত্র ও পৌত্রাদির গুণ উল্লেখ না করিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তাঁহারা গর্ব্ব কাহাকে বলে জানেন না, সকলের সহিত করুণ ও সরল ব্যবহার করেন, যাহাকে একবার ভাল জানিয়াছেন, তাহাকে আর তাঁহারা ছাড়িতে চান না। ডাক্তার সরকারের বাটীতে অনেক ছাত্র প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই নিজের বাটীর ন্যায় নিঃসঙ্কোচে তাঁহার বাটীতে থাকিত।

ডাঃ সরকার ৺ রামতনু লাহিড়ীকে ভক্তি করিতেন। তাঁহার ন্যায় তিনিও বালকগণকে শিশুকাল হইতে মিথ্যাকে ঘৃণা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। একবার তাঁহার পৌত্রের প্রাইভেট টিউটার স্কুলে ভর্ত্তি করিবার কালে তাঁহার পৌত্রের বয়স ছয়মাস কমাইয়া দেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, খাঁদুর বয়স কত লিখিয়াছ? উত্তরে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, ১১ বৎসর, ডাক্তার সরকার বলিলেন আমি বলিয়া দিলাম ১১ বৎসর ৬ মাস তুমি ১১ বৎসর লিখাইলে কেন? মাষ্টার বলিলেন ওরূপ লেখা চলিয়া আসিতেছে, নতুবা এনট্রান্সে বয়স অধিক হইবে। ডাক্তার সরকার রোষকষায়িতলোচনে তাহাকে বলিলেন 'অবিলম্বে তুমি ১১ বৎসর ছয় মাস লিখাইয়া আইস, তুমি শিশুকাল হইতে ছাত্রকে মিথ্যা কথা শিখাইতেছ, তোমার মত শিক্ষকে কোন কাজ নাই। অনেক চেষ্টার পর শিক্ষক পুনরায় কাজ পাইয়াছিলেন।



রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই তাঁহার মতে বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি তাঁহাদের অনেক চিত্র কিনিয়া রাখিয়াছেন। সীতাই তাঁহার মতে পৌরাণিক চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিশুখৃষ্ট তাঁহার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক কিন্তু তিনি খৃষ্টানগণের সহিত একমত হইতেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভালবাসিতেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত খুব ভাল ছিল না। হিন্দু আচার ব্যবহারই ভাল বাসিতেন।

ডাঃ সরকারের ধর্ম্মমত অনেকটা উদার প্রকৃতির, তথাপি তিনি হিন্দুমতেই জীবন যাপন করিয়াছেন, কখন পারিবারিক ধর্ম্মের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তিনি অনেক সময় সাক্ষাৎ করিতেন এবং ধর্ম্মালোচনা করিতেন। রামকৃষ্ণদেবকে যদিও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন না তথাপি তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিতে সন্দেহ করিতেন না। পরমহংসদেবের বক্তৃতা শুনিয়া ভক্তগণ প্রায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন কিন্তু ডাঃ সরকার কখনও একবিন্দু অশ্রু ফেলেন নাই। একদা জনৈক ভক্ত পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন "প্রভু আপনার উপদেশ শুনিয়া সকলেই রোদন করেন, কিন্তু ডাক্তার কখনও একবিন্দু অশ্রু ফেলে না?" উত্তরে পরমহংসদেব বলেন—"ছোট হ্রদে হস্তী নামিলে জল তোলপাড় করে কিন্তু সমুদ্রে নামিলে কিছুই হয় না"। ডাক্তার সরকারের হৃদয় সাগরের ন্যায় বিশাল প্রশান্ত ছিল। বাইবেল ডাক্তার সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, তিনি বাইবেলের শতাধিক সংস্করণ ক্রয় করিয়াছেন। গীতাও তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। শিশুকাল হইতেই পরমেশ্বরে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন তরণীকে, সে অবতারের অলক্ষীভূত হইতে দেন নাই। তিনি এক-স্থানে বলিয়াছেন—If I have succeeded in doing any good

to my countrymen and fellowmen it is entirely thorough that blessing, which I have felt equally in prosperity as in adversity, in health as in sickness. I have felt in his chastening rod the manifestation of His infinite mercy. ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া কখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নাই, Huxley, Mill, পড়িতেন কিন্তু নিমেষের জন্য জগৎপাতাকে ভুলেন নাই। তাঁহার Laws of nature, নৈসর্গিক নিয়মাবলীতে divine Law, জগতাধিপতির নিয়মে কোন প্রভেদ নাই। তিনি যতই বহির্জ্জগতের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিতেন, ততই তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তাঁহার মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ একই সুনিয়মে পরিচালিত। তাহার ধর্ম্মমত আমরা তাঁহার রচিত কয়েকটি গীত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। লিখিয়াছেন

'কি তোমায় ডাকিব ভাবি তাই,
আদি নাই অন্ত নাই কি নাম তোমারে দিব ?
সাকার কি নিরাকার তুমি কেমনে তা জানিব আমি
এইমাত্র কেবল বলা যায়
সাকার জড় জগৎ নিরাকার তব মন সৃজিত,
স্বর্গজনের আধার তুমি কেমনে ধ্যান করিব।
এ সব বিচার এ ভাবনা আমাদের কেবল কল্পনা
নানাজনে নানারূপে পূজে হে তোমায়
তুমি কি তা তুমিই জান আমরা মূঢ় অজ্ঞান
আমাদের দয়া করে যা বলাবে তাই বলিব।
তোমাকে চিনি না জানিনা জানিতেও পারিনা
এ বিষম কথা বলা নাহি যায়



যখন যেদিকে চাই তোমার প্রেম মহিমা দেখতে পাই
জানিয়াছি জানি নাই এই কথা কি বলিব।

ডাক্তার সরকারের আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ পূজা, তিনি বলিয়াছেন—

যা মনে করি তা সকলি তোমার
কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়
আত্মসমর্পণ করি, লওহে নাথ দয়া করি
তোমার ধন তুমি লও কাজ নাই আমার তায়।

ডাক্তার সরকার শেষ বয়সে গাহিয়াছেন—

জীবন ফুরায়ে এল তবু ভ্রম ঘুচিল না
আলো থাকতে দেখতে পেলে না আঁধারে কি করবে বল না।
জ্ঞানচর্চ্চা অনেক হল আসল জ্ঞান না জন্মিল
পাপেতে নিবৃত্তি ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ভুলেও হল না।

ডাক্তার সরকার কখন বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন নাই কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ৮টী গীত রচনা করিয়া যান তাহাতে তাঁহার সরল হৃদয়ের বেশ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে মৃত্যুর আগমন বার্ত্তা পাইয়াছিলেন—বিজ্ঞান সভার ষড়বিংশতি অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—'আজ আমি বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিলাম না আপনারা সে জন্য মার্জ্জনা করিবেন। গত বৎসর অধিবেশনে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার পক্ষে বিজ্ঞান সভায় উপস্থিত হওয়া এইবার হইতে শেষ হইল। আমার সেই কথাই সত্য হইয়াছে। শারীরিক যন্ত্রণা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমি আর গৃহ হইতে বাহির হইতে পারি না;—যেন কফিনে আবদ্ধ হইয়া আছি; আমার জীবন্ত সমাধি হইয়াছে'। ডাক্তার সরকার ষ্টোই Catoর ন্যায় মৃত্যুকে আহ্বান করেন নাই সত্য কিন্তু তাহার আগমনেও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মিশর মরানের ন্যায় গাইয়াছেন—

ভয় করো নারে মন, দেখে শমন আগমন
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু তারে কর আলিঙ্গন।
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায় লয়ে যাইতে তোমায়
করিতে তোমার যত দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে কঠিন মায়া শৃঙ্খলে
এসেছে সে কাটিতে ওই করুণ বন্ধন।
দেহ পিঞ্জরের দ্বার করিয়ে উন্মোচন
দিতে তোমার সুখময় অনন্ত জীবন।"

---

১৭ই ফেব্রুয়ারী পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবার আর কোন ক্রমেই কমিল না। ২৩শে ফেব্রুয়ারী উষাকালে ৫টা ১৯ মিনিটের সময় স্বর্ণদীপ নিভিয়া গেল। প্রভাতে গগণের সূর্য্য উদয় হইল ধরণীর সূর্য্য কোন সুখ রাজ্যে উদিত হইল কে জানে? স্বদেশবাসী অশ্রুসিক্ত সুপবিত্র ভস্মরাশি জাহ্নবীর পুতঃ বক্ষে বিজয়ার প্রতিমা বির্জ্জনের ন্যায় ভাসাইয়া দিয়া অশ্রুজলে নয়ন ভরিয়া শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার সরকার পত্নীকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বলেন। 'দুঃখ করিও না ভুকি বাঁচিয়া থাকুক তোমার কোন কষ্ট হইবে না।' পুত্রকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া বলেন 'কাঁদিতেছ কেন আমি সুখরাজ্যে যাইতেছি।' ডাক্তার সরকার মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞানহীন হন নাই। মৃত্যুর ১৫ মিনিট পূর্ব্বেও একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, পত্রের সমস্তটুকু পড়িতে পারা যায় নাই যতটুকু পড়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় সেখানি পত্নী ও পুত্রকে সান্ত্বনা পত্র দিয়াছেন। ডাক্তার সরকারের মৃত্যু কেহই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই—



"Our very hopes belied our fears
Our fears our hope belied
We thought him dying when he slept
And sleeping when he died.

বসিয়া বসিয়া পত্র লিখিতেছেন, অলস হস্ত হইতে লেখনী সরিয়া পড়িতেছে, পুত্র অমৃতলাল পিতার নিদ্রা আসিতেছে মনে করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। কর্ম্মবীর মহেন্দ্রলাল স্বজনের অজ্ঞাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সত্যই কাল আসিয়া দেহ পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, ত্রিদিবের পক্ষী ত্রিদিবে উড়িয়া গেল, স্বর্ণপিঞ্জর ভূতলে পড়িয়া রহিল।

ডাক্তার সরকারের মৃত্যুতে দেশব্যাপী শোক হইয়াছে, অমৃতলাল প্রায় সহস্র সহানুভূতি পত্র 'Condolence letter' পাইয়াছেন, লর্ড রিপন সার ষ্টুয়ার্ট বেলি, সার চার্লস ইলিয়ট, লর্ড কার্জ্জন সার এনর্ড্রু ফ্রেজার, এবং আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল স্থানের ডাক্তার ও পণ্ডিতগণ গভীরশোক প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজার পত্র যে অনেক আসিয়াছে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ডাক্তার সরকার বলিয়া গিয়াছেন, আছে তাঁহার অমর কীর্ত্তিস্তম্ভ বিজ্ঞান সভা। তাঁহার আত্মা স্বর্গে শান্তিলাভ করুক, আমাদের আশা আছে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার অনাথ বিজ্ঞানসভাকে স্নেহের কোলে তুলিয়া লইবেন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

## শ্রীম কথিত।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে, মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল।

মাষ্টার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) লালমাছকে এলাচের খোসা দেওয়া হচ্ছিল আর চড়ুই পাখীদের ময়দার গুলি, তা বলে "দেখলে ওরা এলাচের খোসা দেখেনি তাই চলে গেল, তাই আগে জ্ঞান চাই তবে ভক্তি। দুই একটা চড়ুইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই তাই ভক্তি হলোনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ) ও স্থানের মানে ঐহিক জ্ঞান—ওদের Science এর জ্ঞান।

মাষ্টার—"আবার বলে যে চৈতন্য বলে গেছে কি বুদ্ধ বলে গেছে কি যীশুখ্রীষ্ট বলে গেছে, তবে বিশ্বাস করবো তা নয়।"

"একটি নাতি হয়েছে—তা বৌমার সুখ্যাতি কল্লেন। বল্লেন একদিনও বাড়ীতে দেখ্‌তে পাইনা এমনি শান্ত আর লজ্জাশীলা,—

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে, একেবারে অহঙ্কার কি যায়গা.; অত বিদ্যে, মান! টাকা হয়েছে! এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নাই।



### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা ৫টা হইয়াছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই দোতালার ঘরে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, কোন কথা নাই।

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর সঙ্গে নিভৃতে এক একটি কথা হইতেছে।

ঠাকুর জামা পরিবেন, মাষ্টার জামা পরাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—( মাষ্টারের প্রতি ) দেখো এখন আর বড় ধ্যান ট্যান কর্‌তে হয় না। অখণ্ড একেবারে বোধ হয়ে যায়, এখন কেবল দর্শন।

মাষ্টার চুপ করিয়া রইলেন, ঘরও নিস্তব্ধ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার আর একটি কথা কহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—( মাষ্টারের প্রতি ) আচ্ছা এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে আর আমায় ছাখে—কথা নাই গান নাই; এতে কি ছাখে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি ঈঙ্গিত করিতেছেন যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে?

মাষ্টার উত্তর করিলেন—

"আজ্ঞে এরা সব আপনার কথা অনেকে আগে শুনেছে, আর ছাখে যা কখন ওরা দেখ্‌তে পায় না। সদানন্দ বালকস্বভাব নিরহঙ্কার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা, সেদিন ঈশান মুখুর্য্যের বাড়ী আপনি গিছিলেন; সেই বাহিরের ঘরে পাইচারি কচ্ছিলেন; আমরাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বল্‌লে এমন সদানন্দ পুরুষ কোথাও দেখিনি।

মাষ্টার আবার চুপ করিয়া রইলেন, ঘর আবার নিস্তব্ধ। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার মৃদুস্বরে মাষ্টারকে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা ডাক্তারের কি রকম হচ্ছে, এখানকার কথা সব কি বেশ নিচ্ছে।

মাষ্টার—এ অমোঘ বীজ কোথায় যাবে, একবার না একবার একদিক দিয়ে বেরোবে। সেদিনকার একটা কথায় হাসি পাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা?

মাষ্টার—আপনি সেদিন বলছিলেন, যদু মল্লিক খাবার সময় কোন্ ব্যঞ্জনে নুন হয়েছে, কোন্ ব্যঞ্জনে নুন হয়নি এ বুঝতে পারে না। এত অন্যমনস্ক। কেউ যদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে নুন হয় নাই তখন এঁ্যা এঁ্যা করে, বলে নুন হয় নাই? ডাক্তারকে আপনি এই কথাটা শোনাচ্ছিলেন। ও অহঙ্কার করে বলছিল কি না যে আমি এত অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আপনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে সে বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক; ঈশ্বরচিন্তা করে অন্যমনস্ক নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগুলো কি ভাব্‌বে না?

মাষ্টার—ভাব্‌বে বই কি। তবে নানা কাজ, অনেক কথা ভুলে যায়।

আজকেও বেশ বোল্লেন, ও যখন বয়ে ও তান্ত্রিকের উপাসনা জননী রমণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বল্‌লুম।

মাষ্টার—আপনি বল্লেন, হেলে গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিতের কথা। (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)

আর বললেন সেই রাজার কথা যে বোলেছিল তুমি আগে বোঝো। (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)

আর বল্‌লেন গীতার কথা। গীতার সার কথা কামিনী কাঞ্চনে



আসক্তি ত্যাগ। ডাক্তারকে আপনি বোল্লেন যে সংসারী হয়ে ত্যাগী না হয়েও আবার কি শিক্ষা দেবে! তাও বুঝ্‌তে বোধ হয় পারে নাই। শেষে ধারা ধারা ব'লে চাপা দিয়ে গেল।

ঠাকুর ভক্তের জন্য চিন্তা করিতেছেন, বালক ভক্ত পূর্ণ, তাঁহার জন্য মনীন্দ্র ও বালক ভক্ত; পূর্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে ঠাকুর তাঁহাকে পাঠাইলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব প্রসঙ্গে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কয়েকটি ভক্ত ও যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন তাঁহারা সেই ঘরে একটু দূরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর অন্তর্মুখ—কথা কহিতেছেন না। ঘরের মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন, বলিলেন ইনি আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইনি কিরণময়ী লেখেন।

কিরণময়ীর লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিবেন।

নরেন্দ্র—(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ইনি রাধাকৃষ্ণের বিষয় লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(লেখকের প্রতি) কি লিখেছো গো বল দেখি।

লেখক—রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, ওঁকারের বিন্দুস্বরূপ। সেই রাধাকৃষ্ণ পরব্রহ্ম থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে পুরুষ প্রকৃতি শিবদুর্গা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ! নিত্য রাধা নন্দঘোষ দেখেছিলেন। প্রেম রাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, কাম রাধা চন্দ্রাবলী।

"কাম রাধা প্রেম রাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্য রাধা। প্যাজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোসা, তার পরে ঈষৎ লাল, তার পরে সাদা, তার পরে আর কোন খোসা পাওয়া যায় না। ঐটি নিত্য রাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হয়ে যায়"।

"নিত্য রাধাকৃষ্ণ আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য্য তাঁর রশ্মি। নিত্য সূর্য্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ।"

"শুদ্ধ ভক্ত কখন নিত্যে থাকে কখন লীলায়।"

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, দুই কিম্বা বহু নয়।"

লেখক—আজ্ঞা, 'বৃন্দাবনের কৃষ্ণ' আর 'মথুরার কৃষ্ণ' বলে কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতরা তা বলেনা, তাদের এক কৃষ্ণ, দ্বারিকার কৃষ্ণ ঐ রকম।

লেখক—আজ্ঞা রাধাকৃষ্ণ, পরব্রহ্ম ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ! কিন্তু তাঁতে সব সম্ভবে, সেই তিনিই নিরাকার সাকার তিনিই সরাট বিরাট তিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি।

"তাঁর ইতি নাই—শেষ নাই—সব সম্ভবে। চিল শকুনি যত উপরে উঠুক না কেন আকাশ গায়ে ঠেকে না।

যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম কেমন তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলেও মুখে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে কেমন ঘি। তার উত্তর কেমন ঘি না যেমন ঘি। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম আর কিছুই নাই।

---

# সৎ-মা।

## ( আত্মকাহিনী )

৩

উচ্ছ্বসিত স্নেহাবেগে কর্ত্তা একদিন বলিয়া ফেলিলেন কঠোর পরিশ্রমরূপ আতপতাপে আমার বদন-কুসুম দিন দিন বিশুষ্ক হইয়া পড়িতেছে, অতএব আমার একজন সাহায্যকারিণী প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ত্রিকুলে এমন কেহ নাই যিনি আমার মুখপদ্মের সরলতা রক্ষা করিতে সাহায্য করেন।

কাজেই স্থির হইয়া গেল পুত্রবরের বিবাহ দিয়া একটি বধূ আনাই শ্রেয় কল্প। আমিও ইহাতে সম্মতি দিলাম। কারণ একটি সঙ্গিনীর অভাব আমিও অনুভব করিতে ছিলাম এবং পুত্রবরের চরিত্র সম্বন্ধেও আমার কিছু সংশয় জন্মিতেছিল।

বলিতে ভুলিয়াছি পুত্রের নাম নীলমণি। বৈশাখের প্রারম্ভে পুণ্য দিনে নীলমণির বিবাহ হইয়া গেল। চেলিমণ্ডিতা বালিকা শুষ্ক মুখে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিবাহের পরদিনে আত্মীয় স্বজন ও জন্মভূমির নিকট চিরবিদায়ের করুণ দৃশ্য তখনো আমার হৃদয়ে জাগিতেছিল। উচ্ছ্বসিত স্নেহাবেগে "এস মা এস" বলিয়া বালিকাকে বক্ষে টানিয়া লইলাম। যদিও বয়সে আমি আমার পুত্রবধূ অপেক্ষা দুই বৎসরের অধিক কালের বড় হইব না তথাপি আমার চাল চলন দেখিলে আমাকে ত্রিংশতের নিম্ন পর্য্যায়ে অবস্থিত মনে হইত না। এটা প্রবীণ সংসর্গের ফল। ঐ যে সংস্কৃতে কি বলে "সংসর্গজা" ইত্যাদি। নলোক পরা, রং করা কাপড় পরা, বহু-

দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। এখন বধূ পাইয়া প্রকৃত শাশুড়ী হইয়া বসিলাম।

বধূর অবস্থাও আমারই মত হইল। কর্ত্তা আমার প্রতি স্নেহবশতঃ বধূকে আর পিত্রালয়ে ফেরত পাঠাইলেন না—আমিও সাহচর্য্যের জন্য ব্যাকুল ছিলাম, এ বিষয়ে কর্ত্তাকে কোন অনুরোধ করিলাম না।

বধূ দেখিতে আসিয়া প্রবীণা গৃহিণীগণ আমাকে বলিয়া গেলেন বধূর প্রতি যেন আমি বেশ যত্ন "আয়ত্তি" করি; কারণ সৎ-সন্তানের সংসার! নানারকম কথা উঠিতে পারে।

আমি নম্রভাবে তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

বধূকে পাইয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমার সাধ্য ও সচ্ছলতার অনুরূপ যত্ন ও আদরের কোনও রূপ ত্রুটি করি নাই।

কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ বধূমাতার মনোরঞ্জনে কোন প্রকারেই সমর্থ হইলাম না। তাঁহার স্বভাবেই কোন ত্রুটি ছিল, অথবা বাটীর বা প্রতিবেশীবৃন্দের কুশিক্ষা বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার মুখের অপ্রসন্নতার মেঘাড়ম্বর কিছুতেই বিদূরিত হইল না। আমি হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম।

অতি অল্পদিন মধ্যে গ্রামে চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল যে আমার নিদারুণ অত্যাচারে ও অন্নাভাবে বধূর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ মসীনিন্দিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার কমলদলায়ত লোচন যুগ দুঃখে ও ক্রোধে কোটরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে।

বিবাহের পর হইতে বাবাজির বক্রদৃষ্টি কিছুদিনের জন্য সরলতা ও শীতলতা অবলম্বন করিয়াছিল, এই সকল সংবাদ শ্রবণে বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয়তমার সৌন্দর্য্যহানির আশঙ্কা জ্ঞানে সে আপনার মহিষ-



লাঞ্ছিত বক্রতা ও লেহিত্য পুনঃ প্রাপ্ত হইল! আমি মনে মনে একটু হাসিয়া লইলাম।

৪

পুত্রবরের হুহুঙ্কার এবং কর্ত্তার কটূক্তির মধ্যে বধূমাতা পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল এই প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি শান্তিলাভ করিলাম। কিন্তু এদিকে আর এক নবতর ঘটনা সংঘটিত হইবার আয়োজন হইতে লাগিল।

প্রাতঃকালে সদর দুয়ারে জল দিতে গিয়া দেখিলাম এক আগন্তুক ক্ষুদ্র পুঁটুলি কক্ষে লইয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিয়া আছে।

সে আমাকে দেখিয়াই "মামী মা" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমি পূর্ব্বে কখনো তাহাকে দেখি নাই, সুতরাং সঙ্কুচিত হইয়া অঙ্গন মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম।

কর্ত্তা তখনো প্রাতনিদ্রার গভীর আরাম উপভোগ করিতেছিলেন। আমার ডাকা ডাকিতে চমকিয়া চক্ষু মেলিলেন। আগন্তুকও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাটীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কর্ত্তার নিদ্রা-মুক্ত লোহিত চক্ষু তাহার মুখের উপর পড়িবামাত্র কর্ত্তা স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন "আরে কেষ্টা যে! আয় আয়।"

কৃষ্ণচন্দ্র মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন! তখন উভয়পক্ষের নানা কথার আলোচনা আরম্ভ হইল। আমি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলাম।

এক একজন লোকের অতি সহজে ও অনায়াসে কেমন মিলিবার ক্ষমতা থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রেরও সেই ক্ষমতাটী ছিল। দুই দিনের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র আমায় এমন আপনার করিয়া লইল যে তাহার নিকট আমার আর কিছুমাত্র সঙ্কোচ রহিল না।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স ২০ বৎসর হইবে, কিন্তু তাহার সরল আয়ত লোচনে কি ছিল তাহাকে দেখিয়া কিছুতেই যুবা বলিয়া মনে হইত

না। ১২।১৩ বৎসরের বালকের মত তাহার বুদ্ধি ও স্বভাব। সুতরাং আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাহাকে আমার নিতান্ত শিশু বলিয়া মনে হইত এবং তাহাকে লজ্জা করিবার চেষ্টা করিলে সে এমন সরল মধুর হাসি হাসিয়া উঠিত যে তাহাকে লজ্জা করিতেই লজ্জা হইত।

সঙ্গলাভের জন্য আমার হৃদয়ে যেএকটা প্রবল লালসা বহুদিন হইতে জাগিতেছিল, এবং বধূমাতার অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখমণ্ডল যাহা আদৌ পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিল।

কাঠ কাটা ও রন্ধন ব্যাপারে সাহায্য হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ দ্বিপ্রহরে গল্প ও গান দ্বারা আমার চিত্ত বিনোদন পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের ভাগ লইয়া কৃষ্ণচন্দ্র আমার জীবনের মধ্যে কোন অবকাশ রাখিল না।

তাহার পরিপূর্ণ স্নেহখানি জননীর মত আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ও শীতল করিয়া রাখিত। কর্ত্তাও কৃষ্ণচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুতরাং এ সকল ব্যাপারে তাঁহার আদৌ আপত্তি ছিল না।

কিন্তু আমার হিতৈষী প্রতিবেশীবৃন্দ আমার অমঙ্গল আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ রায়গৃহিণী একদিন স্পষ্টই বলিয়া গেলেন যে কর্ত্তা বৃদ্ধ বয়সে অনেক আশা করিয়া আমায় ঘরে আনিয়াছেন আমি যেন তাঁহার সাধের ঘরে আগুন লাগাইয়া না দি।

আমি প্রতিবেশীবৃন্দের নিকট এজন্য তাঁহার মারফত বহুধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম, কিন্তু সেই বালক স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। বলিলেও যে কোন ফল হইত তাহা মনে হয় না, সে শুধু নির্ব্বোধ, বিস্ময়ে তাহার বড় বড় চক্ষু মেলিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিত।



৫

কর্ত্তা বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষের কোন শ্যালক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আপন ভূতপূর্ব্ব শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। পুত্রবর পূর্ব্ব হইতেই বধূ বিরহে বিধুর হইয়া শীতল হইবার আশায় পত্নীর অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় চন্দ্র-কিরণ বৃক্ষান্তরাল পথে আসিয়া কক্ষ পার্শ্বস্থ বাপীবক্ষে পাপীর চিত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছিল—স্থির তারকামালা অনিমিষচক্ষে ধরণীর সুপ্তশোভা সন্দর্শন করিতেছিল।

কৃষ্ণ বলিল "মামীমা একটা গান গাহিব।"

কৃষ্ণ দিনকতক যাত্রার দলে ছিল, তার গলাটিও বেশ মিষ্ট।

আমি বলিলাম "বেশ ত।"

কৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল "মা আমায় ঘুরাবি কত?"

সেই শান্তস্নিগ্ধ আকাশতলে একদৃষ্টে চন্দ্রিকাখচিত বাপীবক্ষ দেখিতে দেখিতে মন কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল লীলাময়ী জগতজননী জীববৃন্দের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া দিয়া স্নেহাস্মিত মুখে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। সন্তানগণকে রুদ্ধচক্ষে বিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যন্ত্রণা পাইতে দেখিয়া তাঁহার মুখে মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহার মাতৃবক্ষ স্নেহভরে স্ফীত হইয়া গৃহভ্রষ্ট সন্তানগুলির জন্য ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে সন্তান যদি ডাকে "মা আমায় ঘুরাবি কত?" তাহা হইলে আর কি সে স্নেহ কোমল জননীর প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? জননীর স্নেহ হস্ত আমি হৃদয় দেশে স্পষ্ট অনুভব করিলাম চক্ষে জল আসিল।

কতক্ষণ এ ভাবে বিভোর ছিলাম জানিনা, সহসা নাপিত বৌ এর পরিহাস ক্রূর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "বেশ গো ঠাকুরুণ খুব কানাইয়ে ভাগ্নে পেয়েছ যা হোক্।" কৃষ্ণচন্দ্র তখনো তন্ময় হইয়া গাহিতেছিল

"বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা, দুঃখ নয় সে দয়া তোমায় জেনেছি মা তাপহারা।"

তাহার মুদিত চক্ষে বারিধারা ঝরিতেছিল—গাহিতে গাহিতে সে এমনি তন্ময় হইয়া যাইত।

খানিক পরে গান শেষ হইলে কৃষ্ণকে বলিলাম কৃষ্ণ, শোওগে, অনেক রাত হয়েছে।" কৃষ্ণ আমায় প্রণাম করিয়া বাহিরে শুইতে গেল। বিছানায় শুইয়া আর একবার নাপিত বৌএর উক্তি স্মরণ করিয়া মানুষের অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের কথা ভাবিয়া একটু হাসিয়া লইলাম। হাসাটা আমার কেমন স্বভাব। কোনও বিষয়ে অধীর হওয়া আমার অভ্যাস ছিল না। কোনও স্ত্রীলোক এই উক্তি শ্রবণের পর যে নিদ্রা যাইতে পারিত এমত আমার মনে হয় না। আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

মানুষ স্বভাবতঃই পরার্থ পর। এজন্য আদৌ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

নাপিত বৌ কখনও বালিকা বিদ্যালয়ে যায় নাই এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; তথাপি সে কার্ত্তিকের হিমে আমার কল্যাণ কামনায় অন্ধকার নিশাকালে মুক্ত আকাশ তলে চারিদণ্ড কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আদৌ কষ্টবোধ করে নাই।

এই প্রবল পরার্থ প্রিয়তা কার্ত্তিকের হিমেই শীতল হইয়া গেল যদি কেহ মনে করেন তাহা হইলে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত—ইহা পর দিবসের সূর্য্যতাপে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং কর্ত্তা যেখানে তাঁহার শুভ্রশুষ্ক কলপ সাহায্যে নীলাভ করিয়া বর্ষীয়সী শ্যালিকাগণের সঙ্গে রহস্যালাপে নিমগ্ন ছিলেন সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া দিল।

ফলে পরদিন শুষ্কমুখে দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রতিবেশীবৃন্দের



অজস্র ধিক্কার ও সুবিচার জনিত গভীর পরিতৃপ্তির মধ্যে আমাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিলেন এবং নিরীহ কৃষ্ণচন্দ্রও ২।১ ঘা পাদুকা বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইল না।

ক্ষণকাল পরে পুত্রবর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—আমাদের অবিশ্বাস্য পাপাচরণ দর্শনে তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণে ধর্ম্মক্রোধ সমুদিত হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন যে পরদিন প্রাতে যদি তিনি নিজগ্রামে এই পাপিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখদর্শন করেন তাহা হইলে কাহারও মস্তক অচূর্ণ থাকিবে না—এজন্য যদি তাঁহাকে ফাঁসি যাইতে হয় সেও স্বীকার। আমার নিজের মস্তকের চূর্ণীভবনে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু পুত্রবরের ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হওয়ার বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি ছিল।

কারণ—এরূপ সৎপুত্রের মৃত্যুতে প্রসিদ্ধ বসুবংশ যদি বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে স্বর্গগত প্রাচীন বসুবৃন্দের দারুণ অভিশাপ হইতে কে আমায় রক্ষা করিত?

সুতরাং সেই দিনই সায়ংকালে আমি ও কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন পথে হরিপুর ত্যাগ করিলাম। বিদায়ের সময়ে একবার কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে লুকাইয়া দেখা করিতে গেলাম—কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে তাহার প্রশান্ত চক্ষুদুটী ফুলাইয়া তুলিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "মামী মা, কি আমার অপরাধ?" আমি বলিলাম "বাপু! সেটা আমিও যে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি এমন মনে করিও না। এর নাম সমাজ-শাসন।" বেচারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার প্রশস্ত নির্ব্বোধ চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল!

এমন সময় পুত্রবরের কঠোর কণ্ঠ কাণে গেল "আবার গেল কোথা?" আমি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে আমার পিত্রালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে পুত্রবর আমার পিত্রালয় গমন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন—এবং গমন কালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বহুমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, যে আমি ভবিষ্যতে যেন আর কখনো এ মুখো হইবার চেষ্টা না করি।

আমার স্বামী নৌকা ছাড়িয়া দিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একবার নদীতীরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল, আমাকে এতটা কঠোর দণ্ড দিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। অথচ পুত্রবরের এই ধর্ম্মক্রোধে বাধাদান করিতেও তাঁহার সাহসে কুলায় নাই।

আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল "সৎ"মা হওয়া তাদৃশ কঠিন ব্যাপার নহে, আজ সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। "সৎ"মা হইতে গিয়া অসতীর অপবাদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

## ৺সতীশচন্দ্র রায়।

নন্দন কানন হ'তে বসন্তের নিঃশ্বাসের প্রায়
এসেছিলে ভুলে কি ধরায়?
মন্দার-সুগন্ধি তাই এতটুক আনন্দ বিতরি'
ফিরে গেলে বিশ্ব তুচ্ছ করি'।
আপনার মনে
সাধের সাধনে
উদাসীন—নিজ সুর ধরি
নির্জ্জনে বিচিত্র কণ্ঠে গাহিয়াছ আজীবন ভরি'।
কারো তুমি ছিলে না হেথায়—
কীর্ত্তি আজি তাই বুঝি তোমা' লাগি কাঁদিয়া বেড়ায়!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। | ১৩১১। | ৫ম সংখ্যা।

## জাপান প্রবাসীর পত্র।

খরস্রোতে প্রবাহিত মুরদা বহুতর তুফান এবং ঘুটিপাক অতিক্রম করিয়া অবশেষে জাপানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কার্য্য, কারণ, ফল কিছুই বুঝিতে পারি না কেবল পবনের বেগে স্রোতের অভিমুখে ভাসিয়াছে। বিপরীত যাইবার সাধ্য নাই।

৪ঠা জুলাই প্রাতে ৫ টার সময় Messageries : Maritimes French mail S. S. Duplix. উইলিয়ম দুর্গের সম্মুখস্থিত পানিঘাট হইতে কলিকাতা পরিত্যাগ করে। আমি তাহাতে Second Class passenger টিকিট Without food লইয়াছিলাম। সে সময় কলিকাতায় প্লেগের হাঙ্গাম। আগের দিন বেলা ৩টার সময় হইতে ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য জাহাজে আসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। বেলা ৫ টার সময় ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হয়; সহযাত্রীদিগের আত্মীয় স্বজনে এবং বন্ধুবান্ধবে জাহাজ ভরিয়া গিয়াছিল। ক্রমে ভিড় একটু পাতলা হইলে পরিয়া ভগবান বড়বাড়ী হইতে যাহা কিছু আনিয়াছিলাম আহারের ব্যাপার রাত্রে তাহাতেই সমাধা করিলাম। এবার কলিকাতা হইতে নুন, লেবু, আদা, ছোলা চাউল দা'ল, ময়দা, সুজী, ঘৃত, আলু,

চা, চিনি, মসলা প্রভৃতি আর হাঁড়ি, হাতা, খুন্তি সমস্ত একটি সিন্দুকে করিয়া লইয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত মাখন, কলা, আম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। জাহাজে উঠিয়াই একটী পাচকের অনুসন্ধান করিয়া লইলাম। তাহাকে Colombo পর্য্যন্ত আহারের সিধা সামনে জিম্বা করিয়া দিয়া খাবার বন্দবস্ত করিয়া দিলাম। ৬ টার সময় চা, ৯ টার সময় স্নান, ৯॥ টার সময় ছোলার জল, ছোলা ভিজান, আদা ঈষৎ লবণ সংযোগে, ১০॥ টার সময় দিব্য মাজা দাদখানি তণ্ডুলের চারিটী অন্ন, উপরে একটু মাখন-মারা ঘৃত, পাতিলেবু। মুগের দাল, আলু ভাতে, আলু ভাজা, চড়চড়ি, আলুর দালনা, চাটনি, এবং শেষে ২।১টী সুমিষ্ট পাকা আম্র। ৪টার সময় ময়ান দেওয়া পাতলা পাতলা দু'খানি রুটী আলুভাজা পাপর এবং এক পেয়ালা চা। রাত্রি ৮ টার সময় বেশ ময়ান দেওয়া ফুলকো লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, চাটনি, পাপর, এবং শেষে ২।১টী সুমিষ্ট পাকা আম। রাত্রে শুইবার সময় এক পেয়ালা কোকো। Colombo হইতে যখন Main line Steamer Tonkin এ transhipe করিলাম তাঁহাতেও আহারের ব্যবস্থা এই প্রকারই ছিল; আর জাপান পৌছান পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থার নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। ৬ই আগষ্ট Steamer Kobe আসে। ৪ঠা জুলাই হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই ৩৪ দিনে কলিকাতা হইতে খাদ্য সামগ্রী খরিদ করা হইতে জাপান পৌছান পর্য্যন্ত আমার মোট ৪০৲ টাকা খরচ হয় ইহার ভিতর পাঠকের বক্‌শিস্। বন্দরে বন্দরে শাক তরকারি প্রভৃতি খরিদ। চাউল দাল প্রভৃতি রাখিবার সিন্দুক। ছোট পিতলের ডেক্‌চি, হাতা খন্তি সমস্তই এই ৪০৲ টাকার ভিতর। এবার যাত্রাটী একেবারে খাঁটী হিন্দুয়ানি মতে। জাত যাইবার কোন সম্ভবই ছিল না। বিশেষ জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়াছে তায় ঝড় তুফানের দিন জাত পালাইয়া যাইবে কোথা? আট ঘাট বাঁধা। যাঁহারা সমুদ্র যাত্রা করিতে ও অল্প খরচে এবং বাড়ীর মত তৃপ্তিজনক আহার



করিতে চান তাঁহারা আমার মত সমুদ্র যাত্রা করিলে প্রায় অর্দ্ধেক খরচে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন আর আহার করিয়াও বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। Steamer ৭ই Pondichery এবং ১০ই জুলাই প্রাতে প্রায় ১০ টার সময় Colombo আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতায় প্লেগের জন্য Steamer Colombo আসিয়া Quarontineএ রহিল। Steamer আসিবামাত্র ডাক্তার এবং পুলিস জাহাজে আসিল, পুলিস মোতায়েন রহিল; ডাক্তার একবার করিয়া সকলের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গেল; কিনারায় কাহারও যাইবার হুকুম নাই। কিন্তু বেলা ১১ টার মধ্যে সমস্ত যাত্রীই একে একে কিনারায় গেল। কেবল যাত্রীর মধ্যে আমি একলা জাহাজে রহিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম—হাটকোট থাকিলে এবং নামটা একটু জাল করিতে পারিলে কিনারায় যাইবার আপত্য নাই। রং এ বড় একটা আসে যায় না সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আমার উপরও ২।৪ পোঁচ বেশি। তবে দেশীয়ের মধ্যে আমি একলা। অর্দ্ধেক Chowrangee আর বাকি সব চুনো-গলি। ১৪ই প্রাতে Quarantine শেষ হইলে আমি কিনারা হইতে একখানি আরাম চৌকি এবং কিছু পাকা আম্র সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ১৫ই তারিখে Main line Mail Steamer Tonkin আসিল ২ টার সময় আমি তাহাতে পরিবর্ত্তন করিলাম। এখানে Pondichery'র ঠিকানায় নিলুবাবুর প্রেরিত কতকগুলি পুস্তক পাইলাম; যাত্রীর মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি জানেন সকলকেই এক এক কাপি দিলাম। Captain এবং Officersদের এক এক কাপি দিয়া এক কাপি 1st Saloonএ এবং এক কাপি 2nd. Saloonএ রাখিয়া আসিলাম। এই পুস্তকের জন্য জাহাজে প্রায় সকলকার সহিত আমার একপ্রকার আলাপ হইয়া গেল এবং মধ্যে মধ্যে অনেক প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার হইত। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন পাদরি এবং তাঁহার স্ত্রী পুস্তকখানি পড়িয়া

বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন এ প্রায় আমাদের Bibleএর সঙ্গে অনেক মিলে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যাহা সত্য তাহা নিশ্চয়ই মিলিবে; যাহা মিলে না তাহার মধ্যে একটী সত্য এবং অপরটী মিথ্যা হইবে এই উত্তরের মধ্যে যেটী বস্তু নির্দ্দেশ করিতে পারে সেইটীও সত্য অন্যটী তাহার বিপরীত। এই পাদরিটী আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। যদিও ইনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী কিন্তু সময় পাইলেই সস্ত্রীক আমার নিকট আসিতেন। প্রায় রাত্রি ১২।১টা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইত। Stephen Jaccob যিনি কলিকাতায় Comptroller General ছিলেন এবং পরে Finance Secretary হন ইঁনি তাঁহার সহোদরা ভগ্নীর পুত্র। ১৫ই জুলাই রাত্রি ৮টার সময় Steamer Colombo বন্দর পরিত্যাগ করে তথা হইতে ২০শে জুলাই Singapore ২২শে Cape St. Jaccob এবং ২৩শে জুলাই Saigon আসিয়া উপস্থিত হয়। Cape St. Jaccob হইতে Saigon পর্য্যন্ত অতি সুন্দর দৃশ্য। Steamer Saigon আসিলে একখানি গাড়ী করিয়া সহরটী সমস্ত দেখিয়া আসিলাম। Saigon একটী সুবৃহৎ French Colony এখানে একটী সরকারি বাগান আছে। বাগানটী যদিও ছোট কিন্তু সুন্দর হাঁসপাতালগুলি বড় মন্দ নয়, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুইপার্শ্বে তেঁতুল বৃক্ষের শ্রেণী। বৃক্ষগুলি এত ঘন সন্নিবেশিত যে এক পশলা বৃষ্টি হইলেও পথিকের গাত্রে একফোঁটা জল পড়ে না। এত তেঁতুল বৃক্ষ বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন Saigon তিন্তিড়িকুলের জন্মভূমি। এখানে চিনার বসতিই অধিক। Far eastএতে Saigon ফরাসিদিগের একটী সুবৃহৎ আড্ডা। Saigon হইতে ৩০শে জুলাই Steamer Hong Kong ২রা August Shanghi হইয়া ৬ই August প্রাতে ৮টার সময় Steamer Kobe আসিয়া উপস্থিত হয়। কচি মধ্য জাপানের একটী সুবৃহৎ বন্দর। জাহাজ বেলা ৪টার সময় Yokohama যাইবার



কথা, সেইজন্য Pierএ না যাইয়া কিনারা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে নঙ্গর করে। আমি আহারাদি করিয়া ১০টার সময় একটু পরিবর্ত্তনের জন্য কিছু ফলমূল লইতে Companyর Steam Launchএ কিনারায় যাইলাম। প্রায় ২॥টার সময় ফিরিয়া আসি। Companyর Steam Launch কিনারার অপেক্ষা করিতেছিল, আমি উঠিবামাত্র Launch কিনারা ছাড়িয়া জাহাজের দিকে চলিল। কিনারায় লোকের ভিড় অনেক ছিল কিন্তু আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। Launch কিনারা হইতে একটু আসিলে দেখিলাম Tonkinএ আগুন লাগিয়াছে। Bridge শিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচণ্ডরূপে চলিতেছে। প্রবল বায়ু সংযোগে শিখা ক্রমে প্রচণ্ড হইতেও প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিতেছে। যেন সমস্ত জাহাজখানি ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাস করিবে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

Tonkin নূতন জাহাজ। সবে ৫ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার tonnage 6363 এবং 7290 H. P. Captainএর নাম Sehmidt ২৪শে জুন Marseilles পরিত্যাগ করে। Messageris Maritimesএর যতগুলি steamer আছে তাহার মধ্যে Tonkin একখানি বড় Steamer.

যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলাম ততই ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। দেখিলাম forehold ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সেখানে যেন অগ্নির জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। Bridge, front funnel এবং দুখানি Boat একেবারে জমিয়া গিয়াছে। P. and O. Companyর Steamer Candiaর সমস্ত লোক এবং অন্যান্য জাহাজের Officersরা ও Kowasaki Dockyardএর লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাণের বহুতর চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছেনা; কৃষ্ণবর্ণ ধূমে জাহাজ আচ্ছাদিত। সেই ধূমরাশি আকাশমার্গ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া নিকটস্থ

জাহাজ সকলকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—উঃ—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ক্রমে জাহাজের উপর গিয়া উঠিলাম—জাহাজে লোকে লোকারণ্য ; সকলে ব্যস্ত। আমার Cabineএ গিয়া দেখিলাম Cabineএর দ্বার উন্মুক্ত একটী trunk যাহাতে আমার গরম বস্ত্রাদি এবং টাকাকড়ি ছি সমস্তই গিয়াছে। Purser হইতে boy পর্য্যন্ত একে একে সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহই বলিতে পারিল না। চারিদিক অনু- সন্ধান করিয়া হতাশ হইলাম। অগত্যা আশা পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিকাণ্ডটী ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তখন Steamerএ Passenger একটীও নাই। মাল খালাস করিতে করিতে জাহাজে আগুন লাগে। অগ্নি প্রথমে foreholdএ দেখিতে পাওয়া যায় এখানে প্রায় 5000 barrels Chlorate of Potash ছিল। ২টার সময় অগ্নিলাগার জন্য প্রথম alarm দেওয়া হয় এবং সাহায্য প্রার্থনার তখনই fire signal দেওয়া হয়। সর্ব্বদা whistle ( শিশ ) জারি ছিল। Japanএর Water Police অগ্নিব্যাপার জানিবামাত্র এক- খানি Steam Launchএ ১২টী লোক pomp এবং firehose লইয়া অগ্নি নির্ব্বাণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। Tonkinএর Captain হইতে সমস্ত Officers এবং crew পর্য্যন্ত নির্ভিকহৃদয়ে অচল-অটল- ভাবে সেই প্রচণ্ড অগ্নিশিখার সম্মুখে কার্য্য করিতে ছিল। সকলে আপন আপন কার্য্যে তৎপর এবং কটিবদ্ধ। কাহারও মুখে শব্দ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলতা নাই। কোন চীৎকার নাই। নিজের বস্তু বা শরীর বাঁচাইবার কাহারও চেষ্টা নাই কেবল কার্য্য তৎপরতা। সকলেই এক- প্রাণে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। জীবন, চরিত্র শিক্ষা এবং অভ্যাস পাকা না হইলে বিপদের সময় ঠিক থাকা সহজ ব্যাপার নহে। এখানে দেশি এবং বিলাতির শিক্ষা চরিত্র এবং কার্য্য শৃঙ্খলতার পরিচয়



পাওয়া যায়। সকলেই আমাকে জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বলিল।

তখন জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক জলিয়া গিয়াছে। অগ্নি ক্রমশই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। অবশেষে নির্ব্বাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া জাহাজ কিনারায় ডুবাইয়া অর্দ্ধেক বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জাহাজ ৪টার সময় Yokohama যাইবার কথা সুতরাং রুচির মাল প্রায় খালাস হইয়া আসিয়াছিল। কেবল Yokohamaর মাল নষ্ট হইয়াছে। যে সময় জাহাজে অগ্নি লাগে তাহার পূর্ব্বেই tramএ করিয়া সমস্ত mail matter Yokohama প্রেরিত হইয়াছিল। অগ্নি লাগিবামাত্র প্রথমেই passengerদিগকে Steam Launch করিয়া কিনারায় পৌছাইয়া দেয়। এতক্ষণ জাহাজের ভিতরের ব্যাপার দেখিতে ছিলাম। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি নামিবার রাস্তা বন্ধ, সিঁড়ি ভাসিয়া গিয়াছে। অগ্নি 2nd saloon পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। তখন সময় প্রায় সন্ধ্যা ৭টা। আমি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম জাহাজের পশ্চাতে Upper deck হইতে একটী দড়ির সিঁড়ি সমুদ্রস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। Upper deck হইতে নীচে জল পর্য্যন্ত প্রায় দুইতলা সমান উচ্চ হইবে। সমুদ্রে তুফান। নিকটে কোন নৌকা বা launch নাই। অভ্যাস না থাকিলে এ প্রকার দড়ির সিঁড়িতে অবতরণ করা বড় সহজব্যাপার নহে। বিপদের সময় অন্য উপায় না থাকিলে কঠিনও সহজ মনে হয়। আমি বিলম্ব না করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। আমাকে দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া একখানি police boat নিকটে আসিল আমি লম্ফ দিয়া তাহাতে পড়িলাম। নৌকাখানি অল্পক্ষণ মধ্যে আমায় কিনারায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এখন রাত্রি প্রায় ৮॥। সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছুই নাই ; একে বিদেশ তায় অপরিচিত স্থান, কোথায় যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না,

অধিকন্তু দেশের ভাষাও কিছুই জানিনা। যাহা কিছু পূর্ব্বে শিখিয়াছিলাম সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি। পরমাত্মার ইচ্ছায় মুরদা প্রবাহিত যেখানে ঠেকিবে সেই স্থানেই উঠিব। যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হইবে। আর কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া চলিতে লাগিলাম অল্প দূর আসিয়াই একটী পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমাকে নিকটস্থ অন্য একটী ভদ্রলোকের বাটীতে লইয়া গেলেন; তাঁহার বাটীতে যাইলাম দেখিলাম তিনিও আমার পূর্ব্বপরিচিত; ইঁহাদিগের যে বাটী কচিতে তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। পরমাত্মার কৃপায় সেই রাত্রি সেখানে রহিলাম। গৃহস্বামীর অনুরোধে আমাকে কচিতে প্রায় আরও ১২ দিন নিবাস করিতে হইল। তার পর trainএ কচি হইতে Yokohama আসি। এখানে কিছুদিন থাকিয়া Tokio যাই সেখানেও প্রায় একমাস থাকি। Tokioতে কতকগুলি ভদ্রলোকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া Yokohama Komaba, China, Kseraju প্রভৃতি অনেক স্থানে যাইতে হয়। অবশেষে Quetto এবং Nakamuraয় আসিয়া আমি পীড়িত হই। সেখানে আমার সমস্ত শরীরে বসন্ত বাহির হয়; সেই অবস্থায় আমি Tokio আসি। এখানে প্রায় একমাস আমাকে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। এই বসন্ত রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাই। পরমাত্মার কৃপায় এক্ষণে আরাম হইয়াছি। আজ ২।৪ দিন হইল Yokohama আসিয়াছি। বোধ হয় অতি শীঘ্র Tokio যাইতে হইবে।

এখানে জাপনিদিগের মধ্যে অনেকেই নিত্য হোম করে। সূর্য্য নারায়ণকে জাপানিরা "ওতেন্তোসামা" বলে; অনেকেই চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণের উপাসক। প্রত্যহ প্রাতে এবং সায়াহ্নে অতি ভক্তির সহিত নমস্কার এবং উপাসনা করিয়া থাকে। তবে হিন্দুদিগের মধ্যে আজকাল যেমন সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ইহাদিগের মধ্যেও ঠিক



সেইপ্রকার। বিশেষ কিছুই বুঝে না, বিচারশূন্য। এবং ইহার ভিতর যাইতেও চেষ্টা করে না। আজকালকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকযুবতীরা ইহাকে একটী কুসংস্কার বলে। জাপানিদিগের বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ম্মা, লঙ্কা তিব্বৎ এবং সায়াম প্রভৃতি দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে Jan সম্প্রদায়ের লোকেরা একটু বিচারবান। জাপানিদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে এবং আমার সহিত এখানকার সাধু ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা এবং ভদ্রলোকদিগের যে কথা-বার্ত্তা এবং বিচার হইয়াছিল তাহার বিষয় পরপত্রে লিখিব।

৯ই ফেবরুয়ারি Chemulpoতে রুষজাপানের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। আজকাল জাপানে পথে ঘাটে মাঠে যত্রতত্র কেবল যুদ্ধের কথা; আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে সেই এক কথা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় extra বাহির হইতেছে। জাপানিদের দেশানুরাগ এবং রাজভক্তি জগতে আজ-কাল অতুলনীয়। গরিব দুঃখী হইতে বেশ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে উত্তম উত্তম পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং যাহা কিছু মূল্যবান বস্তু আছে বিক্রয় করিয়া warfundএ টাকা দিতেছে। দেশের জন্য রাজার জন্য জাপানি কি স্ত্রী কি পুরুষ যথাসর্ব্বস্ব মায় জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। ভারতের লোক বোধ হয় জাপানির এ ভাব বুঝিতে পারিবে না। ভবিষ্যতের কথা ভগবান জানেন। উপস্থিত জলযুদ্ধে জাপানি জিতিয়াছে। জয়-পরাজয়ের ঠিক এখন কোন কথা বলা যাইতে পারে না। এ যুদ্ধ বোধ হয় অনেকদিন ধরিয়া চলিবে। এখানে গরিব হইতে বড় বড় লোকের স্ত্রীলোকেরা Red Cross Societyতে আগ্রহপূর্ব্বক ভর্ত্তি হইতেছে। এই স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছায় হাসিতে হাসিতে আহত ব্যক্তি-দিগের সেবার জন্য দলে দলে চলিয়াছে। দেশের জন্য একদিকে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা একত্রে যুদ্ধ করিতেছে। অন্যদিকে মাতা, কন্যা ভগ্নী স্ত্রী আহত ব্যক্তিদিগের সেবার জন্য হাসিতে হাসিতে যুদ্ধক্ষেত্রে

চলিয়াছে। আজকাল ষ্টেসনে বড় ভীড়। Red Cross Societyর স্ত্রীলোকেরা এবং সৈনিক পুরুষেরা সকলেই uniform পরিয়া Dai Nippon Nippon Benzai (অর্থাৎ মহৎ জেপান—জেপানের জয়) রবে উচ্চৈঃস্বরে দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দলে দলে গাড়ীতে চলিয়াছে। রেলগাড়ীতে স্থান পাওয়া ভার।

অনেক দিন হইল কলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অবধি আপনাদিগের কোন সংবাদ পাই নাই। অনুগ্রহ করিয়া পূজ্যপাদের এবং আপনার শারীরিক কুশল আপনাদিগের বাটীর সকলের এবং নীলমাধববাবু এবং তাঁহার বাটীর সকলের কুশল সংবাদ লিখিবেন আপনি; আমার প্রীতিপূর্ণ সাদর ভালবাসা গ্রহণ করিবেন। এবং নীলমাধববাবুকে আমার সাদর সম্ভাষণ দিবেন।

এবার America, England এবং France হইয়া India ফিরিবার ইচ্ছা আছে পূর্ণ হওয়া পরমাত্মার ইচ্ছা।

প্রবাহিত মুরদা।

---

# লিপিপ্রণালী।

## প্রথম প্রস্তাব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান ক্রমোন্নতি ও পরিণতির দিনে ইহার লিপি-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। তাহাতে ইহার গতি ও প্রকৃতি কতকটা বুঝা যাইতে পারে।

কোন একটা লেখা পড়িয়াই, লেখাটা কেমন তাহা আমাদের জানিবার ইচ্ছা করে, কেননা এই লিপিপ্রণালী ও রচনা ভঙ্গীতে



লেখকের অনেকটা আত্মপ্রকাশ দেখা যায়, এবং তাঁহার ক্ষমতা ও ভাব ভাষায় ফুটিয়া উঠে।

লিপিপ্রণালী প্রথমতঃ দুইদিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে, ১ম আকৃতি, ২য় প্রকৃতি।

আকৃতির মধ্যে ছত্র প্যারা প্রভৃতির গঠন, শাব্দিকতা, অলঙ্কার প্রভৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রাসাদগুণ বিশুদ্ধি, ওজস্বিতা, ভাব, মাধুর্য্য, ধ্বনি ও ঝঙ্কার গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্যারা কতকগুলি ছত্রের সমষ্টি মাত্র এবং ছত্রও আবার কতকগুলি কথা লইয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ছত্র রচনায়ও কৃতিত্বের প্রয়োজন। ছত্র কতকগুলি কথা সমষ্টি,—কিন্তু তাহাদেরও যথাযথ ব্যবহারের অনুপাতে লিপিপ্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

অনেক সময় আমরা বড় বড় ছত্র ব্যবহার করিয়া লেখাটা ঘোরালো করিয়া তুলি, প্রথমে শব্দের পর শব্দ ব্যবহার করিয়া যাই, কিন্তু শেষটার জন্য পাঠকের মনে একটা ঔৎসুক্য থাকিয়া যায়—তাহাতে ছত্রটাতে বেশ ভাবের জমাট বাঁধিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বেশ সরল ও বিষয় সুপরিচিত ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়ই তাহা দেখা যায় না—ফলে ভাষা অতি জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে—এবং অবিরত একান্ত মনোযোগের ফল বৃথা হইয়া যায়।

ছত্রকে যথোপযোগী বড় কিম্বা ছোট করিতে পারা ইহাও লিপি-প্রণালীর একটা প্রধান গুণ। অনেক সময় ছত্রটা অযাচিত ভাবে অত্যন্ত বড় কিম্বা ছোট হইয়া পড়ে—তাহার কারণ এই যে কোথায় ছত্র শেষ করিতে হইবে, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময় লিখিতে লিখিতে ছত্র এত বড় হইয়া যায় যে শেষাংশের সঙ্গে পূর্ব্বাংশের কোনও রকম ভাবসামঞ্জস্য থাকে না। আবার কোথাও একটী চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য বর্ণনাটা একটু ঘোরালো

করা প্রয়োজন, যেখানে হঠাৎ আমরা ছত্রটী শেষ করি, তাহাতে ভাব-স্রোত অর্দ্ধপথেই শুষ্ক হইয়া যায়।

অবশ্য ছত্রের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোনও রকম বাঁধা আইন কানুন করা যায় না, তাহা স্বাভাবিক ভাবোপযোগী কিম্বা বিষয়োপযোগী হওয়া প্রয়োজন। ক্রমাগত বড় কিম্বা ছোট ছত্র ব্যবহার করাও বিরক্তিকর হইয়া উঠে—সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অনেক সময় সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকেরা ছত্রাংশের মধ্যে একটা ধ্বনি ও ঝঙ্কারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, ভাষাকে সুমধুর করিয়া তুলেন। পদ্যেরই যে কেবল ধ্বনি ও ঝঙ্কার আছে তাহা নহে, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে সুলিখিত গদ্যের মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

কিন্তু "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে—এই ধ্বনি ও ঝঙ্কার গরম মসলার মত অল্প স্বল্প ব্যবহার করিলে বড়ই মধুর হয়, কিন্তু বেশী মাত্রায় ইহাও অরুচিকর হইয়া উঠে। শেষে এই হয় যে, লেখক কিছুতেই এই ধ্বনি ও ঝঙ্কারের মায়া কাটাইতে পারেন না, ভাব হইতে ভাষার উপর তাঁহার বেশী নজর পড়ে এবং ক্রমাগত পুনরুক্তি ও নিকৃষ্টভাব দিয়াও তিনি এই ভাষা বজায় রাখিতে চাহেন, —সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অপচয় ও ভাষার অবনতি ঘটে।

অনেক সময় আবার ছোটছত্রে খুব বেশী ভাব ঠাসিয়া দেওয়ায় তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না—এবং কখনও বা একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সমস্ত প্যারা শেষ করায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আমাদের ভাষায় আবার এমনও দেখা যায় যে, কোনও কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক বেশ ভাল ভাষার মধ্যে এমন একটা বেসুরা গ্রাম্য কথা ব্যবহার করেন যে তাহাতে ছত্রের মাধুর্য্য অনেক সময় নষ্ট হয়।

আর একটা কথা এই যে, ছত্রের প্রথম ও শেষাংশে পাঠকের



বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমরা সেই সেই স্থলে যদি প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যবহার না করিয়া মাঝে মাঝে তাহা প্রয়োগ করি, তাহাতে ভাষার শক্তি অনেকটা কমিয়া আসে এবং তাহা নিতান্তই "সাদামাটা" ধরণের হইয়া পড়ে। এবং সমস্ত ছত্রের মধ্যে একটা ভাবের একতা রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—ক্রমাগত ভাবের পর ভাব ব্যবহার করিয়া যদি বিভিন্ন প্রকারের ভাব একই ছত্রে গাঁথিয়া লওয়া হয় তাহাতেও লিপিপ্রণালীর সৌন্দর্য্য অনেকাংশে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

প্যারা এই সমস্ত ছত্র সমষ্টিমাত্র। প্যারাতে এক একটী ভাবের সর্ব্বাংশ ভাল করিয়া দেখান হয়, সুতরাং ছত্রসমূহের ভাবসংগতি ও সামঞ্জস্যের উপর প্যারার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে।

তার পর ভাষাকে যথাযথ অলঙ্কার ভূষিত করা বড় সুন্দর। তাহাতে ভাবের প্রগাঢ়তা ও লালিত্য বাড়িয়া যায়। সুন্দর ভাব সুন্দর কথায় বিকশিত হইবারই সুবিধা পায় এবং কঠোর গদ্যের উপরও কবিতার একটী মোহন আবরণ ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু শুধু এই অলঙ্কারের ব্যবহারের দোষে তাহা অনেক সময় হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠে। কষ্টরচিত বাক্যাড়ম্বরের অন্তরালে ক্ষীণভাব প্রায়ই অদৃশ্য রহিয়া যায়, নয় ত তাহা অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়।

এইবার আমরা লিপিপ্রণালীর প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিব।

বক্তব্য বিষয় কিম্বা রচিত প্রবন্ধ বেশ সরল হওয়া প্রয়োজন। রচনার উদ্দেশ্য কি পাঠককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া—পাঠকের মনে জ্ঞান সঞ্চার করা ভাষা দুরূহ হইলে বরং চলিতে পারে, কিন্তু রচনাভঙ্গী জটিল হইলে তাহা হইতে অর্থবোধ হওয়া প্রায় অসম্ভব।

লেখক যেভাবে রচনা করেন, রচনাদোষে অগত্যা পাঠককে তাহা বিকৃতভাবে গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় এমনও হয়, লেখক যে

বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সে বিষয়ে তাঁহারই একটা যথার্থ ধারণা নাই—মোটামুটী তিনি একটা বুঝিয়াছেন মাত্র। সুতরাং তাঁহার মনের সন্দেহের ছায়া লেখায় ঘনীভূত হইয়া তাহাকে জটিল করিয়া তুলে। আর একটা দোষ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের লিপিপ্রণালীর মধ্যে দেখা যায়, তাহা বিষয়টীর মধ্যে যাথার্থ্যের অভাব। অর্থাৎ যে বিষয়টীর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার সম্বন্ধে মোটামোটী সত্যটা আমাদের জানা আছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, তাহাও লিপিপ্রণালীর পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্নকর সন্দেহ নাই।

কারুণ্য ও রসিকতা। অনেক সময় রচনায় করুণা ও রসিকতা প্রকাশের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। ঠিক যে কথা যেমন করিয়া বসাইলে, এবং যে ভাবের সঙ্গে যে ভাবটী গাঁথিয়া পাঠকের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করে তাহা আমাদের জানা নাই, কাজেই অনেক সময় করুণা উদ্রেক করিতে গিয়া আমরা হাস্য এবং হাস্য উদ্রেক করিতে করুণা উদ্রেক করি মাত্র!

তাহার পর ভাষার লালিত্য। এ বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হইলে ভাল হয়। দুরূহ, জটিল ভাব ও ভাষালালিত্যগুণে যে শ্রুতি-বিমোহন ও মনোগ্রাহী হইতে পারে বঙ্গভাষায় দু'চারি জন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের লিপিপ্রণালী হইতে তাহা বুঝা যায়। কবিতার বিবিধ ছন্দে যে বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হয়, গদ্যেও তেমনি ঝঙ্কারের সৃজন হইতে পারে। সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রাগিণী। গদ্যেরও তেমনি বিভিন্ন বর্ণনায়, বিভিন্ন রচনাভঙ্গী। সুলেখকের মোহন মন্ত্রে যেন রচনাস্রোত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব ভাবে হিল্লোলিত হইয়া উঠে। কোথাও আরম্ভে নির্ঝরের কুলুকুলু নীরব সঙ্গীত, কোথাও অতিবিস্তৃত নদীতরঙ্গের জলোচ্ছ্বাসের গভীর গর্জ্জনের মত গম্ভীর নিনাদ যেন



ফেনিলনীল অনন্ত সমুদ্রের মত অতলস্পর্শ অপ্রমেয় ভাব ও সঙ্গীতে শেষ হইয়া গেছে।

ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। যাঁহারা "সৃজন" না হইয়া "সর্জ্জন" হইবে "পর্য্যটক" না হইয়া "পর্য্যাটক" হইবে প্রভৃতি গভীর বৈয়াকরণিক প্রহেলিকায় নিমগ্ন আছেন সব বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমি একমত হইতে পারি না। কারণ বঙ্গের ভাগি-রথীকে যদি গোমুখীতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে বহুকাল প্রচলিত ও খাঁটী বাঙ্গালার কথাগুলিকে আবার খাঁটী সংস্কৃত বেশে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া লেখকের যথেচ্ছাচারি তার প্রশ্রয় দিতে বলিতেছি না। যে "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ" বলিয়া সক-লেই সে নজির চালাইতে পারে না। দু'একজন প্রতিভাবান লেখক ব্যাকরণের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন তাহাতে তাঁহাদের কোনও বাধা নাই—কেন না ব্যাকরণই তাঁহাদের অনুসরণ করিবে, কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধ করকণ্ডুয়তি নিবারণের জন্যই এবং ব্যাক-রণের জ্ঞানাভাব বশতঃ অপশব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের মার্জ্জনা করা যায় না। সুতরাং সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে যাহা আছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই চলুক, কিন্তু প্রচলিত শব্দ যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে—তাহাদের সেইভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। তবে এই শব্দের অপপ্রয়োগে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু যাঁহারা বিদেশীয় বিজাতীয় ভাব আমাদের ভাষায় ব্যবহার করিতেছেন—তাঁহারা এক কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিতেছেন।

তাঁহাদের "স্বাস্থ্যকর প্রভাব" "উত্তপ্ত আগ্রহ" "রক্তাক্ত বেদনা" আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—তাঁহাদের বিজাতীয় ভাব দুষ্ট চিতাবলীও আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু যে ভাবের মূল জাতীয় হৃদয়ে নিহিত নাই—তাহা কয়দিনের জন্য? সুতরাং তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়া

প্রবন্ধ দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই সব বিষয়ে অর্থাৎ ভাষা ও ভাবের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে লেখকবর্গের সাবধান হওয়া উচিত।

অন্যান্য বক্তব্য আমরা পরপ্রবন্ধে বলিতেছি।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# কাব্য।

"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"। কাব্য শুধু রসাত্মক বাক্য নহে; বাক্যের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য। বাহ্য জগতের হাসি, খেলা, ঝড়, বৃষ্টি লইয়া কাব্য খেলা করে। বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগৎ ক্রীড়া করে। রিপুবশে লোভ পরবশ হইয়া অবস্থাভেদে লোকের মন, নানা-রূপ ধারণ করে। আকাশে মেঘ উদিত হয়, বায়ুর হিল্লোলে প্রতি-মুহূর্ত্তে রূপান্তর আকারান্তর গ্রহণ করে। কখনও ঘন হয়, কখন তরলের উপরে বা নীচে ঘনভাব, কখনও বা ঘনভাবের নানাত্ব পরিদৃশ্যমান; কখনও বা একদেশ গাঢ় নীল বা কৃষ্ণবর্ণ, উপরে বা নীচে তরল নীলিমা; প্রান্তভাগ, দূর পশ্চিমভাগ গাঢ় উজ্জ্বল লালবর্ণ, ক্রমে ক্রমে তরল লাল সান্ধ্যমেঘ, মানুষের অন্তঃকরণও তাহাই। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, অথচ মনোহর সামঞ্জস্য, পূর্ণতা বিকাশ ও অপরূপ মাধুরী। মানুষের অন্তঃকরণ কখনও সুন্দর; কখনও বীভৎস কখনও লোভে গাঢ় কৃষ্ণ; উত্তেজনায় রৌদ্র, ভয়ঙ্কর অশনি, প্রকাণ্ড মরুভূমি মরীচিকাময়। অথচ পরস্পরের সামঞ্জস্য আছে, এক অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে এবং অজ্ঞাত-ভাবে অবস্থান্তরে পরিণত, তাহাতেই কত বাহার। বাক্য, মূল হইয়াও এইভাবের বিকাশক, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষক। অন্তঃকরণ, প্রবল-স্রোতে বহিয়া যায় পর্ব্বত হইতে বেগে পতিতা অনিবার্য্যবেগা নদী, শত



শত বাঁকে বহিয়া যায় ও নানা রূপ ধারণ করে। সূর্য্য শত শত আকারে ইহার পক্ষে প্রতিফলিত হয়। সঞ্চরণশীল কৃষ্ণমেঘ বা কখনও কালিমায় পূর্ণ করে। তাই অন্তঃকরণের মত সৌন্দর্য্য! এত কান্তি। অন্তঃ-করণের বেগ বন্ধ কর মানুষ মরুভূমি হইয়া পড়িবে। বেগ বন্ধ না কর দেখিবে, ধরাতলকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে নানাপুষ্পে শোভিত উদ্যানে, রঞ্জিত করিয়া স্ফীতবক্ষে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে গমন করিতেছে, ইহা অনিবার্য্য! কেহই নদীকে উৎপত্তি স্থলে ফিরাইয়া আনিতে পারে না, কেহই ইহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নয়।

কাব্য চিত্র বিদ্যার ন্যায় প্রকৃতির অন্তঃকরণে সকল ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। ইহা প্রাকৃতিক জগতের ইতিহাস; কিন্তু ইতিহাসের ন্যায় কেবল ঘটনাবলিতে চিত্রিত করে না। রূপরসে মানব চিত্তের ভাবগুলি কার্য্যকারণের পারম্পর্য্য প্রকাশ করে, নিবদ্ধ করিয়া দেখায়। পুষ্পমালা গুম্ফিত হইলে এত মনোহর হয় না; শিশুর সুকুমার বদন এত সুন্দর দেখায় না। কাব্য ভীষণত্ব ও শান্তত্ব লইয়া একত্র গুম্ফিত করে অথচ পরস্পর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মধ্যে, অবস্থার প্রকারভেদ মধ্যে ঘনত্ব, তরলত্ব মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ইহাই কাব্যের লক্ষণ, কাব্যের প্রকৃতি। যদি বাহ্য জগতের বাহ্য চিত্তের সহিত অন্তর্জগতের আভ্যন্তরিক চিত্তের সৌসাদৃশ্য, একত্র না রাখিতে পারে সে, কাব্যই নহে; কেবল শব্দের পরম্পরামাত্র; কেবল ছন্দের আঁটা আঁটিমাত্র; কাব্য নহে। মানব হৃদয় বিনাকারণে খেলে না; বাহ্য জগতও বিনা কারণে ক্রীড়া করে না। মানব হৃদয়ে যে কারণে যে ভাবের উদয় হয়, বাহ্যজগতেও সেইকারণে সেই ভাবের উদয় হয়। একটী চৈতন্যময়, অনুভব শক্তি সম্পন্ন, অন্যটি কেবল ভাবমাত্র; চৈতন্যবিহীন। অথচ একটী না হইলে অন্যটির পুষ্টি হয় না, পরিপূর্ণতা হয় না। অচৈতন্য লইয়া চৈতন্যের খেলা; চৈতন্যের বিকাশ ও পূর্ণতা। এই চৈতন্যের

ভিতর নিত্যত্ব, অনন্তত্ব বা মনুষ্যত্ব আছে; একত্ব বা ব্যক্তিত্ব নাই। কাল ও দেশের সম্পূর্ণ শক্তির বিকাশ আছে। দর্শক এইরূপে মুগ্ধ, এই সৌন্দর্য্যে আত্মহারা! তাই কাব্য দর্শনে বা শ্রবণে আত্মহারা, আপনাকে তন্ময় মনে করে এবং সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও অন্যান্য দ্বন্দ্বভাব মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করে। ইহাই ব্রহ্মানন্দ, ইহাই রস। রস, নির্জ্জীব বাক্য গুলির সজীবতা সম্পাদন করে এবং মানব চিত্তের প্রকৃত নকল বা ফটো রাখিয়া দেয়। লোককে জিজ্ঞাসা কর কাব্য পড়িয়া এত উত্তেজিত হও কেন, এত বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হও কেন, এত শোকাতুর হও কেন, এত বৈরাগ্য অনুভব কর কেন? লোক বলিবে, আমার ক্রোধ সুসদৃশ জগতের রৌদ্রত্বে আমার সহানুভূতি আছে, নিরাশা মরীচিকায় আমার সহানুভূতি আছে; বাহ্য জগতের কালমেঘ, বৃষ্টি ধারায় আমার সহানুভূতি আছে। ভয়, ক্ষোভ, শোক, নিরাশা কেবল আমার নহে, ইহা জগতের। জগতের স্তরে স্তরে এইভাবগুলি নিহিত। যখন আমার হৃদয় তন্ত্রী এইভাবে বাজে, তখন আমি জগতের ক্রীড়নক হই। তখনই আমি সুখী দুঃখী হই। আমার পুত্রশোকে কেবল আমি কাঁদিনা, আমার গৌরবে কেবল আমি গৌরবান্বিত হই না। আমি জগতের এককণা বিশ্বরাজ্যের পরমাণুমাত্র। কিন্তু জগতের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের আলোকে উদ্ভাসিত, জগতের সুখ দুঃখাদির হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত। তাই আমি জগতের বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ, জগতের বাতাসে এত উড্ডীয়মান। আমি ঝড় বৃষ্টি অশনি পতনে মরিতে চাহি না; আমি এ সত্য জগতে অমর হইতে চাহি; আমার অস্তিত্ব থাকিয়া যায় সর্ব্বদা কামনা করি। এ কামনা আমার পক্ষে অসঙ্গত নহে; অবিমৃষ্যকারিতার ফল নহে; কেননা আমি বাহ্য জগতের এক কণা হইয়াও আভ্যন্তরিক জগতের একমাত্র বিকাশ বা সত্তা। যদি কেহ আমার মরণে সুখী হয় হোক, আমার অভাবে হানি বোধ না করে না করুক, আমার মরণে আমি মরিলাম না, জগতে আমার অভাব হইল না; কেন না আমিত্ব রহিয়া গেল; মনুষ্যত্ব রহিয়া গেল। সুতরাং জগৎ আমা ছাড়া হইতে পারিল না। আমিত্ব বীজ জগতে থাকিয়া গেল। এই বীজ সর্ব্বক্ষণে সর্ব্ব অবস্থায় অঙ্কুরিত হইবে, পুনর্ব্বার পুষ্ট কলেবর হইবে, ইহার বাধা নাই, ইহার বিনাশ নাই, কাব্য ভিত্তিতে খোদা থাকিবে; কেননা কাব্যের বীজ, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জগৎ বা মনুষ্যত্ব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত।



---

## স্মৃতি।

আজি মনে হয় যেন কবে কোন্ দিন
তোমায় আমায় দেখা প্রভাত নবীন।
গেয়েছিল পাখী গান—হেসেছিল ফুল,
প্রকৃতি পাগল পারা হরষে আকুল,
সমগ্র জগৎ ভ্রমি' বসন্ত উদার,
দিয়েছিল সখা, তার প্রেম উপহার
নিঃশব্দ নীরবে; রবি উঠেছিল মাথে
শত অনুরাগ তার এনেছিল সাথে
প্রেমাস্পদ লাগি'। ওগো সেই শুভক্ষণে
তোমারে দেখিনু যবে ক্ষণিক মিলনে,
দুঁহু দোঁহা পানে ওগো রহিনু চাহিয়া
কোকিল গাহিল উঠি' রহিয়া রহিয়া।
আজি শুধু মনে পড়ে কোথা সেই দিন
তোমার আমার প্রেম সে নিত্য-নবীন!

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার।

# এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান।

পারস্যোপসাগরকে অতি প্রাচীন কালের লোকে ইরিথ্রিয়ান নামে অভিহিত করিত। পাশ্চাত্য দেশীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে, অথবা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি যে বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার বিষয়ে উল্লেখ করিতে হইলে প্রাচীনকালে পারস্যোপসাগরে বাণিজ্যের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা বলিতে হইবে। এইস্থান পাশ্চাত্য দেশীয় ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। এখানে ইহাও জানা আবশ্যক যে ইউরোপের ভাবী উন্নতি অবনতি পারস্যোপসাগরের উপর নির্ভর করিতেছে। এই উপসাগরটী ভারতবর্ষ ও লোহিত সাগরের মধ্যে অবস্থিত, ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে পারস্যোপসাগরের পার্শ্ব দিয়া আসিতে হয়। সুতরাং অধুনা এই উপসাগরের প্রতি ইউরোপীয় সকল জাতিরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপ হইতে প্রাচ্যপ্রদেশ সমূহে প্রবেশ করিতে হইলে পারস্যোপসাগর পার হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় সহজ গম্য পথ নাই।

যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতে এই পথে ইউরোপীয়েরা যাতায়াত করিতেন তথাপি পারস্যোপসাগরের উপকূল সমূহ নিতান্ত অগম্য। কারণ নাবিকেরা বলেন যে পারস্যোপসাগরে হয় অত্যন্ত বায়ুর প্রাবল্য নতুবা বায়ুর অভাব ঘটে। দণ্ডাকৃতি বন্ধুর প্রস্তরময় উচ্চভূমি সমান্তরাল ভাবে পারস্যোপসাগরের উপকূলের দিকে গমন করিয়াছে। তাহাতে সহজে উপকূলে আশ্রয় লইতে পারা যায় না। এই উপসাগরের মধ্যে পাহাড় নিমগ্ন আছে এবং ইহার প্রবলস্রোতে অর্ণবযান সমূহ বিপদে পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই উপসাগরে প্রায়ই ঝটিকার আধিক্য পরি-



দৃষ্ট হয়। ইহার উপকূলবর্ত্তীস্থান সমূহে ইকথিওফেজী (Ichthyophagi) নামক ইতরশ্রেণীর একজাতীয় মনুষ্য বাস করে। তাহারা বড়ই নির্দ্দয়, জাহাজ জলমগ্ন হইলে যদি তাহার কোন নাবিক সৌভাগ্যক্রমে জীবন রক্ষা করিয়া তীরে উপস্থিত হয় তবে এই সকল ইতর জাতীয় মনুষ্য সেই হতভাগ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহ বড়ই উষ্ণ, ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত অসহ্য। তবে তত্রত্য অধিবাসিবর্গের পক্ষে ঐ সকল স্থানের জলবায়ু বড়ই উপাদেয়। বলা বাহুল্য ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা আজিও অসভ্যই রহিয়াছে, মৃগয়াদি ব্যাপারের উপর তাহাদিগের জীবন নির্ভর করে। কেবল মৃগয়াকালেই তাহাদিগকে বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

পারস্যোপসাগরের উপকূলে কালদিয়া নামক একটী স্থান আছে। কথিত আছে যে অর্দ্ধ মৎস্য এবং অর্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি একটী প্রাণী এইস্থানে আসিয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছে। ককেসান নামক উপকূলবর্ত্তী এক জাতীয় মনুষ্যেরা বলে যে ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র হইতে উল্লিখিত প্রাণীটী আগমন করিয়া মনুষ্যদিগকে শিল্পশিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। ঐ অদ্ভুত জীবটী ওয়েনে নামে অভিহিত হইত। এই আখ্যায়িকা শ্রবণে সহজেই অনুমান হয় যে কোন উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যেরই সমুদ্রপথে ঐ স্থানে গমন করিয়া দেশের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট জন্মিবার ৩৮০০ বৎসর পূর্ব্বে কালদিয়ার সারগণ (১ম) ভূমধ্যস্থসাগরে গমন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ স্থানের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে সারগণের পুত্র বেরিন দ্বীপপুঞ্জে সসৈন্য উপস্থিত হন। বেরিন দ্বীপপুঞ্জ ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে ঐ সকল দ্বীপে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ফিনিসিয়দিগের সর্ব্বপ্রাচীন আখ্যায়িকা, পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উভয় তীরবর্ত্তী জলভূমি সমূহে অথবা বেরিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাইলস ও আকদস নামক দুইটী দ্বীপে ফিনিসীয়েরা বাস করিত। ঐ দুইটী দ্বীপ পরে টাকর ও আবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ভীষণ ভূমিকম্পের প্রাবল্যে তাহারা ভূমধ্য সাগর পার হইয়া উল্লিখিত স্থান সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিরিয়া নগরে উপস্থিত হয়। অন্ততঃ ভিনিসীয় দিগের বিশ্বাস এইরূপ।

যাহা হউক খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দী পূর্ব্বে পারস্যোপসাগরে জলযাত্রার কথা শ্রুত হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেনাচারিব নামে এক ব্যক্তি পারস্যোপসাগর মধ্যবর্ত্তী ঐ সকল দ্বীপে উপস্থিত হন এবং ঐ সকল দ্বীপের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করেন। কথিত আছে ঐ সকল অধিবাসী পূর্ব্বে অন্য স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক উপসাগর মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এতদুপলক্ষে একটী ঘটনায় দেখা যায়, ঐ সময়ে ফিনিসীয় এবং গ্রীকেরা সমুদ্রগমনোপযোগী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত। সেনাচারিব তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন, টেলার নামক একব্যক্তি ঐ স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "বিটইয়াকিন নামক স্থানের অবশিষ্ট লোকে দেশের সমস্ত দেবমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া সূর্য্যোদয় নামক বিস্তীর্ণ সাগর পার হয় এবং এলাম নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সেনাচারিবের আখ্যায়িকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই পারস্যোপসাগরে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্য এসিয়ার ভীষণ মরুপ্রদেশের দুর্গমতা অথবা বর্ব্বর জাতিদিগের বাধা প্রদান সত্ত্বেও তদবধি এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পারস্যোপসাগরে বাণিজ্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তাহার পর, যে সময়ে ব্যাবিলন উন্নতির শীর্ষ স্থানে অধিরূঢ় হয়,



সেই সময়ে পারস্যোপসাগরের বাণিজ্য এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে ঐ স্থানের ময়ূর এবং চাউলের ব্যবসায়ের কথা সুদূর আথেন্স নগরে সফোক্রেস এবং আরিষ্টোকেন্‌সের রাজত্ব সময়ে প্রচারিত হয়।

বাবিলন নগরে অধিবাসীদিগের দ্বারা তামিলী ভাষায় পারস্যোপসাগরের ব্যবসায়ের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, পারসীকদিগের কঠোর শাসনে বাবিলনের অধঃপতন হইলে ভারতবর্ষের সহিত পারস্যোপসাগরের বাণিজ্য ব্যাপার ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়।

খৃষ্ট জন্মিবার ৩২৬ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে নিয়ার্কাসের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনি ভারতের সহিত বিনষ্ট বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদের মুখ হইতে জলযাত্রা করিয়া পারস্যের অন্তর্গত কারুন নদী পর্য্যন্ত গমন করেন। পারস্যদেশে একমাত্র কারুণ নদীই পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

পারস্যবাসীদিগের মধ্যে সমুদ্র যাত্রার প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না। ইহা তাহাদিগের জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পরে চীনদেশীয় পোত সমূহ ইউফ্রেটীস নদীতে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। Cathy and Way thither নামক পুস্তকে দেখা যায় ৯ম শতাব্দীতে পারস্যবাসীরা পারস্যোপসাগরের মধ্যে কেবল সিরাফ নামক স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। এক্ষণে উহা তাহারি নামে অভিহিত হয়। তাহার পর পারস্যবাসীরা পশ্চিমে হরমুজ পর্য্যন্ত গমন করিয়াই তাহাদিগের পশ্চিমদিকে সমুদ্রযাত্রার শেষ হয়। যাহা হউক ৫ম শতাব্দীতে চীনদেশীয় জাহাজ ইউফ্রেটিস নদীতে যাতায়াত আরম্ভ করায় পারস্যদেশ বাসীরা বাণিজ্যের উপকারিতা বুঝিতে পারে। মাসুদী নামক এক ব্যক্তি প্রথমে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইউফ্রেটীস নদীর প্রধান শাখা হীরা নামক স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হীরা বন্দরে চীনদেশ এবং ভারতবর্ষ

হইতে জাহাজ আসিত।" এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় থ্যাং জাতীয় পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে চীন দেশীয় জাহাজের (junks) প্রচলন ছিল। তাহাতে উক্ত জাহাজের বর্ণনা আছে।

নবম শতাব্দীতে আরব জাতির সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় পারসিক জাতির অসাধারণ ক্রিয়াশীলতা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আরবদিগের অভ্যুদয় কালে বালসোরা এবং বোগদাদ নগর বাণিজ্যের ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। বালসোরা নগর অধুনা বাসরা নামে পরিচিত। উল্লিখিত স্থান দুইটীর সমৃদ্ধির প্রসঙ্গে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত আখ্যায়িকার উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা "একাধিক সহস্র রজনী" বা আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বালসোরা নগর কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল। মিনটন তাঁহার "গর্জ্জিয়াস ইষ্ট" অর্থাৎ আড়ম্বর পূর্ণ প্রাচ্য প্রদেশের বর্ণনা কালে বালসোরার উল্লেখ করিয়াছেন। সিন্ধাবাদ নাবিক বালসোরা নগর হইতে সাতবার সমুদ্রযাত্রা করেন। বলা বাহুল্য সেই সময় পৃথিবীর বিষয়ে অল্পপরিমাণেই লোক জানিত। সুতরাং সিন্ধাবাদ যে সকল স্থানে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন সেই সকল দেশের সম্বন্ধে লোকের অতি অল্প জ্ঞানই ছিল। সিন্ধাবাদ নাবিকের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে অনেক অপ্রকৃত আখ্যায়িকার অবতারণা থাকিলেও অদ্যাপি মনোহর তালকুঞ্জ এবং অত্যদ্ভুত পরিখা সমূহ বালসোরা নগরী প্রাচ্য বিনস নগরী আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অতীত গৌরবের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। কোন সময়ে সিন্ধাবাদ তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত উচ্চচূড় "বাগ্‌গালা" জাহাজে সমুদ্র গমন করিয়াছিলেন, শাত-এল-আরবের মধ্যে বহুস্থানে এখনও তাহার বর্ণনা দেখা যায়।

আরবদিগের শাসনপদ্ধতির বিশৃঙ্খলাবশতঃ বালসোরার বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে তাব্রিজ দিয়া বন্দর আব্বাসে



গোশকটযোগে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। হরমুজ নামক বাণিজ্য স্থান প্রথমে নিমার নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পরে যখন ঐ স্থানটী বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িল সেই সময় জেরুন নামক দ্বীপটী প্রাচ্যপ্রদেশ সমূহের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থানে পরিণত হইল। যে পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পোতসমূহ প্রাচ্যপ্রদেশে উপস্থিত হয় নাই ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচ্যদেশে একইভাবে উক্তস্থানে বাণিজ্যব্যাপার সম্পাদিত হইত। কিন্তু এসিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যব্যাপার সংঘটিত হইবার পর হইতেই এসিয়ার বাণিজ্য স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল।

রুসিয়ার সহিত বাণিজ্যব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় এসিয়ার বাণিজ্য উন্নত এবং ইউরোপের ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টনপূর্ব্বক জলযাত্রার বিপত্তি দূরীভূত হয়। পূর্ব্বে ইউরোপীয়দিগকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বেষ্টন পূর্ব্বক ভারতসাগর দিয়া আরব সাগর আসিতে হইত, কিন্তু পারস্যোপসাগর দিয়া সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপে গমন করিতে পারা যায়, ইহা অবগত হওয়ায় ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইল। ইউরোপীয়দিগের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ায় এসিয়ার বাণিজ্য অনেক উপকার প্রাপ্ত হইলেও ইউরোপীয় বণিকেরা জলদস্যু বেশে প্রথমে দেখা দেন।

মেজর পি মোলেসওয়ার্থ সাইকস্ নামক জনৈক ভ্রমণকারী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "it is hard to feel hurt that our representatives first appeared as pirates." এই সকল বণিকবেশধারী দস্যু বড়ই নিষ্ঠুর ছিল। আলবুকার্ক পারস্যোপসাগরে নিতান্ত পাষণ্ডোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বাণিজ্যের নামে দস্যুতা করিয়া কতকগুলি মনুষ্যকে বন্দী করেন এবং "জগদীশ্বরের গৌরবের নিমিত্ত" হতভাগ্যদিগের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

একশত বৎসরেরও অধিক কাল পোর্ত্তুগিজেরা অধিকার পূর্ব্বক পারস্যোপসাগরে বাণিজ্য করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগিজেরা পারস্যোপসাগরে বাণিজ্য করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ইংরাজেরা ঐস্থানে উপস্থিত হন।

সার টমাস যে ডায়েরি বা রোজনামা লিখিয়াছিলেন সংপ্রতি তাহার প্রচার হইয়াছে। পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাহা ইংরাজদিগের বাণিজ্য ঐ সময়ে কিরূপ সংকীর্ণ ছিল। ঐ সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বৎসরে ৪।৫ খানির অধিক ইংরেজ তরীর আগমন ঘটিত না। ইংরাজদিগের জেমস্ নামক একখানি জাহাজ পারস্য দেশের সহিত বাণিজ্য, করিবার নিমিত্ত জাস্ক নামক স্থানে প্রেরিত হয়। সার টমাস রো লিখিয়াছেন, তুরস্কের সহিত যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সহিত এসিয়ার বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। তখন পারস্যের মধ্যে একেবারে বস্ত্রের অভাব এবং রেশের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হইল। তৎকালে অধিক পরিমাণে ইংরাজী পণ্য তাহাদিগের নিকট সঞ্চিত ছিল। সুতরাং কি উপায়ে সেই সমস্ত পণ্য গুদামের বাহিরে যাইতে পারে, এই নিমিত্ত সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, বিলাতী পণ্যে তাহাদের গুদাম পূর্ণ থাকায় সদ্য সদ্য ভারতবর্ষের মধ্যে তাহা বিক্রীত হইবার আশা ছিল না। কেবল পোর্ত্তুগিজদিগের জন্য ইংরাজের পারস্যোপসাগরে বাণিজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল তাহা নহে, সেই সময়ে সাহ আব্বাস ইংরাজদিগের নিকট অর্থ চাহিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পারস্যের মধ্যে অনেক স্থলেই বস্ত্র প্রস্তুত হইত; তবে তাহার সংখ্যা বড়ই অল্প। তুরস্ক প্রদেশ পারস্যের অনতিদূরে অবস্থিত। ঐ প্রদেশে রেশমের উৎপত্তি হইত, সার টমাস রো ইহা তাঁহার রোজনামায় লিখিয়াছেন।

যাহা হউক সাহ আব্বাস ইউরোপীয় বণিকদিগের প্রদত্ত উপঢৌকন



কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ঐ সময়ে ইংরাজেরা সাহ আব্বাসকে স্বর্ণ ও রৌপ্য উপহার প্রদান করিতে বাধ্য বিবেচিত হইতেন।

বিগত ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে জাস্ক নামক স্থানের নিকট দুইবার জলযুদ্ধ ঘটে। প্রথম যুদ্ধে উভয় পক্ষের জয় পরাজয় নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে পোর্ত্তুগিজেরা পরাস্ত হওয়ায় তাহার পূর্ব্ব বর্ষে ইংরাজেরা যে কারখানা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পায়। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দিগের সহিত পারস্যের প্রধান সাহের সন্ধি হওয়ায় ইংরাজেরা হরমুজ গ্রহণ করেন। তাহাতে পোর্ত্তুগিজ শক্তি যে আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহার ফলে তাহারা চিরকালের জন্য পুনরুত্থানে অসমর্থ হইয়াছে। তদবধি পারস্যোপসাগরে বৃটিশ প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইংরাজ দিগের বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জোয়াস্‌মি নামক জলদস্যুগণ—ইংরাজদিগের মিনর্ব্বা নামক একখানি যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ পূর্ব্বক দুইদিন যুদ্ধের পর অধিকার করে। এবং পোতস্থিত প্রত্যেক নাবিককে হত্যা করিয়া ফেলে। জলদস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য বহুচেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময় হইতে জলদস্যুর অত্যাচার নিবারণ জন্য *Pox Britanica* অর্থাৎ জলদস্যুদিগের সহিত ইংরাজ দিগের সন্ধি হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজের বহু অর্থ ব্যয়িত হয়।

সংপ্রতি বেহ্রিণ দ্বীপপুঞ্জের শান্তিভঙ্গ হয়। বিগত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেখ জাসিম ঐ সকল দ্বীপ আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পরন্তু ইংরাজ দিগের স্কিলা ও পিজন নামক দুইখানি রণপোত বিপক্ষদিগের ৪০ খানি জাহাজ ধ্বংস করিয়াছে এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক জাহাজ তাঁহারা বেহ্রিণে লইয়া গিয়াছেন।

অধুনা পারস্যোপসাগরে ইংরাজ দিগের জাহাজ অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বন্দর সমূহে হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে ইংরাজ দিগের যুদ্ধ জাহাজ স্থান ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই জলদস্যু দিগের পুনরাবির্ভাব হইবে। কারণ এক্ষণে পারস্যোপসাগরবর্ত্তী স্থান সমূহ বাণিজ্যের কল্যাণে অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। পারস্যোপসাগরে বহু মূল্যবান পদার্থ পরিপূর্ণ বাণিজ্য পোত সতত গমন করিয়া থাকে, সুতরাং অধিক লাভের প্রত্যাশায় দস্যুগণ সতত যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টিদান করে। দস্যুতার কথা উপস্থিত হওয়ায় সেদিন জনৈক আরববাসী স্পষ্টই বলিয়াছিল ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে দস্যুতা করিয়া জলদস্যুরা যাহা লুণ্ঠন করিত এখন লুণ্ঠন করিলে তাহার দশগুণ লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে এই পারস্যোপসাগর ব্যাপার লইয়া ইংরাজেরা অনেক কাণ্ড করিতেছেন।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

---

# সৎমা।

## ( পুত্রের কাহিনী )

৫

সেদিনের কথা জীবনের সঙ্গে চিরদিনের মত জড়িত হইয়া গেছে—সে কথা আর কেমন করিয়া ভুলিব?

হেমন্তের পূর্ণচন্দ্র আপনার ম্লান রশ্মি বিস্তার করিতে ছিল—হিমবায়ু ধীরে ধীরে হৃদয়স্পর্শ করিয়া খোলা মাঠে প্রেতের ন্যায় নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। প্রকৃতি নীরব, কোলাহল মাত্র বর্জ্জিত—আকাশে অসংখ্য তারকা ম্লান মুখে ধরণীর দিকে চাহিতেছিল।



আমি জননীর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার রোগম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ছিলাম।

ধীরে আকাশে ঘনকৃষ্ণ জলসঞ্চার হইল। ক্ষুদ্র জলদ ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিল। বিশাল বিমান ঘনান্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

আমার হৃদয়াকাশও সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইল।

স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া আমার অবনত মস্তক স্নেহহস্তস্পর্শে পবিত্র করিয়া পুণ্যময়ী জননী স্বর্গারোহণ করিলেন।

চারিদিকের দৃশ্য হইতে কোমল বর্ণরঞ্জিত আবরণখানি যেন সহসা খসিয়া পড়িল। সমস্ত সংসার যেন ভীষণ দানবের বীভৎস মূর্ত্তি ও বিভীষণ অট্টহাস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই দিন হইতে আমার হৃদয়ের উৎসাহ, প্রাণের সজীবতা কোথায় চলিয়া গেল। একটা কিরণ বিষাদ সঙ্গীত হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিয়া আমার শ্রবণদেশে সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমার চিরপ্রিয় আমোদ প্রমোদ—মৎস্যশিকার, বৃক্ষে বৃক্ষে ভ্রমণ, পক্ষীসংগ্রহ কিছুই আর আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না, সর্ব্বত্র একটা অভাব, একটা আকাঙ্ক্ষা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ঘিরিয়া বিরাজ করিতে লাগিল।

পিতাও এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধের তাম্রকুট তাঁহারি সমক্ষে খসিয়া খসিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিত। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং কখনো আত্মসংবরণ করিয়া সহসা একবার টানিয়া আবার বিমনা হইতেন। ভট্টাচার্য্যের চণ্ডীমণ্ডপ তাঁহার কলহাস্যধ্বনি হইতে সেইদিন পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইয়াছিল—অক্ষক্রীড়ার প্রবল আকর্ষণ এবং বন্ধুবর্গের প্রীতি কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

পিতাঠাকুর মহাশয়ের চিত্তস্রোত এখন সর্ব্বত্র আমার জননীর অনু-

সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল—যাহা যাহা জননী আমার ভালবাসিতেন তাহাই তাঁহার নিকট বহুমূল্য মনে হইতেছিল।

মাতার স্বহস্ত রোপিত অলাবুলতিকা তখনো বংশমঞ্চ আবৃত করিয়া আপনার হরিৎশোভা বিস্তার করিতেছিল—তাঁহার স্বহস্ত সজ্জিত পুষ্পের কেয়ারি তখনো আপনার অম্লান সৌন্দর্য্যে গৃহপ্রাঙ্গণ শোভিত করিতেছিল। পিতা স্বহস্তে এই সকল বৃক্ষের সেবা করিতেন এবং কখনো তাহাদের একটী পত্রও কাহাকে স্পর্শ করিতে দিতেন না। মঙ্গলা গাভী মাতার পরিবর্ত্তে এক্ষণে পিতার পরিচর্য্যা সমভাবে প্রাপ্ত হইতেছিল—তবু যেন সে বড় বড় চক্ষু দুটী মেলিয়া কাহাকে অন্বেষণ করিত—আহার করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া কাহার পদশব্দের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

ভুলো কুকুরটার আহারের বরাদ্দ অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; তবু সেই স্নেহহস্তের একমুষ্টি অন্নের জন্য চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কাতরভাবে সে একপার্শ্বে শুইয়া পড়িত—তাহার অর্দ্ধভুক্ত অন্ন কাকে আহার করিত; সে সেদিকে দৃক্‌পাতও করিত না।

ঠাকুর ঘরের সংস্কার কার্য্য পিতা স্বয়ং বহুযত্নে সম্পন্ন করিতেন—তবু তাহার লক্ষ্মীশ্রী যেন চলিয়া গিয়াছিল—ঘরের প্রাচীর গাত্রে জননীর বহুযত্ন রচিত সূক্ষ্ম আলেপনা পিতার নিষ্ফল পরিশ্রম লক্ষ্য করিয়া যেন সূক্ষ্ম দন্তশ্রেণী বিকাশ করিয়া আমার জননীরই মত মধুর হাসি হাসিয়া উঠিত। জননীর হস্তস্থিত হরিনামের মালা পিতার শিরোদেশে স্থান লাভ করিয়াছিল তবু বুঝি তাহার পূর্ব্ব শোভা ফিরিয়া আসে নাই। পিতা আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক আদর যত্ন করিতেন কিন্তু আমরা কেহ কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতাম না। বলিতে গেলে উভয়েরি চক্ষে জল আসিত।

ক্রমশ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩১১। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

## বিশ্বামিত্র আখ্যায়িকা।

রামায়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত মহর্ষিবিশ্বামিত্রের জীবনবৃত্তান্ত হইতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। সেজন্য সকলের স্মরণার্থে সেই অমিততেজাঃ মহর্ষির আখ্যায়িকা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

সকলেই জানেন বিশ্বামিত্র একজন প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া একদিন অগ্নিতুল্য তেজস্বী, তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মকল্প মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় আশ্রমে সদলবলে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র অনেক পীড়াপীড়ির পর সম্মত হইলেন। কিন্তু এত লোকের খোরাক জোগান ত সহজ ব্যাপার নয়? মহর্ষি বশিষ্ঠের সে জন্য কোন চিন্তার কারণ ছিল না। তাঁহার শবলানাম্নী কামধেনুকে ডাকিয়া বলিলেন—"শবলে! আমি রাজা বিশ্বামিত্রকে সসৈন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি ইঁহাদের প্রত্যেকের অভি-

রুচি অনুসারে চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াদি দ্বারা সৎকার কর।" আজ্ঞা পাওয়া মাত্র শবলা তাহার ব্যবস্থা করিল। বিশ্বামিত্র এইরূপে সসৈন্যে পরিতর্পিত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি ক্ষত্রিয় রাজা। এই গাভিটীর অদ্ভুত গুণপনা দেখিয়া তাহার প্রতি বিশ্বামিত্রের অত্যন্ত লোভ জন্মিল। তিনি বশিষ্ঠকে বলিলেন "হে ঋষিবর! আপনাকে আমি সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু একটী কথা। আপনি আমার নিকট হইতে একলক্ষ গাভী গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনিময়ে শবলাকে অর্পণ করুন। আর দেখুন, আমি রাজা, এই গাভীটী একটী রত্নবিশেষ। পৃথিবীতে যাবতীয় ধনরত্নের একমাত্র রাজাই অধিকারী।" অর্থাৎ আমি যদি জোর করিয়া এই গোরুটী তোমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লই, তবে তুমি কি করিতে পার? মহর্ষি বশিষ্ঠ কিন্তু এই রাজকীয় যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "এই যে গাভীটী দেখিতেছেন, ইহা আমার অত্যন্ত প্রিয় এমন কি আমার যথাসর্ব্বস্ব। আমাকে কোটী কোটী সুবর্ণমুদ্রা দিলেও আমি ইহাকে ছাড়িতে পারিব না।" কিন্তু বিশ্বামিত্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন "আমি আপনাকে সুবর্ণালঙ্কারভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী, একসহস্রদশটী ঘোড়া, এবং এককোটী গোরু, এতদ্ভিন্ন আপনি সোণারূপা যত চাহেন তত দিতে প্রস্তুত আছি, আমাকে শবলা প্রদান প্রুন।" রাজার এই হাজারহাজার, লক্ষলক্ষ, কোটীকোটী দানের প্রস্তাবে একটুও আটকাইল না, কারণ তিনি একজন ভয়ানক diplomatist (কৌশলী), তিনি জানেন একবার শবলাকে হস্তগত করিতে পারিলে হুকুম করিলেই ত যাহা ইচ্ছা তাহাই তৎক্ষণাৎ সে দিতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় কোটীকোটী দানের অঙ্গীকার কে না করিতে পারে?

যাহাহউক, মহর্ষি বশিষ্ঠ কিন্তু এ প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না।



শবলাও রাজার সঙ্গে যাইতে একেবারে অনিচ্ছুক। সে মুনির পদতলে পতিত হইয়া দুই চোখের জল ছাড়িয়া দিল। বিশ্বামিত্র গোরু না পাইয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং প্রবল বলদর্পে দৃপ্ত হইয়া যুদ্ধং দেহি বলিয়া বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। বশিষ্ঠের আদেশে শবলা যোগবলে অনেকানেক কাম্বোজ বর্ব্বর যবন শক হারীত কীরাতাদি ম্লেচ্ছসৈন্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ গজবাজিরথের সহিত বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল। তখন বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তিনি হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে পরাস্ত হইয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি একটী পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ হিমালয়ে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পশুপতি তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথাভিলষিত ধনুর্ব্বেদ অর্পণ করিলেন। বলাবলিপ্ত বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে আবার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে কোন রকমে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বশিষ্ঠ স্বীয় ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবে সেই ব্রহ্মাস্ত্রও হ্রাস করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে পুনঃপুনঃ পরাস্ত ও অপদস্থ হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানিমে॥
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মান সঃ।
তপোমহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্ব কারণম্॥"

আমার ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্! ব্রহ্মতেজই প্রকৃত বল। এক ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা আমার সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হইল! আমি ইহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা

করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ একমাত্র তপঃই ব্রহ্মত্বের কারণ।

ইহাই বিশ্বামিত্র-জীবনের এক মহাসন্ধিমুহূর্ত্ত। এখন হইতে তাঁহার এক নবজীবনের সূত্রপাত হইল। তিনি এই বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া দক্ষিণদেশে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে এক সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন "হে কৌশিক! তোমার এই তপস্যার ফলে আমি তোমাকে "রাজর্ষি" বলিয়া গণ্য করিলাম।" বিশ্বামিত্র একথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। "কি? এত তপস্যার পরেও আমি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলাম না? আমি এখনও রাজর্ষি? আচ্ছা আবার দেখা যা'ক।" ইহা বলিয়া তিনি আবার ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড বাধিল। আজকাল সজীব তেজোবল-দৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতির নানাবিষয়ে খেয়াল যাইতেছে। কেহ পদব্রজে সমস্ত পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ বা বাইসিকেলে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ বা পকেটে একটী মাত্র কাণাকড়িও সম্বল না লইয়া সমগ্র পৃথিবী বেড়াইয়া আসিতেছেন। কেহ বা শুদ্ধ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া হিমানীমণ্ডিত গিরিশিখর উত্তীর্ণ হইতেছেন। এখন পাশ্চাত্য জাতি নবযৌবনবলে বলীয়ান্, তাঁহারা কোন বিপদ্‌কেই বিপদ বলিয়া গণ্য করেন না, তাই নিত্য নূতন খেয়াল আসিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চাপে। হিন্দুজাতিরও এইরূপ একদিন গিয়াছে। যখন হিন্দুজাতির হৃদয়ে জীবনীশক্তি খর-বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন কখন কখন এক একজনের কোন বিষয়ে খেয়াল উপস্থিত হইত। এইরূপে ত্রিশঙ্কু নামক একটী রাজার এক অদ্ভুত রকমের খেয়াল উপস্থিত হইল—তিনি সশরীরে স্বর্গ-গমন করিবেন! বেলুন যন্ত্রটা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে তাঁহার এই সখ সহজেই



মিটিতে পারিত, কিন্তু সেরূপ কোন সহজ উপায় না দেখিয়া তিনি বশিষ্ঠ ঋষির নিকটে গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ঋষি তাঁহাকে নিতান্ত বাতুল মনে করিয়া হাঁকাইয়া দিলেন। তখন তিনি বশিষ্ঠের পুত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারাও কিন্তু ত্রিশঙ্কুর বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক প্রশংসা করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু, ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগকে শক্ত শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দিলে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন "তুই বেটা চণ্ডাল হ।" তাঁহাদের অভিশাপের ফলে যথার্থই ত্রিশঙ্কু এক রাত্রির মধ্যেই চণ্ডাল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন ক্রোধ ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন; তিনি ত্রিশঙ্কুকে অভয় প্রদান করিয়া, তাঁহার মনস্কামনাসিদ্ধির জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং যাবতীয় মুনিঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার আহ্বানে অনেক ঋষিই সেই যজ্ঞে আসিলেন, কেবল আসিলেন না বশিষ্ঠ, তাঁহার পুত্রগণ এবং মহোদয়নামা ঋষি। বশিষ্ঠপুত্রগণ বলিয়া পাঠাইলেন "যে রাজা স্বয়ং চণ্ডাল, যাহার যাজক ক্ষত্রিয়, আমরা তাহার যজ্ঞে যাইব? কখনই না।"

বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কঠোর শাপে অভিশপ্ত করিলেন। তখন অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু দেবগণ সে যজ্ঞে আসিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন, "দেখ! আমার তপস্যার প্রভাব দেখ! আমি চাই না কোন দেবতাকে, আমি নিজেই আমার তপঃপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতেছি।" বিশ্বামিত্রের সেই সহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যার ফল বৃথা যায় নাই। বাস্তবিকই তাঁহার তপো-বলে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। কিন্তু দেবতারা ত পূর্ব্বেই চটিয়া আছেন। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে trespasser (অনধিকার প্রবেশকারী) বলিয়া স্বর্গ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ত্রিশঙ্কু হেটমুণ্ডে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার না এদিক না ওদিক। যাহাহউক বিশ্বামিত্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "বটে? দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান দিলেন না? আমি দেখিব তাঁহারা কোথাকার কেমন দেবতা। আমি নিজেই এক দেবলোক সৃষ্টি করিব।" ইহা বলিয়া তিনি তপঃপ্রভাবে একটা নূতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং অপর নক্ষত্র মালা দৃষ্ট হইল। পরে যখন দেবসৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তখন স্বর্গস্থ দেববৃন্দের মধ্যে কান্নাহাটী পড়িয়া গেল। মর্ত্ত্যলোকের যজ্ঞে তাঁহাদের চিরকালের হবিণভক্ষণের সাধটা যে একেবারেই রহিত হইয়া যায়। পরিশেষে সুরাসুরগণ মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের মধ্যে একটা মিটমাট হইল। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে চিরকালের জন্য সশরীরে স্বর্গসুখভোগ করিবার অনুমতি প্রকাশ করিলেন। আর চিরকালের জন্য, বিশ্বামিত্রসৃষ্ট-নক্ষত্রমালা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে এরূপ রফা হইল।

এই সব গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিঘ্ন হইল। তিনি দক্ষিণদেশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে, পুষ্করতীরবর্ত্তী এক বিশাল তপোবনে আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেখানেও আর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ রাজা এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার চিরদিনের অসংশোধনীয় স্বভাববশতঃ সেই যজ্ঞের পশু চুরি করিলেন। রাজার পুরোহিত সেই অপহৃত পশুর পরিবর্ত্তে একটী নরশিশু আনিয়া বলি দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা তখন অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে ঋচীক নামক এক মুনিনামধারী নরপশুর শুনঃশেফ নামক মধ্যম পুত্রকে অনেকগুলি টাকা কড়ি ও গোরু দিয়া ক্রয় করিলেন। সে শিশুটী বড়ই বুদ্ধিমান ও ধীরপ্রকৃতি



ছিল। সে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের দর্শন পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। বিশ্বামিত্র তখন তাঁহার নিজ পুত্রদিগকে সেই রাজযজ্ঞে বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ রামাবতারের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও, তাহাদের বুদ্ধিটা এই বিংশ শতাব্দীর পুত্রগণের বুদ্ধির ন্যায় অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাহারা বিশ্বামিত্রকে নিতান্ত old fool জ্ঞান করিয়া তাঁহার আদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু সেই মহাতেজস্বী মহাপ্রাণ ঋষি তাঁহাদিগকে ক্ষমা না করিয়া কঠোর-শাপে অভিশপ্ত করিলেন। এবং সেই শিশুটীকে তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশে সেই বালকটী অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে স্তব করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিল। বিশ্বামিত্র সেই পুষ্করতীরে এক সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি এখন 'ঋষি' হইয়াছ।"

বিশ্বামিত্র ঋষি হইয়াও সন্তুষ্ট নহেন—তিনি হইতে চান ব্রহ্মর্ষি—ব্রাহ্মণ। তিনি আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে স্বর্গাপ্সরা মেনকা আসিয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিল। তিনি কামমোহের অধীন হইয়া দশ বৎসর তাহার সঙ্গে যাপন করিলেন। কিন্তু পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে গমনপূর্ব্বক কৌশিকীতীরে মহাকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন "বিশ্বামিত্র! তুমি এতদিনে মহর্ষি হইলে।"

বিশ্বামিত্র ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি তখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বন, বায়ুভক্ষণ, গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ, শিশিরে সলিলশায়ী, বর্ষায় অনাচ্ছাদিতমস্তক হইয়া সহস্রবর্ষব্যাপী ঘোরতর তপস্যা করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া, তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভাকে

প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবার বিশ্বামিত্রকে আঁটিতে পারে কাহার সাধ্য? তিনি ক্রোধভরে রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। কিন্তু সে কাজটাও ভাল হইল না। এইরূপে ক্রোধপরবশ হওয়াতে তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পুনঃপুনঃ কঠোর তপস্যার ফলে ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রশমিত হইল। একদিন তিনি একটী সহস্রবর্ষানুষ্ঠিত অনশনব্রত পূর্ণ করিয়া অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে সেই অন্নভিক্ষা করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন তাঁহাকে দান করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তিনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সহস্রবর্ষ তপস্যা করিলেন। তখন তাঁহার মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। সেই অগ্নির তেজে ত্রিভুবন সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। দেব-ঋষি-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাদি সুরাসুরগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও তেজোহীন হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক্ তমোব্যাপ্ত হইল। স্বয়ং ভাস্কর নিষ্প্রভ হইলেন। সাগর সকল ক্ষুভিত হইল, পর্ব্বতমালা বিশীর্ণ হইল, সমস্ত পৃথিবী মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল: সৃষ্টিনাশ হওয়ার উপক্রম দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বিশ্বামিত্রকে অভীষ্টবর প্রদান করিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—

"ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসাস্যসুতোষিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক॥"

হে ব্রহ্মর্ষে! আপনাকে সাদরসম্ভাষণ করিতেছি। আপনার তপস্যাতে আমরা সকলে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে কৌশিক! আপনি উগ্রতপস্যাবলে আজ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

বিশ্বামিত্র এইরূপে বহুযুগব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কি বৈর-



নির্য্যাতনের জন্য? তাহা নহে। তিনি বশিষ্ঠের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। এখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় নহেন—এখন তিনি ব্রাহ্মণ।

কোন কোন সমালোচকের মতে রামায়ণের বালকাণ্ডটী মহর্ষি বাল্মিকী বিরচিত নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত। তাহার একটী প্রমাণ, এই বিশ্বামিত্র-উপাখ্যানে অতিমাত্রায় ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহা কোন স্বার্থলুব্ধ ব্রাহ্মণের কারসাজি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিন্তু আমি অন্যরূপ বুঝি। এই বালকাণ্ডটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার অন্য কারণ থাকিলে, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই যে, বালকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। আমার মতে বরং ব্রাহ্মণ পদবীটা লাভ করা যে নিতান্ত সুখসাধ্য নহে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে কত কঠোর তপস্যার আবশ্যক, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার standard of culture (উচ্চানুশীলনের সীমা) কত উচ্চ ছিল, ইহাই এই উপাখ্যানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণের স্থান কেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল? ব্রাহ্মণের পাশবশক্তিবলে নহে, ব্রাহ্মণের রাজনৈতিকশক্তিবলে নহে, ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাপ্রসূত আইনকানুনবলে নহে। সে কেবল ব্রাহ্মণের উচ্চতম অনুশীলনবলে, উচ্চধর্ম্মচর্য্যাবলে, আজীবনব্যাপী কঠোর তপস্যাবলে। সেই অনুশীলন, সেই ধর্ম্মচর্য্যা, সেই কঠোর তপস্যারূপ অগ্নিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, একজন কামক্রোধলোভাদি রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয়নরপতি জলন্ত উৎসাহ, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা, অদম্য অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া কিপ্রকারে শমদমাদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই এই আখ্যায়িকায় আমরা বিশেষরূপে দেখিতেছি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

# ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার।

আমাদের স্বদেশীয় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ সকলেই এক-বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের দারুণ অধঃপতন ঘটিয়াছে—এবং আশু প্রতীকার না হইলে আমাদের উন্নত মস্তক ক্রমশ ধুল্যবলুণ্ঠিত হইবে তাহাতেও সংশয়ের অবকাশমাত্র নাই।

কিন্তু যে ব্যাধিবশতঃ আমাদের এই অবনতি ঘটিয়াছে, সেই ব্যাধি-নির্ণয়সম্বন্ধে বড় বড় সামাজিক চিকিৎসকগণের যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে এবং ইহার প্রতীকারবিষয়েও "না সৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং।"

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "স্বদেশী সমাজ" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে নির্ণয় করিয়াছেন যে, আমাদের চিত্তস্রোত সমাজের মধ্যে না থাকাতেই এই বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পশ্চিমের স্বর্ণোজ্জ্বল আভা দেখিয়া তাহারই দিকে ছুটিয়াছি, কাজেই আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে মাটির প্রদীপটী পর্য্যন্ত জ্বলিতে ভুলিয়া যাওয়া আদৌ বিচিত্র নহে।

বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং তিনি রবিবাবুর এইরূপ লাক্ষণিক চিকিৎসার প্রতি-বাদ করিয়া বলিতেছেন যে, রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা করা উচিত, তাহার লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা অযৌক্তিক। অতএব মূলানুসন্ধান করিয়া পৃথ্বীশবাবু নির্ণয় করিয়াছেন যে, এই দেশব্যাপী অবনতির মূলরহস্য—নৈতিক অবনতি।

সুতরাং এই দুই চিকিৎসকের দুই বিভিন্ন নিদান—চিত্তস্রোত সমা-জের মধ্যে না থাকায় আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, অথবা নৈতিক অবনতি বশতঃই চিত্তস্রোত বহির্মুখী হইয়াছে—একটা "কাক-



তালীয়" হইয়া রহিল। নৈয়ায়িকগণ ইহার মীমাংসা করিতে পারেন।

কিন্তু সেজন্য আমাদের বিশেষ উদ্বেগ নাই। আমরা রোগী; ঔষধেই আমাদের প্রয়োজন, চিকিৎসকের মতামতে নহে। সুতরাং এই উভয় চিকিৎসকের ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে বিক্ষিপ্তচিত্তস্রোতকে সমাজপথে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া তাহারই দ্বারা পূর্ব্বের মত সামাজিক বর্গের বিদ্যাদান, জলদান, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া লইতে হইবে। দিন দিন আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া আপনাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হারাইতেছি—সেই ক্ষমতা ফিরিয়া না পাইলে আমাদের মনুষ্যত্বলাভের আশা নাই।

পৃথ্বীশবাবু এই স্বাবলম্বন চেষ্টার মধ্যে বিদ্রোহসঙ্গীতের আভাস পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং নানাপ্রকারে রবীন্দ্রবাবুর যুক্তি ও কল্পনাকে তিরস্কার করিয়া অবিরত সরকারের নিকট আবেদন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সরকার আমাদের নিকট হইতে বৎসরে যে ৮০ কোটী টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার অনুরূপ কার্য্য সরকারের নিকট হইতে আদায় না করিয়া তিনি কিছুতেই সরকারকে নিষ্কৃতি দিতে স্বীকৃত নহেন। পৃথ্বীশবাবু বলেন যে, অন্যান্য সকল দেশেই যখন আন্দো-লন করিতে করিতে রাজা বিরক্ত হইয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তখন এদেশেই বা তাহা না হইবে কেন? কংগ্রেসমণ্ডপ হইতে প্রতি বৎসর রাজার সিংহদ্বারে যে কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে, সেই কোলাহল যথেষ্ট উচ্চ না হওয়ায় সকল সময়ে রাজাকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু যে দিন ৩০ কোটী মানবসন্তান অবিরত গভীর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিবে, সে দিন রাজা শ্রবণযুগের শক্তি রক্ষা করিয়া কদাচই উত্যক্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

কিন্তু একটা কথা বোধ হয় পৃথ্বীশবাবুর হিসাবের মধ্যে স্থান পায় নাই। পৃথ্বীশবাবু যে যে স্থলের সরকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

সেই সেই স্থানের সরকার ও প্রজাবর্গের স্বার্থ অভিন্ন—প্রজার স্বার্থসিদ্ধিতে সরকারেরও স্বার্থসিদ্ধি, কিন্তু এদেশে তাহা নহে।

পৃথ্বীশবাবু রাজনীতির বড় বড় কথা উদ্ধার করিয়া হয়ত দেখাইয়া দিতে পারেন যে, আমাদের দেশেও রাজাপ্রজার স্বার্থ বিভিন্ন হইতে পারে না।

কংগ্রেসের মঞ্চ হইতেও সময়ে সময়ে এইরূপ আত্মপ্রতারণার স্বর শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল।

মনে করুন আমরা আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের অবস্থা উন্নত করিয়া মাঞ্চেষ্টারের অন্ন মারিতে যাই—ইহা আমাদের স্বার্থ। কিন্তু রাজার ইহাতে অনর্থ। পৃথ্বীশবাবু কি মনে করেন যে, করুণ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিলেও রাজা আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?

সুতরাং রাজদ্বারে আবেদন করিলেই আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে এ ধারণা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু পৃথ্বীশবাবু সৌভাগ্যবশতঃ শুধু আবেদনকেই জাতীয় উন্নতির চরম কৌশল বলিয়া স্বীকার করেন নাই—নৈতিক উন্নতির আবশ্যকতাও অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই নৈতিক উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে, সে জন্য মস্তিষ্কচালনা করা, আদৌ কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। সম্ভবতঃ আমাদের প্রদত্ত ৮০ কোটী টাকার পরিবর্ত্তে ইহাও তিনি আবেদনবলে সরকারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। রবিবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধপাঠে পৃথ্বীশবাবু নিতান্ত হতাশ হইয়া থাকিলেও তথাপি তাহাতে দুই একটা কাজের কথা আছে। কিন্তু পৃথ্বীশবাবুর গুরুতর চিন্তাশীল প্রবন্ধ কাজের উপক্রমেই পরিশ্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। পৃথ্বীশবাবু



আমাদের রাজদ্বারে আবেদনের বেগবৃদ্ধি ও নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য কটিদেশ বন্ধন করিতে উপদেশ দিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন!

এ স্থলে অন্য কিছুর না হউক, মানব চরিত্রজ্ঞতার জন্য পৃথ্বীশবাবুর সুখ্যাতি করিতে হয়। পৃথ্বীশবাবু বিলক্ষণ জানেন বাঙালীর যেটুকু উৎসাহ থাকিতে পারে সেটুকু কটিবন্ধনের পরিশ্রমেই অপব্যয়িত হইয়া যায়; তাহার পরে আর অগ্রসর হইবার শক্তি তাহার থাকে না। আমরা যেখানেই মারামারির জন্য কটিবন্ধন করি, সেখানেই আসল মারামারি আর ঘটিয়া উঠে না। কাজেই পৃথ্বীশবাবু আর অধিকদূর অগ্রসর হইয়া বাঙালীর কুলপ্রথার উচ্ছেদসাধনে উদ্যত হইতে সাহস করেন নাই।

আসল কথা এই যে, কল্পনায় ও বাক্যে যতটুকু কাজ হইতে পারে তাহার অধিকদূর অগ্রসর হইতে আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। রাজা আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলনিকাশ, গোচর, রাস্তাঘাট, ড্রেনপায়খানা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া আমাদের নিশ্চিন্তভাবে আলস্যের সুখশয্যায় শয়ান থাকিবার অবকাশ দিয়াছেন। এ স্থলে এই সুকোমল সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া গ্রামেগ্রামে মাঠেমাঠে মেলা করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, মলিনজীর্ণকন্থাপরিবেষ্টিত, ইংরাজীশিক্ষাবর্জ্জিত চাষাভুষো ও মিস্ত্রীমজুরের সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে কোন্ ভদ্রসন্তানের প্রবৃত্তি হইতে পারে? অতএব শোভনবেশে সভামণ্ডলে আসিয়া সময়ে সময়ে চীৎকার করে ও বাড়ীতে আসিয়া সুখ নিদ্রায় নিমগ্ন হয়।

জাতীয় উন্নতি এত সহজে সম্পন্ন হয় না। নৈতিক উন্নতির জন্যও যথেষ্ট শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন।

পৃথ্বীশবাবু সে বিষয়ে আদৌ আলোচনা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবু আপনার বক্তব্য অনেকটা সাধারণের হৃদয়গত হইবার সুযোগ করিয়া

দিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে ও উপদেশে একটা সামঞ্জস্য আছে। তিনি বলেন আমাদের নিজের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি রহিয়াছে। আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় আমাদের শক্তিবিকাশের সুবিধা হইতেছে না। কতকটা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ইংরাজ আমাদের অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া আপনার রাজদ্বার হইতে আমাদের ফিরাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার আমরা নিজের ক্ষমতা বিকশিত করিয়া তুলিবার অবসর পাইতে পারি।

সুতরাং যে চিত্তস্রোত বহুদিন পরে আবার সমাজ অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে আর বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া তাহাকে সামাজিক উন্নতি-কার্য্যে প্রযুক্ত করা আবশ্যক। শিক্ষার দোষেই আমাদের এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল—মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিলাম বলিয়াই পশ্চিমের অকিঞ্চিৎকর বাহ্যচাকচিক্য আমাদের মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য সুশিক্ষার প্রচলন হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীনকালে আমাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে সেই শিক্ষাই অতিশয় উপযোগী। সুতরাং বালকগণের জন্য সেই শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক।

সুতরাং রবীন্দ্রবাবু প্রচুর ত্যাগস্বীকার করিয়া বোলপুরে "ব্রহ্ম-বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়াছেন।

এরূপ স্থলে রবিবাবুকে একজন নিষ্কর্ম্মা সমালোচকের মধ্যে স্থান দেওয়া পৃথ্বীশ বাবুর পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। পৃথ্বীশবাবু অনুযোগ করিয়াছেন যে, যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যে অঙ্গহীনতা দেখিতেছেন, তাঁহারাই কোন্ অঙ্গহীনতা নিবারণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন? পৃথ্বীশবাবুর এই অনুযোগ অত্যন্ত কৌতুককর বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রবাবুর যদি আবেদনপত্রের ফলবত্তার প্রতি



আদৌ বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তিনি কেন যে কংগ্রেসের অঙ্গ-হীনতা-সংশোধন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি যে প্রণালীকে যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্যও করিয়া আসিতেছেন। এরূপ স্থলে তিনিও ত পৃথ্বীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পৃথ্বীশবাবু কেন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইতেছেন না? মুখস্থবিদ্যায় বাঙালীর সমকক্ষ কেহ নাই। সুতরাং আমাদের দেশে এক্ষণে আর বাক্‌লের "সভ্যতার ইতিহাস" বা হার্বার্ট স্পেন্সারের "সমাজবিজ্ঞানে"র আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কার্য্যতঃ কিরূপে আমরা আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে পারি তাহাই আমাদের আলোচ্য। এ বিষয়ে আমরা দেশের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করি। রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পৃথ্বীশবাবু আমাদের কার্য্যতঃ কিছুই দিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রবাবুর মন্তব্যের নিষ্ফল সমালোচনা করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# প্রবাসে।

এ স্মৃতি মুকুরে যাহা পরে আজি
বিস্মৃত হয়ে দেখি,
কায়ার অধিক ছায়া সুন্দর
বুঝিতে পারিনে এ কি?

ধরণীর কোণে চির পরিচিত
ছোট সে গ্রামের মাঝে,
সহচর সনে ফিরিতাম যবে
কাজ হীন শত কাজে,
কাননে পাপিয়া কতই গাহিত,
কুহরিত পিক যত,
কুসুম বালিকা নিতুই হাসিত,
ডাকিত আমারে কত,
দুয়ারের কাছে শুনায়ে শুনায়ে
গাহিত তটিনী গান,
দেখিয়াও হায় দেখিত না তারে
আমার অলস প্রাণ,
অমিয় মাখান যে বদন খানি
ভাসিত ঘোমটা আড়ে,
আপনার বলি, আজ কাল করি
দেখা হয় নাই তারে
দেখিতে গিয়াও হারাতাম তারে
হাসি কৌতুক মাঝে,
আজি সেই গ্রাম সেই মুখ খানি
এ হৃদি মাঝারে রাজে।
সেই গৃহ মোর আরো সুন্দর
আরো গো-বিমল ফুল,
তটিনী গাহে যে আরো মধুগান
নহে শুধু কুলুকুল।



সেই মুখখানি আরো যে মধুর
নবীন মাধুরী মাখা;
আঁখি দুটী তার কবি হৃদয়ের
মোহিনী তুলিতে আঁকা।
সুদূর গ্রামের প্রতিছায়া খানি
সুন্দর গ্রাম হতে,
তাহাতে ছিল এ সকলিতো তবু
কি যেন ছিল না তাতে।
এ দূর প্রবাসে একা বসে ভাবি
বিস্মৃত হয়ে দেখি,
কায়ার অধিক ছায়া সুন্দর
বুঝিতে পারিনে একি?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

# সৎমা।

৬

আমি আমার মাতুলালয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করিতাম। সুতরাং কিছুদিন পরে শোকসন্তপ্ত পিতাকে রাখিয়া অগত্যা আমায় মাতুলালয়ে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

পিতা এই শোকব্যথা বিস্মৃত হইবার জন্য ভক্তিভরে ভগবানের চরণ-তল আশ্রয় করিয়াছিলেন দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার জন্য আমার বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না।

ছয় মাস পরে গ্রীষ্মের ছুটীতে আবার বাটী ফিরিয়া আসিলাম। হায়, বাড়ী ফিরিবার সে আনন্দ, সে উচ্ছ্বাস আর কোথায়? আমি

বাটী ফিরিবার একমাস পূর্ব্ব হইতে যে মাতৃবক্ষে স্নেহভার উথলিয়া উঠিত। আমাকে গৃহমধ্যে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য যে মঙ্গলমূর্ত্তি দ্বারদেশে স্নিগ্ধ হাস্য ও গভীর স্নেহ লইয়া দণ্ডায়মান থাকিত—আমার অবকাশ কাল সুখে অতিবাহিত করাইবার আশঙ্কায় যে অক্লান্ত করকমল আমার প্রিয় খাদ্য সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত—হায় সে আজ কোথায় ?

যত গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম বক্ষে বিষাদের পাষাণভার ততই চাপিয়া বসিতেছিল।

গৃহে প্রবেশ করিলে পিতা সহাস্যমুখে আমায় অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

এই কয়মাসে পিতার এত গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

মাতার স্নেহহস্তরোপিত ফুলগাছগুলি মাকড়সার জালে ও কাঁটার অত্যাচারে মৃতপ্রায়—ভুলো গৃহতাড়িত—মঙ্গলা অস্থিসার। ঠাকুর-ঘরের পিঁড়ায় ঘাস গজাইয়াছে—অভ্যন্তরে চর্ম্মচটিকা বিহার করিতেছে—মার হরিনামের মালা আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে পড়িয়া আছে। দেখিয়া চক্ষে জল আসিল।

পিতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিতেন দেখিয়া গিয়াছিলাম—আজকাল বামন দিদি আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় এবং পিতা রোহিতের মুণ্ড ও পলাণ্ডুর ব্যঞ্জন অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করেন !

আজকাল আমাদেরই বাহিরের ঘরে তাস পাশা ও দাবার আড্ডা বসিয়াছে এবং সুরভি তাম্রকূট ধূমের সহিত সরস রহস্যের উৎস মুহুর্মুহু উচ্চস্বরে উৎসারিত হইতেছে।

তখনো জননীর পুণ্যস্মৃতি সেই শ্রীভ্রষ্ট গৃহ প্রাঙ্গণ ঘেরিয়াছিল, তাহাকে বিতাড়িত করিবার এই নিষ্ঠুর আয়োজন আমার ভাল লাগিল



না। আমার দূর সম্পর্কীয়া এক পিসিমা আমাদের গ্রামে বাস করিতেন ; আমি সজলনেত্রে তাঁহারি গৃহে আশ্রয় লইলাম।

একদিন প্রাতঃকালে পিসিমার ঘর হইতে বাহির হইয়া আপনাদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলাম ; পথে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কবিরাজ মহাশয় আমাকে তাঁহার নিজবাটীতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বহুক্ষণ একথা ওকথার পর বলিলেন "বাপু তোমার বাপের অবস্থা ত দেখিতেছ, লোকটা একেবারে পাগল হইয়া যাইবার যো হইয়াছিল, আমরা পাঁচজনে তবু কোন রকমে ভুলাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এমন করিয়া কত দিন চলিবে। একটা বিবাহ না করিলে লোকটা মাটি হইয়া যাইবে। আর তা ছাড়া তোমাদের ঘরে যেরূপ লোকাভাব, একমুঠো রাঁধিয়া দেয় এমন লোকটী পর্য্যন্ত নাই।

আর তুমিও ত বড়সড় হইয়াছ, তোমারও ত বিবাহ দিতে হইবে। তোমার বৌ আসিয়াই বা দাঁড়ায় কোথা ? এরূপ স্থলে বিবাহ ভিন্ন কি উপায় থাকিতে পারে ? রামধন ত কিছুতেই স্বীকার হয় না কিন্তু তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া একার্য্য করিতেই হইবে। সংসারটা ত বজায় রাখিতে হইবে ! কি বল বাপু ?" কবিরাজ মহাশয় উৎসুকনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি আর কি বলিব ? খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম "আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন, আমি আর কি বলিব ?" বলিতে বলিতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল, গোপন করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। কিছুদিন পরে আবার মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলাম।

৭

মাতুলালয়ে ফিরিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই পিতা ঠাকুরের এক পত্র পাইলাম। তাঁহাকে যে নিতান্ত ধরা বাঁধা করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে হয় নাই তাহা পত্রপাঠ মাত্রেই বুঝা গেল।

পিতা ঠাকুর মহাশয় ১৫ই বৈশাখ বিবাহের দিনস্থির করিয়া আমাকে কালনা হইতে তাঁহার বরসজ্জা ক্রয় করিবার আদেশ দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া আমার পরলোকগত-জননীকে মনে পড়ায় চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া আসিল। মাতুলেরা হাসিয়া উঠিলেন।

এত অল্পদিনে পিতা ঠাকুরের বৈরাগ্যস্রোত সম্পূর্ণ বিশুষ্ক হইয়া যাইবে আমি আশা করি নাই। যাহা হউক ১৪ই বৈকালে মাতুল কর্ত্তৃক আনীত বরসজ্জা লইয়া ভবানীপুরের বাজারে পিতাঠাকুরের বাসায় উপস্থিত হইলাম।

সেখানে তখন আনন্দ উৎসবের মহা উৎসাহ পড়িয়া গিয়াছে—বর যাত্রদের জন্য আহারের উৎকৃষ্ট আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে—পিতাঠাকুর স্বয়ং রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রসনচৌকীর ললিতধ্বনি সঙ্গে হাস্য পরিহাসের কলকাকলি মিশ্রিত হইয়া সমস্ত বাসাটীকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া পিতৃদেব অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া বাহিরে আসিলেন, তখন কবিরাজ মহাশয় আমার হাত হইতে বরসজ্জা কাড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বরকে সাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বড়মামা রহস্য করিয়া বরসজ্জা মধ্যে লালগর্ণেটের জামা, লাল চেলি ও কার্পেটের জুতা কিনিয়া দিয়াছিলেন। সজ্জা দেখিয়া বরযাত্রগণ সকলেই অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং তখন নানাবিধ হাস্য কৌতুকের মধ্যে পিতৃদেবের বেশ পারিপাট্য আরম্ভ হইল। তাঁহার নয়নে কৌতুকের উজ্জ্বল আভা সুস্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, কেবল আমার বিষাদ ম্লান মুখচ্ছায়ার প্রতিবিম্বপাতে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বিকাশ পাইতেছিল না। তাঁহাকে এরূপভাবে অপ্রতিভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমি সত্বরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে ফিরিয়া আসিলাম।



পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বরকন্যার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে আমায় আবার সেই শ্মশান তুল্য পিতৃগৃহে উপস্থিত হইতে হইল। জননীর অতীত স্মৃতির লুপ্তপ্রায় চিহ্ন তখনো চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—এইবার সব ফুরাইবে!

জননীর ছেঁড়া চণ্ডীর পুঁথিখানি রন্ধনশালার চালে গোঁজা রহিয়াছে—তাঁহার আরসিখানি ভগ্নাবস্থায় আবর্জ্জনা মধ্যে পড়িয়া আছে—তাঁহার কেশ সজ্জাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাঁহার দেবতা পটগুলি মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে—তাঁহার বস্ত্রগুলি এক বেতের ঝাঁপির মধ্যে থাকিয়া ইঁদুর ও আরসুলার আহার যোগাইতেছে। আহা সবই আছে কিন্তু যে এই সমস্ত জড় পদার্থকে আপনার মঙ্গল শক্তিতে জীবন ও সাফল্য দান করিত সে আজ কোথায়! চক্ষু মুছিয়া মার স্মৃতিচিহ্ন গুলি যত্ন পূর্ব্বক তুলিয়া কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিলাম; যাহাতে সে গুলি কোন হৃদয় হীনার নিষ্ঠুর অনাদরে লাঞ্ছিত না হয়।

পরদিন সমস্ত গুছাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিসিমার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। যেখানে আমার চারুশীলা লক্ষ্মীরূপিণী জননী আপন পবিত্রতায় সমস্ত গৃহস্থালী মঙ্গলময় করিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন্ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর রঙ্গিণী আসিয়া সেখান হইতে অবিলম্বে তাঁহার চিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিবে—এ চিন্তা আমার অসহ্য মনে হইতেছিল।

বেলা এক প্রহরের পর গ্রাম প্রান্তে আনন্দবাদ্য বাজিয়া উঠিল। গ্রামের লোক কন্যা দেখিতে ছুটিল। আমি পিসিমার ঘরে শয্যা আশ্রয় করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পরলোকগতা জননীর কাতর মূর্ত্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। এত দিনের পর প্রকৃত বিদায় লইবার আশঙ্কায় যেন জননীর প্রশান্ত চক্ষু দুটী ছলছল করিতেছিল। বহুক্ষণ পরে পিসিমা আসিয়া আমায় অনেক বুঝাইয়া বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু আমার রক্তবর্ণ হইয়াছিল—বাটী গিয়া

স্নেহময়ী জননীর মহিমাময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অলঙ্কার পরিহিত কৌতুকময়ী রঙ্গময়ী যুবতী মূর্ত্তি দেখিলাম। সন্তানের হৃদয় এই বিশালময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইল না। পতমান অশ্রুবিন্দু বহুকষ্টে সংযত করিয়া আবার পিসিমার নিভৃত কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।

পিতাঠাকুর নববধূর সমযোগ্য অভ্যর্থনার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; আমার অনুসন্ধান করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না।

৮

সহসা পিতৃদেব আমার বিবাহের জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন কেন বলিতে পারি না। আমার নবীনা জননীর সেবার জন্য কি বিনা বেতনে দাসীর প্রয়োজন হইয়াছিল? কে জানে?

যাহা হউক পিতৃদেব আমার কোন প্রকার আপত্তি শ্রবণ না করিয়া সহসা অগ্রহায়ণের শেষে আমার বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিলেন। কন্যাটী রুগ্না, কন্যার মাতা শয্যাগতা। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? বরকর্ত্তার আদেশ অমান্য করে আজকালের বাজারে কাহার সাধ্য? কাজেই বিবাহ যথা সময়েই হইয়া গেল।

বধূ লইয়া ঘরে আসিলাম। পিতৃদেব আদেশ দিলেন এক বৎসরের মধ্যে বধূকে আর তাহার পিত্রালয়ে পাঠান হইবে না।

সে বেচারী জননীর ব্যাধিক্লিষ্ট মুখমণ্ডল মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

আমি আমাদের লক্ষ্মীহীন গৃহের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ এক রকম ছাড়িয়াছিলাম—এই নূতন বন্ধনে আমায় নিতান্ত বিপদে ফেলিল। আমার হতভাগ্য সঙ্গিনী ম্যালেরিয়ার স্নেহ উপহার একটী বৃহৎ প্লীহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সুতরাং প্রত্যহ রাত্রে তাহার একটু করিয়া জ্বর হইত। সংসারের কাজ কর্ম্মও কিছু কিছু তাহাকে করিতে হইত—ঔষধ ও পথ্যের কোন ব্যবস্থাই ছিল না—উপরন্তু রুগ্না জননীর জন্য



দুশ্চিন্তা, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে সর্ব্বদা ব্যথিত করিত। কাজেই তাহার মুখে একদণ্ডের জন্য হাস্য দেখা যাইত না—অবকাশ পাইলেই সে নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিত। মাতৃদেবী তাহার এইরূপ বিমর্ষ ভাব দর্শনে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া থাকিবেন।

অবশেষে একদিন আমার এই রোগ পীড়িতা বালিকা সহধর্ম্মিণীকে অবলম্বন করিয়া এক তুমুল বিপ্লব বহ্নি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে জ্বলিয়া উঠিল।

আমার জ্বর কম্পিতা বালিকা বধূ একদিন শরতের প্রত্যূষে জল লইয়া বাটী আসিতেছিল। গুরুভার কলসের কঠিন স্কন্ধ মুহুর্মুহু তাহার ক্ষীণ হস্তবেষ্টনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। বাটীর সম্মুখে আসিয়া সে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া তাহার অসাড় হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। আমার সহধর্ম্মিণীও তাহার সহগামিনী হইলেন।

পিতাঠাকুর তখন দ্বারপার্শ্বে বসিয়া মুদিত চক্ষে বিমল তাম্রকুট ধূমের রসাস্বাদ করিতেছিলেন। এই অপ্রিয় শব্দে তিনি অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এবং মনোরমা যে মুহূর্ত্তে তাহার আহত ক্ষীণ দেহ বহুকষ্টে টানিয়া দ্বার সমীপে আনয়ন করিল সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দান করিয়া এবং অপ্রাচ্য ভাষায় গালি দিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন সেই ক্ষীণদেহা বালিকা সিক্তবস্ত্রে তাহার জ্বরযুক্ত দেহ আবৃত করিয়া ভূতলে পতিত হইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। আমি তখন সরোবর তীর হইতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাটী আসিতেছিলাম—এই হৃদয় বিদারণ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যথিত হইল।

সেইদিন অপরাহ্নে আমি ও আমার রুগ্না সহধর্ম্মিণী পিতার তাড়না ও জননীর পরিহাস বচনের মধ্যে আমার শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলাম।

৫

আমার শাশুড়ী কিছু সুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিষাদ ম্লান স্নেহপূর্ণ বদনমণ্ডলে মাতৃত্বের কোমল ছায়া দেখিয়া আমার নিপীড়িত ব্যথিত বক্ষ কিছু সান্ত্বনা লাভ করিল।

মনোরমাও পিত্রালয়ে আসিয়া তাহার বিষাদ ভার নামাইয়া রাখিল —তাহার শোক ম্লান ক্ষীণমুখে আনন্দের মৃদু হাস্য নিবিড় বর্ষার অবকাশে ক্ষীণ সূর্য্যাস্ত রেখার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল।

কাজেই এই স্নেহ ছায়া শীতল মধুর কুঞ্জকানন পরিত্যাগ করিয়া আবার সেই কণ্টকাকীর্ণ দাবদাহ পরিবেষ্টিত স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

মাসাবধি কাল পরে হেমন্তের প্রভাতে বাটী আসিয়া দেখিলাম আমাদের বাটীর দ্বারদেশ প্রচুর লোক সমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার হৃদয়দেশ কাঁপিয়া উঠিল—আমি ব্যস্ত হইয়া গোযান হইতে অবতরণ করিলাম।

পিতৃদেব আমাকে দেখিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিলেন "বাবা নীলমণি —আসিয়াছিস্—বৃদ্ধ বয়সে যেমন আমার কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছি—আসন্নকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে।"

আমি প্রথমে কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পরে সমস্ত অবগত হইয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

পিশাচিনী বিমাতা এত তাড়নার মধ্যেও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল— দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল। তখনি যে আমি কেন তাহার ভবলীলার অবসান করিয়া দিই নাই, এখন তাহাই অতিশয় বিচিত্র মনে হইতেছে।

পাপিয়সীকে আমার স্বর্গগতা জননীর পবিত্র মন্দির হইতে সত্বরে বিদায় করিবার জন্য দ্রুতবেগে ঘাটে চলিয়া গেলাম।



সন্ধ্যার সময় দেবতার মন্দির হইতে পথভ্রষ্টা পিশাচিনী আপনার কলঙ্ক ম্লান মুখমণ্ডল লইয়া বিদায় হইয়া গেল।

কিন্তু এখনো তাহার মুখে উপেক্ষা ও পরিহাসের সেই ক্ষীণ তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎবৎ হাস্যরেখা। কি আশ্চর্য্য, রমণী কি পিশাচী!

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# হকিকৎ রাও।

[ চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক বীর হকিকৎ রাওয়ের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া গুরুমুখী অর্থাৎ পাঞ্জাবি ভাষায় বহুসংখ্যক নাটক ও উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে। ইহার সকল গুলিই সমধিক বীর ও করুণ রসাত্মক এবং বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এই প্রবন্ধের বিবরণের জন্য আমি আমার বন্ধু এ্যবটাবাদ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বক্সী পরমানন্দ, বি, এ, ও লাহোর ডি, ●, ভি, কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক লালা গোকুলচাঁদ, এম, এ, মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ]

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাবের অন্তর্গত সিয়ালকোট নগরের ব্রাহ্মণপল্লী মধ্যে ভগৎমল নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণী, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক একটী পুত্র ও দশমবর্ষীয়া একটী পুত্রবধূ। ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম "হকিকৎ রাও" ও পুত্রবধূটীর নাম "লছমী"। হকিকৎ রাও যেমন নম্র সেইরূপ বলিষ্ঠ ও ধীশক্তিসম্পন্ন এবং সেইরূপ পিতৃমাতৃপরায়ণ। হকিকৎ রাও নিকটবর্ত্তী একটি মসজিদে মৌলভি হামিদ আলি সাহেবের নিকট আরবী ও পারসীক

ভাষা শিক্ষা করিতেন। এবং পাঠশালা হইতে আসিয়া অবসর মত "লছমীর" সহিত খেলাধূলা করিতেন। ইহাদের খেলার মধ্যে নদীকূলে বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত প্রস্তর খণ্ড কুড়ান, নদীগর্ভে বালুকা খনন করিয়া ক্ষুদ্র জলাশয় প্রস্তুত করা প্রভৃতি প্রধান ছিল। এবং এই কার্য্যেই দুইজনে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন কোন দিন বিলম্ব দেখিলে ব্রাহ্মণী ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতেন।

হকিকৎ রাও ব্যতীত হামিদ আলির আর পোনের কুড়িটি মুসলমান ছাত্র ছিল। ইহাদের অনেকেই হকিকৎ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। কিন্তু কি শারীরিক বলে কি প্রখর ধীশক্তিতে সকলেই হকিকৎ রাওয়ের নিকট পরাস্ত হইত। মৌলভি সাহেব এই ব্রাহ্মণ বালককে বিশেষ স্নেহ করিতেন। শুধু মৌলভি সাহেব কেন হিন্দু ও মুসলমানপল্লী উভয় স্থানেই ইহাকে সকলেই প্রশংসা করিত ও ভালবাসিত।

এই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি তাহার কালস্বরূপ হইল। তাহার সহপাঠিগণ হকিকৎ রাওয়ের নিকট সকল দিকে পরাজয় স্বীকার করিয়া বড়ই ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। বালকদিগের ত স্বভাবই এইরূপ, তাহাতে আবার হকিকৎ রাও ব্রাহ্মণ সন্তান। সুতরাং একজন ঘৃণার্হ 'কাফের' যে তাহাদের সমক্ষে মোল্লা সাহেব ও প্রতিবাসিবর্গের নিকট আদৃত হইবে ইহা কোন্ প্রাণে মসলেম্ বালকগণ সহ্য করিবে। সকল বালকগুলি একত্র হইয়া ও পৃথক্ পৃথক্ এই নিরপরাধী ব্রাহ্মণ তনয়ের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন হয়ত কোন বালক রটাইয়া দিল হকিকৎ মুসলমানের বাটীতে অন্নগ্রহণ করিয়াছে। কেহবা নানা প্রকার গ্লানিসূচক পত্র লিখিয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রেরণ করিতে লাগিল। একদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ ভগৎমল দেখিল তাঁহার দরজার সম্মুখে স্তূপাকার গো অস্থি পড়িয়া আছে। ক্রমে এই প্রকার অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে ব্রাহ্মণ



স্থির করিলেন যে বালককে আর মসজিদে পড়াইতে পাঠাইবেন না। মৌলভি হামিদ আলি অগত্যা অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহার প্রিয় ছাত্রকে পুনরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এবং ভবিষ্যতে যে তিনি দুষ্ট বালকদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবেন তাহাও স্বীকার করিয়া গেলেন।

———

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য মুসলমান বালকগণ ইহাতে আরও ক্ষুব্ধ হইল এবং বিদ্বেষ বহ্নিতে জলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন অনিষ্টের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল যে মৌলভি সাহেবকে ইহার উপর ক্রোধান্বিত করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না এবং মৌলভি সাহেবও যে সহজে তাহাদের নিরপরাধী শত্রু এই ব্রাহ্মণ তনয়ের উপর বিরূপ হইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমরা বলিতে ভুলিয়াছি যে হকিকৎ রাও যেমন বুদ্ধিমান ও ধীর ছিলেন তাঁহার স্বধর্ম্মেও সেইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ব্রাহ্মণ ভগৎমল বাল্যকাল হইতে পুত্রকে গীতা ও পুরাণাদি পাঠ করাইতেন এবং নানারূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

মৌলভি হামিদ আলির একটী ভাগিনেয় ছিল। এই ভাগিনেয়টী সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে ও কূট পরামর্শে প্রবীণ ছিল। সে হামিদ ও হকিকৎ উভয়ের চরিত্র বিশেষরূপে জানিত। ইহার নাম মহম্মদ আজিজ।

একদিন পাঠশালার ছুটী হইলে হকিকৎ ও অপর দু একটী অল্প বয়স্ক বালক বাটী চলিয়া গেল আর অন্যান্য বালকগণ সকলেই রহিল। যেন সেদিন একটা বিশেষ মন্ত্রণা বা দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। অদ্যকার এই সভার উপযুক্ত সভাপতি হইলেন আজিজ্ এবং মুরুব্বিয়ানা সহকারে উপবেশন করিয়া সকলকে সম্বো-

ধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ভাই সকল কি প্রকারে এই কণ্টক উন্মূলিত করিতে হইবে তাহা এতদিনে স্থির করিতে পারিলাম।"

অপরাপর বালকগণ শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল "ভাইজান্! ব্যাপারখানা কি শীঘ্র বলিয়া ফেল"।

মহম্মদ আজিজ তাহাদের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া একটু জিব্ কাটিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "খোদা কসম্! এত আগে তোমাদের বলিয়া সব নষ্ট করিব না। তবে তোমাদিগকে কল্য মস্‌জিদে আসিয়া সকালে সব বলিব" এই বলিয়া তাহার কোন ঘনিষ্ঠ ও সমপ্রকৃতি বালকের স্কন্ধে হাত দিয়া পরামর্শ করিতে করিতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে আর একবার নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গেল "মহম্মদ আজিজ মিয়ার পেটে কত বুদ্ধি কাল একবার তাহার প্রমাণ দিব। শালা কাফেরকে যদি না জব্দ করিতে পারি ত আমি হারামের জাতক ইত্যাদি"। বালকগণও হৃষ্টমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ইহাদিগের এইরূপ আচরণে হকিকৎ কিছুমাত্র ভীত হয় নাই, তবে তাহার সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে এইরূপ উত্তরোত্তর শত্রুতা বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহাকে অন্য কিছু বিষণ্ণভাবে বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। বাটীতে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? সে তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারিল না।

বালিকা 'লছমী' কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। 'লছমী' হকিকৎ রাওকে আর পাঠশালায় যাইতে হইবে না এই বলিয়া আশ্বাস দিল। তৎপরদিন প্রাতে ঐরূপ নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হকিকৎ বলিল—

হকি। 'লছমী' আজ বেলা হইয়াছে এবং মৌলভি সাহেবেরও আসিবার সময় হইল এই বেলা বাটী যাই। মসজিদে যাইতে হইবে।



লছমী। আজ যদি মসজিদে যাও তবে মৌলভি সাহেব মারিবেন। যাওনা কেন মজা দেখিবে এখন।

হকি। কেন মারিবেন? আমায় যাহা পাঠ দিয়াছিলেন সব মুখস্থ হইয়াছে; তবে শুনিবে:—

মানা মোরাম্ কেদর পায়েম্ বানায়লন্দ্,
নাজিম্ বুরুম্ কে আজ্ নেযাম্ বানায়লন্দ্,

ইত্যাদি দু'একটী পারসী বয়েদ্ আবৃত্তি করিয়া ফেলিল।

"লছমী" দেখিল তাহাকে ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তখন সে বলিল "আমাকে একটা বালুকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যাও" তাহার সে কথাটাও থাকিল না দেখিয়া 'লছমী' কাঁদিতে আরম্ভ করিল। হকিকৎ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বাটীতে লইয়া গেল। তাহার জননীও সেদিন থাকিয়া যাইতে বলিলেন। হকিকৎ তখন মাতাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে কোন শঙ্কারই কারণ নাই। সুতরাং তিনি আর তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু পুত্রকে সেদিন পাঠাইয়া ব্রাহ্মণীর মন বড়ই উদ্বিগ্ন রহিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ মসজিদে সকল বালকই হকিকৎ রাওয়ের অগ্রে আসিয়া যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। মসজিদে আসিয়াই সে সকলকে যথাবিধি কুশল জিজ্ঞাসা ও অভিবাদনাদি করিয়া স্ব স্থানে উপবেশন করিল। এই সময় সকলেই মহম্মদ আজিজের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে আজিজ তাহার বন্ধুদিগকে তাহার মৎলবের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছে। আজিজ বিশেষ জানিত যে হামিদ আলি একজন অন্ধ বিশ্বাসী ও গোঁড়া মুসলমান এবং হকিকৎরাও একটা স্পষ্টবাদী ও

স্বধর্ম্মপরায়ণ বালক। সুতরাং হকিকতের মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির করিতে হইবে যাহাতে হামিদের ধর্ম্মে আঘাত লাগে এবং তাহা হইলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আজিজ একটা পাঠ জিজ্ঞাসার ছলে হকিকৎ রাওয়ের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল এবং বন্ধুভাবে নানাপ্রকার কথার অবতারণা করিতে লাগিল। এমন সময়ে মৌলভি সাহেব উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার দ্বিতীয় নেমাজ শেষ করিতেছেন শুনা গেল। সেই সুযোগে আজিজ বলিল "বাস্তবিক আমাদের মৌলভি সাহেব একটি ধার্ম্মিক মুসলমান বটে। দেখদেখি দিবারাত্রি আল্লার নাম করিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহার আসন টল টলায়মান করিতেছেন।"

হকিকৎ। হাঁ। মৌলভি সাহেব ধর্ম্মপরায়ণ তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। তবে তিনি যে অন্যান্য মুসলমান গণের ন্যায় "আল্লা বিস্‌মিল্লা" বলিয়া উচ্চরবে গগন বিদীর্ণ করিতে পারেন বলিয়া ধার্ম্মিক তাহা নহে, তাঁহার অনেক সদ্‌গুণও আছে।

আজিজ। আমাদের শাস্ত্রের ঐরূপ বিধান আছে।

হকিকৎ। তা সত্য বটে। কিন্তু মনে মনে ডাকিলে কি হয় না। ভগবান কিছু কানে কম শুনেন নাকি? কবীর সাহেব বলিয়াছেন!—

"মসজিদ্ ভিতর মুল্না টের, তেরা খোদা কেয়া বয়রা হ্যায়।
চিউটি কো পগ্ পয়েল্ বজে উত্তবি সাহেব শুণ্ডা হ্যায়।"

অর্থাৎ মসজিদের ভিতর চীৎকার করিয়া মর কেন তোমার খোদা কি কালা হইয়াছেন? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটী পিঁপড়ার পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে।

আজিজ। (সক্রোধে) হাঁ পবিত্র ইসলামের ধর্ম্মে যাহা বলে সব ভুল আর তোমার কাফেরের কেতাব যাহা বলে সব অব্যর্থ!

অপর একটী বালক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল "না, হে, আমাদের



মৌলভি সাহেব মহা অধার্ম্মিক আর অন্যান্য মুসলমানগণ যাহারা করুণস্বরে ভগবানকে ডাকে তাহারা সব বেয়াকুব্ তবে ধার্ম্মিক কে জান; ঐ ওপাড়ার যে বুড়া বামুন আছে টং টং করিয়া কোশাকুশি বাজায় আর ভগবান যাহার টিকিতে আসিয়া আবির্ভূত হন্।"

হকিকৎ তাহার দিকে একবার সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেই সে অপ্রতিভ হইয়াই হউক আর ভয়েই হউক সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

মহম্মদ আজিজ পুনরায় সুর ধরিল "আচ্ছা তোমায় ধর্ম্মই না হয় ঠিক কিন্তু তোমার দেবীগুলি কি?

হকিকৎ তখন কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "দেখ সাবধানে কথা বলিবে। আমাদের শাস্ত্রের অনেক গূঢ় অর্থ আছে তাহা তুমি কি বুঝিবে? এবং আমাদের পূজনীয় এমন কোন দেবী নাই যাঁহার একটীর অধিক পতির কথা লিখিত আছে। তাহাই যদি বলিলে তোমাদের নিজেদের শাস্ত্রের ও ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখ। এই কথা বলিতে না বলিতে সমবেত মুসলমান বালকগণ সমস্বরে 'তোবা' 'তোবা' করিতে করিতে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেল।

অবসর মত মৌলভি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৌলভি আসিয়া দেখিলেন বালকগণ সকলেই চোক্ রগড়াইতেছে এবং বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছে। তিনি প্রথমতঃ প্রিয় ভাগিনেয় আজিজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

আজিজ একবারে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেহই কিছু বলিতে পারিল না। কিঞ্চিৎ পরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আজিজ বলিল—

আজিজ। মাথু সাহেব! আর কি বলিব আমাদের যদি আজ জান্ যাইত ত সে আচ্ছা হইত।

মৌলভি। কি হইয়াছে তাই বল্‌না শুনি।

আজিজ। এই কাফের আপনাকে অধার্ম্মিক বলিয়াছে ও নিন্দা করিয়াছে; অধিক কি বলিব আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের গ্লানি করিয়াছে এবং আমাদের পয়গম্বর স্বয়ং মহম্মদ ও তদীয় দুহিতাকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়াছে।"

শুনিতে শুনিতে মৌলভির চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কোন কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সবলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন "এই পাপের শাস্তি দিবার ক্ষমতা আমার নাই। চল্ কাজির দরবারে তোর বিচার হইবে।"

ক্রূর স্বভাব মুসলমান বালকগণ তাহাদের আশার অতিরিক্ত ফল ফলিয়াছে দেখিয়া হৃষ্টমনে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে বাটী চলিয়া গেল।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া পথে যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে "হ্যাগা আমাদের হকিকৎকে আসিতে দেখিয়াছ?" কেহই কিছু বলিতে পারে না। অবশেষে জনৈক প্রহরীর নিকট সংবাদ পাইল "যে কোন কারণে তাহাকে কাজিসাহেবের কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, এবং কল্য প্রভাতে তাহার বিচার হইবে।" এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কাজির বাটীর দিকে চলিলেন। 'লছমী' বেচারা একাকী কি করিয়া থাকিবে সেও সেই সঙ্গে গেল। কাজির বাটীতে যাহাকে পায় ব্রাহ্মণ তাহারই পদে ধরে ও অনুনয় করে। কেহই তাহাদের দিকে দৃক্‌পাতও করে না। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহারা সেই মুসলমান কাজির দ্বারদেশে অনাহারে ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে রাত্রি কাটাইবার জন্য পড়িয়া রহিলেন।



রাত্রিশেষে ব্রাহ্মণীর সেইরূপ অবস্থাতেও একবার তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেটুকু কেবল অভাগিনীর দুঃখ ঘনীভূত করিবার জন্যই আসিয়াছিল। কারণ ব্রাহ্মণী তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় একটী ক্ষুদ্র গোলক বাঁধা ছিল, এবং কিঞ্চিৎ পরে সেটিকে যেন দস্যুরা কাড়িয়া লইল। ব্রাহ্মণী নিদ্রাভঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইতে না হইতে কাজি সাহেবের প্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। এবং প্রখর মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজস্বী মহাপ্রতাপবান কাজি আসিয়া স্বীয় উচ্চ বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। চারিদিক হইতে সেলাম ও কুর্ণিশের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। কাজিসাহেব একটু বিশ্রাম করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে জনৈক প্রহরীকে আদেশ করিলেন 'শীঘ্র সেই পাষণ্ড কাফের নন্দনকে আমার সম্মুখে হাজির কর'। মুহূর্ত্ত মধ্যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। হকিকৎরাও সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। উত্তেজিত স্বরে কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরে দুগ্ধপোষ্য 'কাফের শিশু' তুই নাকি পবিত্র ইস্‌লামের গ্লানি করিয়াছিস্?" হকিকৎ নির্ভয়ে বলিল "জাঁহাপনা! আমি অন্যায় বা মিথ্যা কথা কিছুই বলি নাই। তবে তর্কচ্ছলে যে কথা হইয়াছিল আপনি যদি শ্রবণ করেন আমি এখনই বলিতেছি।" কাজি সাহেব মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "আর না, আর আমি কিছু শুনিতে চাহি না। তোর ও মুখ ইল্‌লামের অপবাদে কলুষিত হইয়াছে। তোর হৃদয়ের শোণিতে যদি ঐ মুখ প্রক্ষালিত করিতে না পারি তবে ধর্ম্মাধিকরণে পাপ স্পর্শিবে।"

"ওরে ঘাতক কে আছিস্ শীঘ্র ইহাকে লইয়া যা" এই কথা বলিতে না বলিতে ভগৎমল, ব্রাহ্মণী ও লছমী আসিয়া কাজির চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। যদিও হকিকৎরাও মুসলমানগণেরও প্রিয়-

পাত্র ছিল, তত্রাচ তাহার এই ঘোর অপরাধের জন্য কেহই তাহার পক্ষ হইল না।

এই সময় মৌলভি হামিদ্ সাহেব অগ্রসর হইয়া কাজিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "কাজি সাহেব! আপনি ন্যায় বিচারই করিয়াছেন, এই পাপের মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত বটে। কিন্তু কোরাণ সরিফে উক্ত আছে যে যদি কোন কাফের তাহার ধর্ম্মত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে" অপর একজন মৌলভি বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, সেও এক-প্রকার মৃত্যুই বটে। কারণ তাহার কাফের জীবন নষ্ট হইল।" সভাসদ্গণ এই বাক্যেরই সপক্ষে মত দিলেন। কাজি সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "আচ্ছা কোরাণ সরিফের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।—ওরে মূর্খ ব্রাহ্মণ-তনয় কল্য প্রভাতে উঠিয়া যদি নিকটস্থ কোন মসজিদে যাইয়া তুই, নিজ কাফের জীবনের জন্য অনুতাপ করিস এবং কোন মৌলভি যদি দয়া করিয়া তোকে পবিত্র এবং মহান্ ইসলাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন তবেই মঙ্গল নচেৎ কল্য অপরাহ্ণে প্রকাশ্যে বধ্য ভূমিতে তোকে শূলবিদ্ধ করিয়া বিনাশ করা হইবে।"

হকিকৎ কোন উত্তর দিলনা, কেবল বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতা মাতার সহিত বাটীতে আসিল।

ব্রাহ্মণী তখন সস্নেহে পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "যাহা হউক নিষ্ঠুর কাজি যে তোমাকে প্রাণে মারে নাই ইহাই সৌভাগ্যের কথা; তুমি না হয় মুসলমান হইয়া আমাদের বাটীতেই থাকিবে। তবু চোখে দেখিতে পাইব ত।"

হকিকৎ। মা! আপনি ব্রাহ্মণ তনয়া হইয়া আমাকে মুসলমান হইয়া মুসলানের আচার ব্যবহার করিতে বলিতেছেন। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও যে শতগুণে শ্রেয়ঃ। জননি! এমন পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম, এমন



উচ্চ শিক্ষা ও আদর্শ সব জলাঞ্জলি দিব? তাহা প্রাণ থাকিতে পারিব না; বলিতে বলিতে বালকের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল এবং তাহার বদন মণ্ডলে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সময় তাহার বাক্যগুলি যেন স্বর্গীয় বাণীর ন্যায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। হকিকতের এইরূপ মূর্ত্তি ও এমন দেবভাব তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই। দেখিতে দেখিতে উভয়েই জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

তৎপরদিন প্রতিবাসিগণ আসিয়া সকলেই হকিকৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। সকলে বলিল প্রাণ ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করা বড়ই পাপ কার্য্য। কিন্তু বালক হকিকৎ এখন বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সকলের তর্ক খণ্ডন করিয়া ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল; হকিকৎরাওও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এমন সময় ছয়জন মুসলমান সৈনিক তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য আসিল। হকিকৎ পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইতে গেলেন। তাঁহারা একবার দেখিয়া পুনরায় চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। 'লছমী' পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হকিকৎকে লইয়া সৈনিকগণ চলিয়া গেল।

বধ্যভূমি লোকে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যস্থলে একটী সুতীক্ষ্ণ লৌহ শূল প্রোথিত করা হইয়াছিল। ইহার পার্শ্বে হকিকৎকে দাঁড় করান হইল। কিঞ্চিৎ অন্তরে মহম্মদ্ আজিজ মুখ লুকাইয়া মজা দেখিতে ছিল। হকিকৎ আজিজকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিল "ভাই আজিজ! সহপাঠিগণকে আমার সেলাম দিও এবং বলিও হকিকৎরাও বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছে, আবার আসিবে এবং পুনরায় আবশ্যক হইলে সনাতন ধর্ম্মের জন্য অক্লেশে প্রাণত্যাগ করিবে।"

পার্শ্বে ভীষণ শূল ও ততোধিক ভীষণ লম্বিত শ্মশ্রু শাণিত কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান মুসলমান ঘাতক বর্গকে দেখিয়াও অচল এবং অটলভাবে সমবেত পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া হকিকৎ বলিতে লাগিল—"মহাশয়গণ! পিতা মাতাকে বলিবেন হকিকৎ খেলাইতে গিয়াছে, আবার সত্বরই আসিবে। এবারকার মত আপনারা আমাকে বিদায় দিন। আমার অনেক কার্য্য বাকি রহিল। সমগ্র ভারতভূমে যদি কখনও আর্য্য ধর্ম্মের পতাকা উড়াইতে পারি তবেই জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব। মা—জন্মভূমি প্রণাম হই" বলিতে না বলিতে ঘাতকগণ সেই সুকোমল নবনীত সদৃশ দেহখানি তীক্ষ্ণ লৌহশূলে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল।

কোমল প্রাণ অধিকাংশ হিন্দু নরনারী সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। স্ব স্ব বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শত শত মুসলমান দর্শকগণ "লা ইলাহা ইল্লিল্লা" রবে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতে লাগিলেন।

এই স্থানটা লাহোরের নিকট সালেমার নামে পরিচিত। এখানে সম্ভবতঃ বালকের স্মরণ চিহ্নস্বরূপই একটি বাৎসরিক মেলার অধিষ্ঠান হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের কোমল প্রাণা পুত্রবতী রমণীগণ আসিয়া এই স্থানের ইতিহাস স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ।

---

# একটী তারকা।

( বিংশ শতাব্দীর কবিতা-কুঞ্জবন হইতে দৃষ্ট )

স্তব্ধ নিশীথ, ঘুমে নীরবতা
স্বপন মাখিয়া পরাণে,



কাঁদিছে তটিনী, হাসিছে পবন
চুমিয়া আকাশ-বিতানে।

শুয়েছে নগরী প্রকৃতির দেহে,
অনুভূতি যেন পিয়াসে,

খেলিছে জোছনা ধরণীর বুকে,
বাসনা যেনরে বিলাসে।

গাঁথিতেছে মালা বসি নিজমনে
আঁধার একেলা সাগরে,

ছায়ায় ডুবিয়া মদিরা মাখিয়া
সুপ্তি পশেছে সমরে।

এ হেন সময়ে উজল তারকা
হাসিয়া একটী গগনে

ডাকিল আমায়, হেলায়ে আঙুল,
পশিল ইঙ্গিত শ্রবণে।

কহিলাম তারে, অতদূর আমি
পারিব না যেতে উড়িয়া,

পাখা দুটী মোর বালুকাতে গড়া,
পড়িবে আবেগে খসিয়া।

পার যদি তুমি, এস মোর কাছে,
তুলে নাও মোরে ধরিয়া,

কোমল পরাণে লাগিবে আঘাত
থাক যথা আছ বসিয়া।
ছিঁড়ে যাবে তার হৃদয়ে আমার,
জানিও তোমার লাগিয়া,
তবু কি করিব, কপালে আমার
পথগাছি আছে ছিঁড়িয়া।
মুদিল তারকা বিরস বদনে
নয়ন তারকা আকাশে,
সেই থেকে মোর হৃদয়-যামিনী
কাঁপিতেছে নিতি বাতাসে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩১১। ৭ম সংখ্যা।

## কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী।

### ভূমিকা।

এতদিন এদেশে যে প্রণালীতে শিশুশিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল, অবৈজ্ঞানিক ও অসার। কারণ উহা মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাদান-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনানুরোধে শিশুগণকে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত, স্মৃতিশক্তির সাহায্যে পরোক্ষ জ্ঞানদান করা ও লিখন, পঠন, গণিতে কথঞ্চিৎ উপযুক্ত করিয়া দেওয়াই এই প্রণালীর উদ্দেশ্য। কিন্তু এতদ্দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে না, প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ হইতে পারে না। কেন না মানবের শারীরিক মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ বৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ইহাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে প্রণালী মানবের ঈদৃশ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী। এতদ্দেশীয় শিশুবিদ্যালয়গুলিতে এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল, উহা ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব লাভের উদ্দেশ্য পরিহার করত, কেবল বালকগণের

স্মৃতিশক্তির অনুশীলন এবং অস্বাভাবিক উপায়ে বিবিধ উৎপীড়নে, তাহাদের মানসিক শক্তি ও ধারণার অতীত কতকগুলি নীরস, কঠিন, নিষ্ফল বাক্য ও সংজ্ঞা মাত্রের কণ্ঠস্থ শিক্ষাদান করিয়া পরিতৃপ্ত ছিল। তাহাতে সজীবতা নাই, সরসতা নাই, আনন্দ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকাশ নাই। এই অন্ধ, নৃশংস শিক্ষা-প্রণালী বহুদিন অস্মদ্দেশীয় শিশু এবং যুবকগণের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি সমূহের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশ সংরুদ্ধ করত তাহাদিগকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছিল। এই শিক্ষার চরমফলে যুবকগণ স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন হারাইয়া, চিন্তা ও উদ্ভাবনা বর্জ্জিত হইয়া, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি বিরহিত হইয়া জনসমাজ ও গবর্ণমেণ্টকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। অস্মদ্দেশীয় অভিভাবক ও সুযোগ্য শিক্ষানেতৃগণ এবং আমাদের সুযোগ্য তীক্ষ্ণদর্শী গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে এই শিক্ষার বিষময় ফল উপলব্ধি করত, ইহার একটা আমূল পরিবর্ত্তন সর্ব্বান্তঃকরণে অভিলাষ করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট বহুবিবেচনা ও চেষ্টার পর অধুনা এতদ্দেশীয় নিম্নশিক্ষা মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহাতে শিশুকাল হইতেই বঙ্গবাসীর অন্তরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি উন্মেষিত হয়, স্বচেষ্টা, স্বাবলম্বন ও উদ্ভাবনা শক্তি জাগরিত হইয়া উঠে, এই প্রণালীদ্বারা তাহাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। যাহাতে শ্রমজীবি বালকগণের অন্তরে প্রাগুক্ত গুণসমূহ বিকশিত হইয়া তাহাদিগের ব্যবসায় ও কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং যাহাতে মধ্যবিত্ত বালকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক শিক্ষালাভের উপযুক্ত গুণসমূহ লাভ করিতে পারে, বঙ্গদেশে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করায় গবর্ণমেণ্টের তাহাই উদ্দেশ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই শিক্ষাপ্রণালীর



প্রবর্ত্তনা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ এই প্রণালীর শিক্ষাদ্বারা অস্মদ্দেশীয় বালকগণ যে বাক্‌পটুতা অপেক্ষা সমধিক কর্ম্মনিষ্ঠা লাভ করিবে কেবল তাহাই নহে, কিন্তু এতদ্দ্বারা তাহাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্ববিধ অনুশীলনই একাধারে সম্পন্ন হইয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে দণ্ডায়মান করিয়া দিবে। আমরা সমগ্র হৃদয়ের সহিত, প্রমুক্ত উল্লাসে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করি। সম্প্রতি এ দেশে এই শিক্ষার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। ইহার ভবিষ্যফল কি হইবে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সমগ্র দেশ আজ স্ফুট ও অস্ফুট সমালোচনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমার ইহাই প্রতীতি, যে যদি অস্মদ্দেশীয় শিক্ষানেতৃগণ তাঁহাদের ব্রতের মহান্ দায়িত্ব স্মরণ করত কয়েক বর্ষ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর গভীর অধ্যয়ন, পরিদর্শন ও পরীক্ষায় যাপন করেন, তাহা হইলে তাহার অশেষ কল্যাণময় ফল সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং তবেই অজ্ঞানতা-প্রসূত অযথা সমালোচনা নিবৃত্ত হইয়া, সমগ্রদেশ গুণগ্রাহিতার সুস্নিগ্ধ কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

## ফ্রিড্‌রিক ফ্রোবেল।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর দার্শনিকতত্ত্ব ও বিদ্যালয়ে তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে আমি এই প্রণালীর উদ্ভাবক মহাত্মা ফ্রোবেল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মনেতাকে পরিহার করত যেমন ধর্ম্মপ্রণালীর ব্যাখ্যা নীরস ও অপরিস্ফুট, শিক্ষানেতাকে পরিহার করত শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাখ্যাও তদ্রূপ। কারণ শিক্ষানেতার জীবন ও চরিত্রের মধ্যেই—তাঁহার সমগ্র জীবনের অবিচ্ছিন্ন কার্য্যের মধ্যেই তৎপ্রচারিত শিক্ষাদর্শ ও তাহার বিশেষ বিশেষ রীতিপদ্ধতি নিহিত হইয়া থাকে। যে মহাপুরুষের জলন্ত জীবন জার্ম্মানীর প্রাচীন শিক্ষা-

প্রণালীর উপর প্রবল বিপ্লব আনয়ন পূর্ব্বক তাহার আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছিল, যাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি সমগ্র শিক্ষা-জগৎকে চিরদিন উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে, তাঁহার জীবনচরিত শিক্ষক-সমিতি মধ্যে স্বতন্ত্র ও গভীরভাবে আলোচ্য। ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাদের সে সুযোগ আসিবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই মহাপুরুষের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

ফ্রিড্রিক ফ্রোবেল মধ্য-জার্ম্মানীর অন্তর্গত ওবারওয়েসব্যাক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে বিবিধ প্রতিকূল ঘটনা ও বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও অদম্য প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর পরিশ্রমে যুবাকালে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি এই তিন শাস্ত্রের উপরে তাঁহার অভিনব শিশুশিক্ষা প্রণালীর প্রতিষ্ঠা এবং স্বদেশের ভবিষ্যবংশের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য স্বীয় জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী জন্মশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার স্বকীয় সন্তানসন্ততি ছিল না, স্বদেশের শিশুসন্তানগণকেই আপন সন্তান-তুল্য জ্ঞান করত তাহাদিগকে নিরতিশয় প্রীতি ও স্নেহ করিতেন। তাহাদের প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য এমন কোন স্বার্থ ছিল না যাহা তিনি বিসর্জ্জন করেন নাই। ফ্রোবেল স্বদেশে এক আদর্শ শিশুবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম "কিণ্ডারগার্টেন" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে স্বীয় অভিনব মত প্রচার ও তদনুসারে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি তদানীন্তন প্রসিয়ান গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দ্বারা বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী ও কার্য্যপরম্পরার কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তথাপি উৎসাহ আশা ও উদ্যম তাঁহাকে একদিনের জন্যও ত্যাগ করে নাই। তিনি অপরাজিত চিত্তে, সদর্পে আপন উদ্ভাবিত শিক্ষা-



প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা, সারবত্তা ও উপকারিতা প্রমাণ করত বহু গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই সেই মহাপুরুষ-প্রচারিত সত্য ফলপ্রসূ হইয়াছে এবং একশতাব্দী মধ্যেই সভ্যজগতের অধিকাংশ দেশই এই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী শিশুগণের শিক্ষাকল্পে গ্রহণ করিয়াছেন। ফ্রোবেলের জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী পাঠ করিতে করিতে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়, হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, তাঁহাকে একজন যথার্থ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস জন্মে এবং প্রাণে স্বতঃই তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়।

## "কিণ্ডারগার্টেন" শব্দের ব্যুৎপত্তি।

জার্ম্মান ভাষার "কিণ্ড্" শব্দের অর্থ শিশু, তাহার বহুবচনে "কিণ্ডার" হয়। "গার্টেন" শব্দ ইংরাজী "গার্ডেন" শব্দের সমার্থবাচক, ইহার অর্থ উদ্যান। অতএব "কিণ্ডারগার্টেন" শব্দের অর্থ শিশুগণের উদ্যান বা শিশূদ্যান। শিশুবিদ্যালয়ের সহিত একটী ফলপুষ্পের উদ্যান সংলগ্ন থাকিবে ইহাই ফ্রোবেলের অভিমত ছিল এবং তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংস্রবেও এরূপ উদ্যান ছিল। সেই অর্থে তিনি আংশিক-রূপে "কিণ্ডারগার্টেন" শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু আলঙ্কারিক অর্থেই এই কথাটী অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত বলিয়া আমার ধারণা। সহৃদয়, শিশুপ্রকৃতিদর্শী ফ্রোবেল স্বপ্রবর্ত্তিত শিশুবিদ্যালয়কে যেমন পূর্ব্বপ্রচলিত কঠোর শিক্ষাপ্রণালীর সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করত, তন্মধ্যে একটী কোমল, স্বচ্ছন্দ, নূতন শিক্ষানীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি "স্কুল" নামের বিভীষিকাময়ী স্মৃতি হইতেও ইহাকে প্রমুক্ত করিয়া, শিশুপ্রকৃতির উপযোগী কোমল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ফ্রোবেল বৃক্ষজীবনের সহিত শিশুজীবনের তুলনা

করিতেন। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়; সেই অঙ্কুর সূর্য্যকিরণ, জল, বায়ু প্রভৃতি শোষণ করত, পত্রাবলী শোভিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের আকার ধারণ করে এবং সেই বৃক্ষশিশুই স্বীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ করত ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, ফুলে ফলে পরিশোভিত হইয়া অবশেষে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। মানবশিশুও আপনার অভ্যন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের বীজ লইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। বাহ্য জগতের সংস্পর্শে সেই বীজ হইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুর উদ্গত হয়। জনক জননীর স্নেহের মৃদু মধুর পবন-হিল্লোলে; সোদর সোদরার আদর যত্নের শীতল বারি সিঞ্চনে; আত্মীয় স্বজনের শুভাকাঙ্ক্ষার সুস্নিগ্ধ আলোকে সেই মনুষ্যত্বের অঙ্কুর স্বীয় অভ্যন্তরস্থ শক্তি বিকাশ করত ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সুশিক্ষার গুণে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মে সুশোভিত হইয়া পরিণত জীবনে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে। বৃক্ষশিশু বৃক্ষ বাটিকায় সযত্নে লালিত পালিত হয়। কোমল-প্রকৃতি মানবশিশু যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবে সেই বিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষাপ্রণালী শিশুর অভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল হইবে, ইহাই ফ্রোবেলের অভিমত। এই জন্যই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত শিশু বিদ্যালয়কে "কিণ্ডারগার্টেন" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুবিদ্যালয়ে তিনি যে প্রণালীতে শিক্ষা দান করিতেন, তাহাই পাশ্চাত্য জগতে "কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী" নামে সুবিদিত।

## ফ্রোবেলের শিক্ষানীতির মূলসূত্র।

ফ্রোবেল তাঁহার অভিনব শিশুশিক্ষা প্রণালীটী শিশু-প্রকৃতির কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিশু-প্রকৃতির বিশিষ্ট পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা দ্বারা তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে



উপনীত হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার শিক্ষানীতির মূলসূত্র। যথাক্রমে সেই মূলসূত্র গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। শিশুর শরীর ও শ্রমপ্রবণতা। শিশু সুকোমল দেহ লইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। তাহার দেহের রচনাকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে শ্রমেই ইহার পরিপুষ্টি, শ্রমেই ইহার বিকাশ এবং আজীবন পরিশ্রম দ্বারাই তাহাকে জীবনমাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যে সুচতুর শিল্পী সূক্ষ্ম কৌশলে এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানবদেহের মুকুল রচনা করিয়াছেন, তিনি আবার তাহাকে পূর্ণবিকশিত করিবার জন্য তদভ্যন্তরে গূঢ় শ্রমশক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি জননীর স্তন্যপান হইতে আরম্ভ করিয়া, স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালন ও বিবিধ বাল্যক্রীড়ার মধ্য দিয়া এই শ্রমপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে স্বকীয় জীবন ধারণ ও সামাজিক কল্যাণ সাধনোপযোগী শ্রমশীলতায় অভ্যস্ত হইয়া, পরিণত বয়সে পূর্ণ শারীরিক বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

২। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও কার্য্যতঃ এতদুভয়কে কোন প্রকারে পৃথক করা যায় না। প্রত্যুত একটীর সহিত অন্যটী অপরিহার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। শারীরবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ মনোবৃত্তি বিকাশের অপরিহার্য্য উপায়। আবার মনোবৃত্তি নিচয়ের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও তজ্জনিত আনন্দ না হইলে শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য সংরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

৩। শিশুর ইন্দ্রিয়-বিকাশ। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই বাহ্য জগতস্থ বিবিধ পদার্থের সংস্রবে শিশুর ইন্দ্রিয়-বিকাশ আরম্ভ হয়। বোধ হয় মাতৃস্তন্যের আস্বাদনই তাহার সর্ব্ব প্রথম ইন্দ্রিয়বোধ। ক্রমে ক্রমে এই

প্রণালীতে তাহার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন স্ফুটতর হইতে থাকে এবং তাহার ফলে সে জড়জগৎ সম্বন্ধে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। মনোবৃত্তিনিচয় ইন্দ্রিয়পথে বাহ্যজগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের জ্ঞান লাভ করিয়া বিকশিত হইয়া থাকে। অতএব মনোবৃত্তির পূর্ণবিকাশ যথাযথ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

৪। সৌন্দর্য্যবোধ। এইরূপে শিশুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের শক্তি বিকশিত হইলে সে যেন এক সজীব, সুন্দর, আনন্দোচ্ছ্বসিত, রহস্যপরিপূর্ণ জগতে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। বৃক্ষলতার বিচিত্র সজ্জা, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের বিচিত্র গঠনভঙ্গী ও ভাবগতি, চন্দ্রতারকার অপূর্ব্ব শোভা, ফলসমূহের বিভিন্ন রস ও বিবিধবর্ণ, পুষ্পরাজির বিচিত্র গন্ধ তাহার সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধকে জাগরিত করিয়া দেয় এবং তাহার বিস্ময় বিমুগ্ধ অস্ফুট মনোমধ্যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করে।

৫। কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা। সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত হইলে তাহা শিশুর মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। সে তখন মনে মনে এবং আত্মীয় স্বজনকে প্রশ্ন করিয়া তাহার ধারণার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব ও যাবতীয় ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকে। একটী হইতে আর একটী, তাহা হইতে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে করিতে বস্তু বা ঘটনার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা নির্ণয় করিতে থাকে। স্নেহশীল জনক জননী এবং প্রীতিশীল, সহিষ্ণু শিক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন যে শিশুর সেই স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা-প্রসূত প্রশ্নাবলীর অন্ত নাই।

৬। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। ঈদৃশ প্রশ্নাবলীর সদুত্তর দানের ভার পার্থিব পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি অর্পণ করিয়া প্রকৃতিমাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। শিশু যাহাতে স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বনে, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় অন্তরোত্থিত প্রশ্নাবলীর প্রকৃত উত্তর লাভ



করিতে পারে, তজ্জন্য প্রকৃতি তাহার অন্তরে পর্য্যবেক্ষণশক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে নীরবে আপনা-আপনি বিবিধ বস্তুর স্বরূপ ও বিধিধ ঘটনার প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিতে থাকে। শিশু আপন ক্রীড়াপুত্তলিকাটী ভঙ্গ করত তাহার গঠন-সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করে এবং ভগ্ন অংশগুলি পুনরায় সংযুক্ত করিয়া দিবার প্রয়াস পায়। ফলটীকে উদ্ভিন্ন করিয়া, ফুলটীকে ছিন্ন করিয়া, কুকুর শাবকটীকে বলপূর্ব্বক মুখব্যাদান করাইয়া শিশু স্মিতবদনে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তন্মধ্যে সৃষ্টিবৈচিত্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে, তাহাদের আদি কারণের অনুসন্ধান করে।

৭। কর্ম্মপ্রবণতা ও ক্রীড়াশীলতা। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা শিশু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র প্রকৃতি তাহাকে তদীয় অন্তর্নিহিত অনুকরণ শক্তির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহার সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করিবার শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। সে তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে অনবরত ক্রীড়ার আকারে কার্য্যে পরিণত করিতে থাকে। তাহার অন্তর মধ্যে ক্রিয়াশীলতার, সজীবতার, উদ্যমশীলতার এক উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। তাহা হইতে অবিশ্রান্ত প্রবাহে শক্তি নিঃসৃত হইয়া শিশুজীবনে বিচিত্র ক্রীড়ার সৃষ্টি করিতে থাকে। বাস্তব জীবনের প্রকৃত কার্য্যগুলিকে, জনসমাজের প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তুনিচয়কে অনুকরণদ্বারা ক্রীড়াগৃহে প্রতিনিয়ত তাহাদের শৈশব সংস্করণে পরিণত করায় শিশুর মহা আনন্দ। ছুটাছুটী, কোলাহল, স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ শিশু জীবনের নিত্যসঙ্গী। সজীবতা শিশুপ্রকৃতির নিগূঢ় শক্তি। আবার যদি প্রকৃতির মুক্ত বায়ু ও প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, দেখা যাইবে, সে সেখানেও একাকী স্বীয় অভ্যন্তরস্থ কার্য্যকরী শক্তির বিকাশোপযোগী বিবিধ ক্রীড়ার উদ্ভাবন করিয়া তুলিয়াছে। হয়ত সংবাদ পত্র

হইতে ছবি কাটিয়া তুলিতেছে; কাগজ দিয়া নৌকা, ঘোড়া-নৌকা, দোয়াত, আরসি, টুপি, গাধার টুপি (১) প্রভৃতি খেলনা প্রস্তুত করিতেছে; নতুবা কয়লা দিয়া সমগ্র গৃহতলে "আঁচড় কাটিয়া" গৃহস্থের ঋণ বর্দ্ধিত করিবার পন্থা সুগম করিয়া তুলিতেছে! বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির চক্ষে সেই বহুসংখ্যক চিত্রের সকল গুলিই প্রায় এক প্রকার প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহাদের ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে সেই অপূর্ব্ব চিত্রাবলীর কোনটী "কুকুর" কোনটী "বিড়াল" কোনটী "পাখী" কোনটী বা "গাছ" আখ্যা পাইতেছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট শিশুর সেই অঙ্কনবিদ্যার রূঢ় প্রকাশ অতি তুচ্ছ বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেগুলির মাহাত্ম্য তাহার নিজের নিকট অসীম। কারণ সে ঐকান্তিক অনুরাগ, চেষ্টা ও যত্নে, তাহার আভ্যন্তরীণ মনোবৃত্তিসমূহ হইতে এইগুলি বহির্গত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করে। শিশুর যে অন্তর্নিহিত কর্ম্মপ্রবণতা এইরূপে শৈশব-ক্রীড়ানিচয়ের সৃষ্টি করে, তাহাই পরিণামে বিভিন্ন শ্রমবিভাগের বিবিধ শিল্পজাত, চিত্র বা স্থপতি-কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাস্তব মানবজীবনের ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়।

৮। নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তি। শিশুর অন্তরে দয়া, স্নেহ, ভক্তি, বাধ্যতা, বিনয়, সৌজন্য, ক্ষমা প্রভৃতি নৈতিক ও সমাজিক বৃত্তি সমূহের বীজ নিহিত আছে। শিশু অন্ধ ভিখারীর কাতরকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ক্ষণকালের জন্য সজল নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ক্ষুদ্র সরলা বালা বস্ত্রপ্রার্থী দীন দুঃখীকে স্বীয় ক্রীড়াগৃহ হইতে পুত্তলিকার পরিধেয় ক্ষুদ্র চীরখণ্ড আনয়ন করিয়া সকরুণ নয়নে প্রদান করে। ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্ব্বল

(১) এটীর সহিত শিশুর বিলক্ষণ পরিচয় আছে। হয়ত প্রাচীন প্রণালীর শিক্ষা বিষয়ে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু পণ্ডিত মহাশয়ের শাসনে এই নির্ব্বোধ অধম পশু বিশেষের উপযোগী শিরোভূষণটীর সহিত, তাহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতাও হইয়া গেছে।



বালক সবল বালক কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে অন্যান্য বালকগণ দুর্ব্বলের পক্ষাবলম্বন করত অত্যাচারীর তীব্র প্রতিবাদ করে। সমপাঠীর রোগশয্যার শিরোদেশে উপবিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র বালক তাহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে শিশুগণের মুখশ্রী উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং সাধু-কার্য্যের জয় ও পুরস্কার, অসাধু আচরণের পরাজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করত তাহারা পরম সন্তোষ প্রকাশ করে। এই সকল ঘটনা দ্বারা শিশুর স্বভাবজাত নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তি স্ফুরণের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৯। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে শিশুর অন্তরে পর্য্যবেক্ষণশক্তি নিহিত আছে। এই শক্তিপ্রণোদিত হইয়া সে জীবনের উষাকাল হইতেই বস্তু ও ঘটনা সমূহের নিম্নে সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বের অন্বেষণ করে। শিশু স্বীয় আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রবণতা হইতে প্রতিদিন শিশুজনোচিত অসংখ্য কর্ম্মের সৃষ্টি করিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ঐ সকল কার্য্যের স্রষ্টা বলিয়া উপলব্ধি করে। তাহার পর সে তুলনা করিয়া দেখে যে গৃহমধ্যে পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, আত্মীয়স্বজন তাহারই ন্যায় অনবরত বিচিত্র কার্য্যের সৃষ্টি করিতেছেন। সে গৃহ-বহির্ভাগে যেখানে যায় যেখানেও দেখিতে পায় পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারী সকলে তাহারই ন্যায় নিয়ত অসংখ্য কার্য্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষণ করত সে মনে মনে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। শিশু তাহার এই বিশ্বাস, এই চিন্তা, জ্ঞানীর ন্যায়, দার্শনিকের ন্যায় যুক্তিবিচার দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না, ইহা তাহার অন্তর মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে। অতঃপর যখন তাহার মন ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলীর উপর ছড়াইয়া পড়ে; যখন সে ঝটিকা বৃষ্টির প্রবল শক্তি,

বজ্রপাতের ভীষণ রব, নদীর সফেন সশব্দ উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, কুসুম কলিকার মৃদু বিকাশ ও ফলরাজির ক্রমবর্দ্ধন, আকাশ প্রান্ত হইতে জবাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ তরুণ অরুণের উত্থান ও চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বাহ্যজগতের বিশালতা তাহার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন তাহার বিশ্বাস হয়, যে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর অন্তরালে একজন "খুব প্রকাণ্ড" বুদ্ধিমান ব্যক্তি লুক্কায়িত থাকিয়া, এই সকল দৃশ্য ও ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিতেছেন। পিতামাতাকে তখন সে জিজ্ঞাসা করে, "গাছ কে তৈয়ার করিল?" "সূর্য্য কোথা হইতে হইল?" "আকাশে এত বৃষ্টি কে করিল?" ইত্যাদি। শিশুর এবম্বিধ প্রশ্নাবলীর অন্ত নাই। পরিণত মানব এই চিরসজীব, চিরসুন্দর, চির-নবীন বিশাল বিশ্বমধ্যে এক জীবন্ত, জ্ঞানময়, অসীম শক্তি অনুভব করিয়া যে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হন এবং ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া সেই শক্তির সহিত আপন ও সমগ্র মানবজাতির নিগূঢ় সম্বন্ধ উপলব্ধি করত তদীয় মঙ্গল ইচ্ছায় জীবন পরিচালিত করেন, শিশুর অস্ফুট স্রষ্টাবিশ্বাসই তাহার প্রথম সোপান। ফ্রোবেল তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া কোথাও কোন কথা কহেন নাই। যাঁহারা তৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, যে সেগুলির প্রতি অধ্যায়ই গভীর ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার হৃদয়নিঃসৃত মধুর ভক্তিতে অনুরঞ্জিত। ফ্রোবেলের মত এই যে সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান দর্শন, কাব্য সাহিত্য, শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষা ধর্ম্মভাবের বিকাশে পরিণতি ও কৃতার্থতা লাভ করে।

১০। ঐক্য ও সামঞ্জস্যতত্ত্ব। তত্ত্বদর্শী ফ্রোবেল এই বিশাল বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ মধ্যে এক অখণ্ড নিগূঢ় শক্তি এবং সৃষ্টিকার্য্য মধ্যে একই অটল নিয়ম দর্শন করিয়াছিলেন। "স্থলে, জলে, নভতলে,



বনে উপবনে, নদী নদে, গিরিগুহা পারাবারে,"—জড়ে ও চেতনে তিনি নিগূঢ় একতা ও সুন্দর সামঞ্জস্য উপলব্ধি করত অতি চমৎকাররূপে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ভিদ্, প্রাণী ও মানবের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিণতির একই নিয়ম, একই প্রক্রিয়া এবং এ সকলের সোপান পরম্পরা অভিব্যক্তি তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ফ্রোবেল দেখাইয়াছেন যে মানবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে; বুদ্ধি, চিন্তা, হৃদয়বৃত্তি ও কার্য্যকরীশক্তির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। তিনি দেখাইয়াছেন, যে মানবের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে; ইহাদের একটীকে পরিহার করত আর একটীর শিক্ষা হইতে পারে না। কলিকা যেরূপ পুষ্পে ও পুষ্প ফলে পরিণত হয়, তদ্রূপ শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা যথাক্রমে একটী আর একটীর পরিণতি মাত্র। এজন্য তিনি শৈশব-শিক্ষাকেই সমগ্র মানবজীবনের শিক্ষার ভিত্তি করিয়াছেন। (১) ফ্রোবেল অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের অপরিহার্য্য ঐক্য বন্ধন প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য তিনি দৃশ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যের, জড়কে পরিত্যাগ করিয়া মনের শিক্ষা একেবারেই অসম্ভব বলিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য নিগূঢ় যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ও তাঁহার মতে সাহিত্যে ও গণিতে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, শিল্পে ও বাণিজ্যে কাব্যে ও অর্থনীতিতে, সমাজবিজ্ঞানে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন বিরোধ

(১) ফ্রোবেল কহিয়াছেন "শিশুর প্রথম ছয় বৎসর আমাকে দাও, তাহার অবশিষ্ট জীবন কাহার হাতে থাকিবে তজ্জন্য আমি চিন্তিত নহি।"

নাই। এজন্য তিনি শিশুর শিক্ষার জন্য এমন একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার মধ্যে শিল্প ও শ্রমিক শিক্ষা এবং সাহিত্য, কাব্য, গণিত, ইতিহাস, সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির সামঞ্জস্য হইয়াছে। ফ্রোবেল মানবের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মধ্যে অপরিহার্য্য ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এজন্য তিনি স্বপ্রবর্ত্তিত শিশু-শিক্ষা প্রণালীটী এরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে তদ্বারা শিশুগণের একাধারে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ ও কার্য্যকরী শক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। তিনি সমগ্র জনসমাজের সহিত প্রতি ব্যক্তির, সমুদ্রের সহিত বারি বিন্দুর ন্যায় অভিন্ন সম্বন্ধ প্রদর্শন করি-করিয়াছেন এজন্য তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী, শিশুগণের পাঠশিক্ষা কালে এবং কার্য্য ও ক্রীড়াক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সদ্ভাব, সহানুভূতি, উপচিকীর্ষা ও সহযোগিতার বিকাশ সাধন করে। ফলত যাহাতে মানবের একাধারে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও অধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ বৃত্তিরই স্বতন্ত্র এবং সমঞ্জসীভূত অনুশীলন দ্বারা পরিণামে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ মনুষ্যত্বে উপনীত করিতে পারে, শিশুকালে তাহার সূত্রপাত করাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য।

## মূল সূত্রের প্রয়োগ।

মনোবিজ্ঞানের এই মূলসূত্র গুলির উপরে, শিশু প্রকৃতির এই মূল তত্ত্বসমূহের উপরে, প্রকৃতি ও মানবের এই চিরন্তন সম্বন্ধের উপরে ফ্রোবেল তাঁহার সমগ্র শিক্ষা প্রণালীটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে তিনি বিদ্যালয়ে এই সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

ফ্রোবেল দেখিয়াছিলেন যে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সহিত সংযুক্ত না



হইলে কোন প্রকার জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—পরোক্ষই থাকিয়া যায়। লব্ধ মানসিক ধারণাকে কার্য্যে পরিণত না করিলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা হয় না। তিনি কহিয়াছেন, যে সর্ব্বপ্রকার সত্য মনোমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায় যদি জীবনে তাহার প্রকাশ হইবার পন্থা না থাকে—যদি তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা না যায়। কোন সত্য, কোন জ্ঞানই মানবের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট হইবার নহে, যদি তাহা কার্য্যে প্রযুক্ত না হয়। এইজন্য ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ কার্য্যগত। তিনি শিশুদিগকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিতেন। শিশুগণ আপনাপনি কাজ করিবে, আপনাপনি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবে, স্বাবলম্বনে কর্ম্মশিক্ষা করিবে এবং তিনি পরিদর্শকরূপে প্রীতির সহিত তাহাদিগকে চালনা করিবেন, তাহাদিগকে সূত্র ধরাইয়া দিবেন, তাহাদিগের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিবেন এই তাঁহার শিক্ষারীতি ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহাতে মানবের শারীরিক ও আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সমঞ্জসীভূত পূর্ণবিকাশ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ। ফ্রোবেল শিশুগণের প্রতি বৃত্তির স্বতন্ত্র অনুশীলন, পুনশ্চ, সকলগুলির একযোগে অনুশীলন দ্বারা সেই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতেন। তিনি কার্য্যগত শিক্ষাদ্বারাই বৃত্তিসকলের বিকাশসাধন ও তাহাদিগের সামঞ্জস্য বিধান করিতেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই তত্ত্বের বিশিষ্ট আলোচনা করিবার অবসর নাই। এই তত্ত্বটী বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিলে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কোন্ কোন্ বিষয়ের মধ্য দিয়া ফ্রোবেল শিশুগণকে শিক্ষাদান করিতেন, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত আমি সংক্ষেপে এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিব।

১। ক্রীড়া। আমি এতৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বদেশে সাধারণ ধারণা এই যে ক্রীড়া শিশুগণের শিক্ষা লাভের একান্ত বিরোধী। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। শিশুপ্রকৃতির সম্যক দর্শন না থাকাতে, শরীর মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকাতেই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, বিগত শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে ক্রীড়ার প্রতি শিক্ষানেতৃগণের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ক্রীড়া এখনও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার বহির্দ্দেশেই অবস্থান করিতেছে। একমাত্র কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতেই ক্রীড়া বিদ্যালয় মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করত সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তুল্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রোবেল শিশুর ক্রীড়াপ্রবণতাকে ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, যে শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, শিশুর ক্ষুদ্র আধারে তাহারই একটী ক্ষুদ্র কণিকা ক্রীড়াপ্রবণতারূপে প্রকাশ পাইতেছে। সুশিক্ষা ও সুপরিচালনার গুণে ইহাই তাহার পরিণত জীবনে মহা কার্য্যশীলতায় বিকশিত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। ফ্রোবেল ক্রীড়াকে তিন দিক দিয়া দর্শন করিতেন। ক, খ, গ বন্ধনী দ্বারা যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করা যাউক।

(ক) শিশুগণের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধানে ক্রীড়ার উপকারিতা। সজীব সতেজ ক্রীড়াদ্বারা শিশুগণের দৈহিক মাংসপেশীসমূহ স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয় এবং প্রতি অবয়বে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। ক্রীড়া শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত করে; শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চালনক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়ার স্বচ্ছন্দতা সাধন করে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে বল সঞ্চার করিয়া থাকে। এই সকলের সামঞ্জস্যকেই আমরা স্বাস্থ্য কহিয়া থাকি। ক্রমশঃ

# ভীষ্ম।

অস্তোন্মুখ সূর্য্যকিরণে নানাচিত্রে ফলিত যেমন এক অভিনব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে সেইরূপ দ্বাপরের শেষাংশের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব লইয়া মহাকবির লেখনীতে এক অব্যক্ত মনোহর চিত্র-লেখা জাগিয়া উঠিয়াছে। মহাভারত সেই সৌন্দর্য্যের গগন, মহাকবি ব্যাস এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা।

মহাভারত পড়িতে পড়িতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের চিত্রের সহিত আর একটি সৌম্য সুন্দর ছবি আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে, অনেক সময় উহাদের ত্যাগ করিয়াও ইহাকে হৃদয়ে ধরিতে প্রাণ নাচিয়া ওঠে, শরীর রোমাঞ্চ হইয়া আসে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের কথা ধরি না, কেননা তিনি অনেকের নিকট অবতার বলিয়া গৃহীত, ভীষ্মের চক্ষে ও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার আরাধ্য দেবতা।

বিচারকের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড লইয়া চরিত্র-বিশ্লেষণ করা যায় না, তাহা করিলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দেশ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সহিত আমরা জীবনের কোন কার্য্যই পরিমাপ করিতে পারি না,—কেননা তাহা কবির (highest ideal) শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ভীষ্মের কৃতকার্য্যের সমস্ত গাথা বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক আসনে বসাইতে পারি না; কিন্তু তাহা হইলেও আমরা তাঁহার সহিত হৃদয়ের তার বাঁধিতে পারি, তাঁহার কার্য্য সমালোচনা করিয়া জীবনে অনেক নূতন জ্ঞানের সঞ্চয় করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীষ্মকে একাসনে বসাইতে পারি না বলিয়াই মনে করি না ভীষ্মচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক হীন; বরং আদর্শ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে ভীষ্মচরিত্রই অধিক মহীয়ান। এদিকে আবার যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠত্ব

দেখাইতে গিয়া কবিকে অনেক স্থলে তাঁহার অধিকার মধ্যে দৈব শক্তিকে লইয়া যাইতে হইয়াছে। হোমারকে Achiles এর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া অনেকস্থলে Deux mechiniæ'র সাহায্য লইতে হইয়াছিল। Æneid এ Achiles এর প্রাণ যখন শত্রুহস্তে শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে কবি তখন একখানি মেঘে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিলেন। মেঘাবৃত হইয়া Achiles বাঁচিয়া গেলেন। মহাকবি ব্যাস ও সেরূপ যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া অন্যরূপে deux mechiniæ'র সাহায্য লইতে হইয়াছে। ভীষ্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া কবিকে কোন অনৈসর্গিকমার্গ অবলম্বন করিতে হয় নাই। ভীষ্মের জীবন তাঁহার নিজচরিত্রবলেই সে সব কঠোর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ভীষ্মের চরিত্র সজীব, মানবের মতই তাঁহার হৃদয় শোকে দুঃখে আকর্ষিত হইয়াছিল; যুধিষ্ঠিরচরিত্রে ও মানবজীবনের ছায়া আছে, তবে কল্পনায় তাহা অধিক পুষ্ট। এজন্য সাধারণতঃ ভীষ্মচরিত্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা বেশী মনোমুগ্ধকারী। উভয় চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়াও আমাদের প্রাণ ভীষ্মের প্রতিই অধিক ধাবিত হয়, হৃদয় তাঁহার পূজার জন্য স্বতঃই অঞ্জলি দিতে ব্যগ্র হইয়া ওঠে।

সৌন্দর্য্যের উপাসকমাত্রেই বলিতে পারেন রুদ্র সৌন্দর্য্যের প্রশংসা আছে কিন্তু তাহার বড় আদর নাই। দুইটি ভিন্ন জাতীয় সৌন্দর্য্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যাহার সৌন্দর্য্য বড় তীব্র তাহা নিখুঁত হইলেও তাহার উপাসক বড় কম, কিন্তু অনেক সৌন্দর্য্য আছে যাহা তুলাদণ্ডে ধরিলে অনেক নামিয়া আসে, হয়ত সৌন্দর্য্যহিসাবে কিছু অপরিস্ফুট, লক্ষ্য করিলে দেখা যায় হয়ত তাহাতে অনেক বিরোধী উপাদানের সংঘর্ষণ হইয়াছে, তথাপি তাহাতে এমন একটা মনোমুগ্ধকারিতা আছে, মৃগাক্ষী না হইলেও তাহার আঁখিতে এমন এক সুষমা আছে, এরূপ অব্যক্ত মাধুরী আছে, যাহাতে প্রথমোক্ত সৌন্দর্য্য ফেলিয়া হৃদয় ইহারই



নিকট আকর্ষিত হয়, তাহাকেই পূজা করিতে ইচ্ছা করে। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ন্যায় ব্যক্তিগত কৃতকার্য্যে ও চরিত্রে এইরূপই এক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে, এমনি এক মাধুরী জাগিয়া আছে। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র ও তাঁহার কৃতকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মপুত্র বলিয়া সম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মস্তক নত করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে সর্ব্বোতোভাবে পূজা করিতে যাইলে সভাবতই আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। কিন্তু ভীষ্মচরিত্রে এমন একটি মাধুরী আছে, তাঁহার কৃতকার্য্যে এরূপ সুষমা আছে, যাহাতে তাঁহাকে মূর্ত্তিমান ক্ষাত্রধর্ম্ম, বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে, প্রেমভরে হৃদয় আপনা হইতেই তাঁহার উপাসনার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে ব্যগ্র হয়।

নিরপেক্ষ বিচারকালে প্রত্যেক ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন পরিমাপ ধরাই কর্ত্তব্য। ব্যাধকে পশুপক্ষী বধ করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, ব্যাধের তাহাই ধর্ম্ম, ইহাতে তাহার পাপ নাই। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তিনি নীতিশিক্ষা দিবেন, ধর্ম্মাচরণ করিবেন, মূর্খকে জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাইবেন। তাঁহার আদর্শ অতি উচ্চ; তাঁহার আশ্রম বড় কঠোর, তাঁহার জীবন মূর্ত্তিমান শান্তির প্রতিকৃতি। এজন্য কিরাত ও ব্রাহ্মণের আদর্শ বড় বিরোধমূলক। ট্রোজন যুদ্ধে পিতৃমাতৃহীন প্রেমময়ী পত্নী এনড্রমেকী যখন হেকটারের যুদ্ধ সজ্জায় ছলছল নেত্রে বলিতেছেন,—হেকটার তুমি যুদ্ধে যাইও না,—আমার পিতামাতা সকলি গিয়াছেন, আজ তোমার প্রেমে আমি সকল স্নেহের প্রতিবিম্ব পাইয়াছি, দাসীকে অনাথা করিও না,—পুত্রকন্যাকে পথের ভিখারী করিও না,—তখন যদি হেকটার স্নেহের মায়ায় প্রিয়ার কথায় তরবারি ফেলিয়া গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের বশীভূত হইতেন তাহা হইলে বীরের ধর্ম্মপালন হইত না, বীর হেকটার তাঁহার ধর্ম্মে পতিত হইতেন। দেশ

শক্রপদানত হইতে চলিয়াছে, শোকার্ত্তা 'নিয়োবীর' মত ট্রয় নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছে, এখানে স্বদেশের কর্ত্তব্যের নিকট সাংসারিক কর্ত্তব্য শুধু একটা ক্ষুদ্র স্বার্থ মাত্র, কাজেই দেশের জন্য হেক্টারকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইল। কেননা ইহাই বীরের নীতি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আদর্শক্ষত্রিয়চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে হইলে, তাঁহার কার্য্য ও চরিত্রের বিচার করিতে হইবে। ক্ষাত্রধর্ম্মের হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে অনেক সময়ে ভীষ্মকে যুধিষ্ঠিরাপেক্ষা অধিক বীর, পূর্ণ ক্ষত্রিয় বলিতে আমরা সঙ্কুচিত হই না। যুধিষ্ঠিরচরিত্রে আমরা ধর্ম্মের যে সকল উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, ভীষ্মচরিত্রে তাহার অভাব নাই, ক্ষত্রিয়োপযোগী যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা ভীষ্মচরিত্রের মেরুদণ্ড, যুধিষ্ঠিরচরিত্রে তাহার অনেক অভাবই আছে। সেজন্য সকল দিক দেখিয়া তুলনা করিতে যাইলে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভীষ্মচরিত্র তাঁহাদের বর্ণ ও ধর্ম্মের আদর্শে অধিকতর মহান্ বলিয়া প্রতীতি হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উভয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচনা করিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও তাহা সম্ভবে না।

যৌবনে মানবজীবনের প্রথম প্রভাত, সেই সময়েই তাহার জীবনে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে, যাহাতে জীবন আলোকিত হইয়া যায়, আবার সেই সময়েই বহু প্রলোভন আসিয়া যোটে যাহাতে জীবন আঁধার হইয়া যায়। প্রভাতের উষার ন্যায় মানবজীবন এই সন্ধিপথ হইতে এক বিভিন্নমার্গ অবলম্বন করে। মানবের ক্ষুদ্রতা, উন্নতা, নীচতা, উচ্চতা এই স্থানেই প্রথম বিকাশ পায়। কিশোর শান্তনুতনয়জীবনের এই প্রভাতকালে যখন যুবরাজপদে অভিষিক্ত, যখন একমাত্র রাজ্যাধিকারী গঙ্গার কুমারের সম্মুখে অখণ্ড একছত্র সিংহাসন অপেক্ষা করিতেছে, শত শত অনিন্দ্যরাজবালা যখন



তাঁহার ঈষৎ প্রেমকটাক্ষের জন্য লোলুপ, হাজার হাজার নরনারী যখন কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ রাজকুমারের অভিষেকের পথ চাহিয়া আছে, যখন রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে বরণের জন্য ফুলদূর্ব্বা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে, একদিন জীবনের সে ব্রাহ্ম ক্ষণে শান্তনুকুমার দেখিলেন সম্রাটের মুখমণ্ডল যেন কিছু মলিন, রাহুগ্রহণভীত পূর্ণচন্দ্র যেন কিছু বিকল, অনঙ্গফুলশরাঘাতে মহাঋষি যেন কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ অনুসন্ধান করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। যে ধীবরকন্যার রূপে মুগ্ধ শান্তনুরাজা তাহার পাণিগ্রহণে অধীর, তাহার পিতা ভীষ্ম বর্ত্তমানে তাহার কন্যাকে রাজমহিষী করিতে ইচ্ছুক নহে। সিংহাসনে ন্যায়ত ধর্ম্মত ভীষ্মেরই অধিকার, সে স্থলে তাহার কন্যার রাজমাতা হওয়ার আশা একবারেই নাই। অতএব শুধু শূন্যসার রাজমহিষী করিতে, বৃদ্ধ নৃপের করে তাহার রূপসী কন্যাদানে ধীবর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। পিতৃভক্ত পুত্রের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। বাল্যে ও কিশোরে শান্তনুকুমার জননীর স্নেহ আস্বাদন করেন নাই, পিতার স্নেহই বালকের জননীর অভাবমোচন করিয়াছিল। নিজের স্বার্থের বলিদানে পিতার সুখ তাঁহার বিচারে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। দেবব্রতের সম্মুখে পিতাই তাঁহার আদর্শ ধর্ম্ম। তিনি দ্বিধাশূন্যমনে চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, জীবনে তিনি চিরকুমার থাকিবেন, ধীবরকন্যাগর্ভজাত সন্তানই সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর হইবে। দেবব্রতের এ দেবোপম প্রতিজ্ঞায় ধীবর, বৃদ্ধ শান্তনুকরে কন্যাদান করিল। যুবরাজের এ অবিচলিত বাক্যে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; দেবব্রত যুবরাজপদ ত্যাগ করিলেন, দেবতারা তাঁহাকে ধর্ম্মসিংহাসনে অভিষেক করিলেন। জগতে সেই ক্ষণ হইতে দেবব্রত আদর্শ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে তিনি এ অলৌকিক স্বার্থত্যাগে 'ভীষ্ম' বলিয়া অভিহিত হইলেন। সংসারের ক্ষুদ্র পরিধি প্লাবিয়া তাঁহার চিত্ত বিশ্বজগতের অপরি-

মেয় কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মে ধাবিত হইল; ভীষ্মের জীবন তাহার আমিত্ব ভুলিয়া বিশ্বজনীন কর্ত্তব্যের এক অভিনব পথে পরিচালিত হইল।

বাল্যে ও কিশোরে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে ভীষ্মজীবন সেই একই কঠোর সংযমে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। পরিপূর্ণ নদের প্রবল জোয়ারে যখন উভয়কূল প্লাবিয়া নানা দিগ্দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায় জীবনের সে ভরা জোয়ারেও দেবব্রতজীবন ক্ষত্রিয়ের কঠোর সৌম্য আদর্শের একই খাতে বহিয়া গিয়াছে। তথাপি এ ক্ষত্রাতেজ-দীপ্ত দেবব্রতেও আমরা প্রধানত ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের দুইটি কঠোর কেন্দ্র দেখিতে পাই। অনেক সময় সংশয় হয় বুঝিবা ভীষ্ম-দেবব্রত তাঁহার উচ্চমার্গ হইতে স্খলিত হইয়াছেন, বীরহৃদয়ের মাংসপেশীও বুঝি বার্দ্ধক্যে কিছু শিথিল হইয়া আসিয়াছে। অক্ষপণলব্ধা আর্ত্তা দ্রৌপদী দুর্য্যোধনরাজের প্ররোচনায় দুঃশাসনহস্তে লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইয়া শ্রেষ্ঠক্ষত্রিয়রাজসভায় ছলছলনেত্রে যখন করুণাভিক্ষা করিতে-ছিলেন, সাধ্বী অনাথার করুণবিলাপে সেই পাপসভায় যখন অট্টহাসি উঠিতেছিল, কর্ণদ্রোণাচার্য্যের সহিত ভীষ্মের তরবারিও তখন কিরূপে কটিবদ্ধ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর্ত্তের রক্ষাই যাঁহাদের ধর্ম্ম, রমণীর স্তন্যপানে যাঁহাদের ধমনীতে বীররক্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই অসহায় রমণীর লজ্জা ও ধর্ম্ম, সম্মান ও সতীত্ব রক্ষায় যদি তূণ হইতে বাণ নিষ্কাষিত না হইল তাহা হইলে সে বীরত্বে প্রয়োজন? মনুষ্যধ্বংস বা স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র সৃষ্ট হয় নাই। এই স্থলেই আমাদের ভীষ্মের প্রতি শ্রদ্ধা ন্যূন হইয়া আসে, তাঁহার মহৎ ক্ষাত্রকর্ত্তব্য ও বীরধর্ম্ম যেন কিছু নিম্ন হইয়া যায়, তাঁহার জলন্ত দীপ্ত-কীর্ত্তি যেন ঘনমসিমাখা হইয়া ওঠে; মনে হয় জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই ধনবানের উপাসক; বিত্তপূজা বুঝি সকলেই করিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে আমরা একদেশদর্শী হইয়া কোন কথা বলিতে পারি না।



ওষধিদ্বারা রুদ্ধবীর্য্য ভীমার্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরের শপথে বদ্ধ; কাজেই তাঁহারা অগ্নিগর্ভশমীর মত নিশ্চল ছিলেন; ভীষ্মও বুঝিয়াছিলেন ক্ষত্রিয় যখন তাহার পণে বদ্ধ, তখন তাহার দানে কোন দাবী নাই; তাঁহাদের দ্রৌপদীতে কোন অধিকার নাই। দ্রৌপদী তখন দুর্য্যোধনাদির করতল-গত, শাস্ত্রত পণলব্ধধনে তাঁহাদেরই পূর্ণ অধিকার। এস্থলে ধর্ম্মত ন্যায়ত যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি দ্রৌপ-দীর দুঃখে আর্ত্ত হইয়াছিলেন, দুর্য্যোধনাদিকে সে নীচ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মত তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আপন লব্ধধনে আপন ইচ্ছানুযায়ী যথেচ্ছাচার করা যায়, তাহাতে অপরের বলিবার কি আছে? দ্রৌপদী তখন পাণ্ডবদের নহেন, তিনি তখন কুরুরাজের নিকট পণে বিক্রীত। ভীষ্মের উপদেশ গৃহীত হইল না দেখিয়া তিনি ত তাহাদের পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, ভীষ্ম পরিত্যাগ করিলে দুর্য্যোধনের বল ত অনেক হ্রাস হইয়া যাইত; ভীষ্মাদির বলই তাহার পাপাচরণের গৌণ সহায়। কিন্তু ভীষ্মও কঠোর শপথে বদ্ধ, তিনি কৌরবদের পরিত্যাগ করিতে অপারক; আমরণ তাঁহাকে দুর্য্যোধনাদিকে রক্ষা করিতেই হইবে। বয়স্থ আত্মীয় অসৎপথ অবলম্বী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই শুধু একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, ধীর মৃদু উপদেশে তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিলেই পূর্ণ কর্ত্তব্য সাধিত হইল; অন্তত যথোচিত চেষ্টাও কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। ভীষ্মও কার্য্যত তাহাই করিয়াছিলেন; দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণ-পর্ব্ব হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত তিনি কুরুরাজের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতসাধনে চেষ্টিত ছিলেন। তাহাদের পরিত্যাগের ইচ্ছা থাকিলেও তিনি তাহা পারেন নাই। সেজন্য ভীষ্ম নিজেই আক্ষেপ করিয়াছেন, পরীক্ষা কি কঠোর!

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে রাজন্যসমাজে লাঞ্ছিত পাঞ্চালীর সতীত্বই সম্ভ্রম

রক্ষা করিয়াছিল। সাধ্বীর ধর্ম্ম তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত তাঁহার জ্যোতি, তাঁহার আভা, তাঁহাকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, দীনের নাথ ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সতীর কেশাগ্র কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাঁহার ধর্ম্মই তাঁর বর্ম্ম হইয়াছিল। এ দ্যূত ক্রীড়া শুধু যুধিষ্ঠিরাদির সহিত অন্যান্য রাজন্য-বর্গের চরিত্রবিশ্লেষণের জন্য কবি আঁকিয়া যান নাই। ইহাতে মহাকবি প্রধানত সতীত্বের পূর্ণগর্ব্ব ও তাহার জ্যোতি স্ফুটতর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সাধ্বীর সতীত্বই তাহার প্রধান সহায়, দুঃখে ও শোকে, বিপদে ব্যসনে, ইহা অপ্রতিহত হইয়া অক্ষয়-কবচের ন্যায় রমণীকে রক্ষা করে, পাকা সোণার মত অগ্নিদাহেই ইহার লাবণ্য, ইহার দীপ্তি, অধিকতর জাগিয়া ওঠে।

উচ্চ ও নীচ, সৎ ও অসৎ, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই অবস্থার দাস। ভীষ্ম যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন সেরূপ ঘটনাচক্রে পড়িয়া সামর্থ্য অনুযায়ী, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, কার্য্যকারণবিবেচনা করিয়া আমাদের তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মহাকবি কেবল দেখাইয়াছেন, বীর ভীষ্ম কিরূপে এই জটিল সংঘাতের মধ্য দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; নীচ সহবাসে তাঁহারও বিমলচরিত্রে যে কোন কালিমার রেখা পড়ে নাই তাহা বলি না, মেঘাচ্ছন্ন হইলে নীলাকাশও মসিমাখা হইয়া যায়, কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য, মুহূর্ত্তের পরই আবার তাহার নীলশান্তসৌম্যমূর্ত্তি আমাদের কাছে নূতন শোভায় ফুটিয়া ওঠে। ভীষ্মেরও তাহাই হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অতিপূর্ব্ব হইতেই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়দের ভীষ্মই যথার্থ পালনকর্ত্তা ছিলেন। তাহাদের রক্ষার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। পাণ্ডবেরা বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া যখন তাঁহাদের রাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন, তখন ভীষ্ম অন্যান্য অমাত্যের সহিত কুরুপতি



দুর্য্যোধনকে তাহা ফিরিয়া দিতে সর্ব্বতোভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজ্য ত দূরের কথা পঞ্চগ্রামও যখন ভিক্ষাস্বরূপ পাণ্ডবদের দান করিতে দুর্য্যোধন অস্বীকার করিলেন, তখন ভীষ্ম নানাপ্রকারে কুরুরাজকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। শেষে যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, তখন আর ভীষ্ম দুর্য্যোধনাদিকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এ যুদ্ধ লইয়া ভীষ্মচরিত্রে অনেকে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু কার্য্য ধরিয়া মানবচরিত্রের বিচার চলে না। তাহার অভিপ্রায়, তাহার মনোভাব না বুঝিয়া আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না। সেজন্য অনেকস্থলে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বিচারস্থলে অনেক সময় আমরা অবিচার করিয়া বসি, ভ্রমাত্মক ধারণা লইয়াই অনেকের উপর অতিদক্ষের মত আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া আসি। ভবে মানবজীবন এত জটীল, যে তাহার মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করা বড় দুরূহ। সে জন্যই আমরা সাধারণতঃ তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়াই তাহার উপর বিচার করি। কিন্তু যে স্থলে আমরা বাহ্যিক কার্য্যের সহিত অন্তরের মনোবৃত্তিরও ঘাতপ্রতিঘাত দেখিতে পাই, সেখানে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহার চেষ্টাকেই প্রধান স্থান দিব। মানব শত ইচ্ছা লইয়াও অনেক স্থলে তাহার ইচ্ছানুরূপ মনোবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না; কর্ত্তব্যের বাধা, স্নেহের বাধা, শাসনের বাধা, এইরূপ নানাবিপত্তিতে বদ্ধ হইয়া হয়ত এরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হয় যাহাতে হয়ত তাহার ইচ্ছাই নাই। ঘটনাচক্র এরূপ প্রবল যে, তাহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুতর কার্য্য করিতে হয় নিজের স্বভাববিরুদ্ধ। সেইজন্যই এ দুর্দিনে যখন জগৎ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিল, তাহার কুকার্য্যে দেবব্রতের বীরহৃদয়ও যখন তাহার প্রতি বিমুখ হইল, তখনও ভীষ্মের উন্নত কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহাকে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করিতে দিল

না। শান্তনুকুমার হইলেও ভীষ্মের সিংহাসনে আর কোন অধিকার নাই, তিনি দুর্য্যোধনের পূজনীয় হইলেও তাহার অন্নগ্রহণ করিতেছেন, বেতনভোগী না হইলেও তাঁহার আদেশেই কুরুসৈন্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে ; যে সম্রাটের সুখসম্পদে তিনি অনুগত ছিলেন, আজ এ প্রলয়ের কালে তিনি কেমন করিয়া তাহাদের পরিত্যাগ করিবেন? তিনি নিরপেক্ষও থাকিতে পারেন না ; দুর্য্যোধন, যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বভাগ হইতেই, উদ্যোগপর্ব্বের প্রথম অবধিই তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বপণ স্মরণ করিয়া কাজেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুযায়ী যাচকের ভিক্ষা তাঁহাকে পূরণ করিতেই হইবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরও তাঁহার কাছে নিরপরাধী ; পঞ্চপাণ্ডবও শতকৌরবের সহিত সমভাবে তাঁহার স্নেহে সম অধিকারী। সেজন্য ভীষ্ম তাঁহার কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিজেই করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ ধর্ম্মযুদ্ধে পাণ্ডবেরা অবশ্য জয়ী হইবে। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ। তিনি কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন? তিনি কুরুরাজের আহ্বানে অস্ত্রধারণ করিলেন, যুধিষ্ঠিরের নিকটও আপনার বিনাশবাণ দেখাইয়া দিলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন, প্রকাশ্যে তিনি ইহা বলিয়া দিলেন। নিরস্ত্রের ন্যায় ক্লীবের উপরও বীরের অস্ত্র পতিত হয় না। কুরুক্ষেত্রে সেনাপতি হইয়া তিনি পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে, আপন ধ্বংসেরও বোধন আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ ক্ষত্রবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইয়াও দুর্য্যোধনকে বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু লইয়াই যেন শান্তি স্থাপনা হইয়া যায়, অধর্ম্মের পণ লইয়া জ্ঞাতিরক্তে যেন মেদিনী আর কলুষিত না হয় ; সুখে দুঃখে সহায়, বাল্যে যৌবনে পালনকর্ত্তা ভীষ্ম তাহাকে এ উপরোধ করিতেছেন, মদে অন্ধ হইয়া আর বংশনাশ করিও না, শান্তি স্থাপনা কর, পাণ্ডবের প্রাপ্য তাহাদের ফিরাইয়া দাও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, অমূল্য জীবন বৃথা কারণে ক্ষয় করিও না ; এযুদ্ধে তোমরা সবংশে নাশ হইবে, ধৃতরাষ্ট্রের বংশ আর ইহজগতে কীর্ত্তিত হইবে না। ভাষা রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেহ স্পন্দনহীন হইতে চলিল, জীবনের শেষ কর্ত্তব্য পালন করিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত ভীষ্মের বদনমণ্ডল অধিকতর সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল; সংসারের পঙ্কিলে বদ্ধ থাকিয়া হৃদয়ের শুভ্রতা যাহা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই ইচ্ছাকৃত মরণে, এ ক্ষত্রিয়োচিত প্রায়শ্চিত্তে তাহা শুদ্ধ হইয়া আসিল। ভীষ্ম-আত্মা সংসারের কঠোর ভীষণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অমরত্ব লাভ করিল।



ভীষ্মজীবনে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম তাঁহার ধ্রুবতারা। তিনি সংসারে অবিচলিতভাবে তাহাই ধরিয়া চলিয়াছিলেন, তবে মেঘান্ধ-সমুদ্রে বিচক্ষণ নাবিকের ন্যায় তিনিও যে কখন লক্ষ্যহারা হন নাই তাহা বলি না, কিন্তু দুর্ব্বলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া বিক্ষত হইয়াও মানব যে জয়ী হইতে পারে, সংসারের কার্য্যে বদ্ধ থাকিয়াও মানব যে উচ্চ আদর্শে উঠিতে পারে, মহাকবি ব্যাস তাহাই ভীষ্মচরিত্রে আঁকিয়া তুলিয়াছেন। সেই জন্যই ভীষ্ম চরিত্র মানবসমাজে এত আদরণীয়, তাই পিতৃপুরুষের অঞ্জলি দিবার সময় মানব অগ্রে তাঁহারই তর্পণ করিয়া থাকে, মহাভারতপাঠান্তে তাই পাঠকমাত্রেই আপনা হইতে ভীষ্ম দেবব্রত উদ্দেশে সম্ভ্রমে মস্তক নত করে।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায়।

---

# সমালোচনার ধারা।

সম্পাদক মহাশয়, সবিনয় নিবেদন—

আমি মাঝে দিন কতক অজ্ঞাতবাসে ছিলাম, আপনারা বোধ হয় আমার নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু সম্প্রতি আমি সশরীরে * অমরাবতীধামে ফিরিয়াছি।

* ব্যাকরণদোষ ধরিবেন না—এসব আর্ষপ্রয়োগ।

বহুদিন পূর্ব্বে আপনাকে সমালোচনার জন্য একখানি পুস্তক পাঠাইয়াছিলাম, আপনি উত্তরে লিখিয়াছেন সমস্ত পুস্তকখানি পড়িয়া, তাহার বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। ইহাতেই বুঝিলাম মহাশয় জ্ঞানে প্রবীন হইয়াও একার্য্যে নিতান্তই নবীন,—অনভিজ্ঞ। সেই জন্য ভবিষ্যতে এ কার্য্য যাহাতে আপনার পক্ষে অতি সহজ হইয়া আসে এইজন্য এবং সাহিত্যের অমর লেখকবৃন্দের নামের তালিকায় নিজনাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। সমালোচনার জন্য গুটিকতক ধারা পাঠাই—পত্রস্থ করিবেন কি?

১ম ধারা।—সকলেই সমালোচক হইতে পারিবেন। অজাতশ্মশ্রু কিশোর হইতে শ্বেতগুম্ফকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত—সকলেই যথেচ্ছা সমালোচনা করিতে পারিবেন।

২য় ধারা।—যিনি যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সেই বিষয়ে তাঁহার সমালোচনা তত সুন্দর হইবে—কেন না সবটাই তাঁহার মৌলিক স্বাধীন মত, মৌলিকতার অভাব বলিয়া, কেহ আক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।—যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি কাব্যসমালোচনা করিবেন যিনি কবি তিনি বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যসমালোচনায় মন দিবেন; দার্শনিকের জ্যোতিষগ্রন্থসমালোচনা করিলেও মন্দ হইবে না—যিনি ঐতিহাসিক তিনি নাটকসমালোচনা করিবেন।

৩য় ধারা।—যিনি যে ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি সেই ভাষাসম্বন্ধে মৌলিক মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। স্থানে অস্থানে, ফরাসী, ল্যাটীন, গ্রীক্ প্রভৃতি ভাষা হইতে কোটেশন, কিম্বা দু একখানি পুস্তকের নাম করিতে পারিলে সমালোচনা আরও ঘোরালো হইবে।

৪র্থ ধারা।—সাহিত্যের সকল বিভাগেই যাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে—সমালোচকের পদ সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই প্রাপ্য। কেননা প্রতিশোধগ্রহণ-উপলক্ষে তাঁহার হৃদয়ের বহুদিন রুদ্ধ আবেগরাশি যখন জলন্ত অক্ষরে আপনার পত্রিকায় ফুটিয়া উঠিবে—তখন অচিরে আপনার পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা।"



৫ম ধারা।—সমালোচনা করিবার সর্ব্বাগ্রে এই কয়টী বিষয় লক্ষ্য রাখিতেই হইবে:—

(ক) সেই পুস্তক আপনাদের পত্রিকার বা খুব পরিচিত বন্ধুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে কি না?

(খ) আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যথারীতি বিজ্ঞাপন পান কি না?

(গ) সেই গ্রন্থকার আপনার কোন পুস্তক ও পত্রিকার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোনও কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন কি না?

(ঘ) সেই গ্রন্থকারের সঙ্গে আপনার, কিম্বা আপনার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবীর দূর আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত আছে কি না?

(ঙ) গ্রন্থকার প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যথারীতি আপনার অফিসে গমনাগমন করিয়া থাকেন কি না?

এই কয়টী বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকসম্বন্ধে অল্পাধিক ভালমন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। এই কয়টীর মধ্যে সবগুলিরই যদি অভাব থাকে তাহা হইলে পুস্তক যে অতি জঘন্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্জ্জিত বিধিঃ—কিন্তু এই কয়টী বিষয়ের অভাব হইলেও, যদি পুস্তকটী পড়িয়া আপনার গৃহিণী কিছু প্রীতি বোধ করেন, তাহা হইলেও সে পুস্তকসম্বন্ধে ভাল মন্তব্য প্রকাশ করিতেই হইবে।

৬ষ্ঠ ধারা।—সম্পাদককে সর্ব্বজ্ঞ হইতেই হইবে। অথচ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আজিকালিকার যুদ্ধে যেমন বাহুবল অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভূত অস্ত্র-শস্ত্র যন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বেশী। সমালোচনায়ও তেমনি পাণ্ডিত্যের কোনই প্রয়োজন নাই—তাহার অপেক্ষা

অযাচিত মুরুব্বিয়ানা, গাম্ভীর্য্য, সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ সমধিক কার্য্যকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদাহরণ।—"লেখক, কালে সুলেখক হইলেও হইতে পারেন।" "লেখার মধ্যে প্রাণটা একটু অসাড় হইয়া আছে" "লেখক নবীন, ইঁহার চেষ্টা প্রশংসনীয়" "বঙ্কিমের লেখার মাধুরী ইহাতে নাই বটে, তবু যেন 'কি-জানি-কেমন' একটা ভাব হৃদয় মুগ্ধ করে।" "লেখকের লেখা চিন্তাশীল বটে, কিন্তু যেন একটা মৌলিকতার অভাব—তাহা আমরা বারান্তরে দেখাইব"—কিন্তু হায়! বারান্তর!—ইত্যাদি।

৭ম ধারা।—লেখক কি কোনও রাজা বা মহারাজা কিনা অন্তত লেখক কি কোনও রাজা মহারাজা বা জমীদারের দাওয়ান বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—পুস্তকসমালোচনার আগে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

উদাহরণ।—কবিতাগ্রন্থ লিখিলে বলিবেন—ইহার ছন্দে ছন্দে মা রসস্বতীর নূপুরনিক্কণ শুনা যায়। গল্প লিখিলে বলিবেন—ইহাতে আর্য্যঋষিগণের সাত্ত্বিকভাব, পাশ্চাত্য রাজসিক ভাব প্রবাহ, কার্লাইলের মনস্বিতা, ফ্যারাডে নিউটনের বৈজ্ঞানিকতা, মলিয়রের রসিকতা, বঙ্কিমরবির কবিত্ব মিলিত হইয়া এক অমানুষী প্রতিভা সৃজন করিয়াছে। ভাল সমালোচনার কিছু না পাইলেও বলিবেন, ইহার ছাপা সুন্দর, কাগজ চমৎকার, লেখক তরুণ বয়স্ক, আমরা সুরঞ্জিত সগুণ মলাট হইতে নির্গুণ পুস্তকের ভিতর দিয়া এক অপূর্ব্ব বৈদান্তিক সত্যে উপনীত হইয়াছি।

ইহার জন্য কোনও প্রকার লোকলজ্জা, সত্যমিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন না। কেননা আত্মানং সততং রক্ষেৎ ইত্যাদি।

৮ম ধারা।—যদি রঙ্গালয়ে কোনও অভিনয় সমালোচনার জন্য আহূত হয়েন তাহা হইলে যথারীতি free pass পান কিনা সে বিষয়



লক্ষ্য রাখিয়া অভিনয়ের ভাল মন্দ বিচার করিবেন—অভিনয় দেখিয়া নহে।

৯ম ধারা।—কোনও সমালোচ্য পুস্তক আপনার বিদ্যাবুদ্ধির বোধগম্য না হইলে—যদি লেখক নবীন হয়েন, তবে পুস্তকের ভাব ভাষা সবই জটিল বলিয়া প্রাণ ভরিয়া গালি দিবেন।

বর্জ্জিত বিধি।—কিন্তু লেখক সর্ব্বজনমান্য প্রবীণ হইলে তাঁহার গ্রন্থ না পড়িয়াই গভীর দার্শনিক ভাবপরিপূর্ণ বলিতেই হইবে—নহিলে আশঙ্কার সম্ভাবনা।

কোন ও বিখ্যাত কবির কাব্যরস যদি উপলব্ধির শক্তি না থাকে ত প্রাণ ভরিয়া গালি দিলে মন্দ হয় না, কেননা তাহাতে স্বাধীনচেতা ও উচিতবক্তা ইত্যাদি খ্যাতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

১০ম ধারা।—অন্যান্য মাসিক পত্রিকা সমালোচনার সময় এই কয়টী বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। যথা—

(ক) অন্যান্য পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা আপনার অপেক্ষা অধিক হইতেছে কিনা? আপনার পত্রিকা অপেক্ষা তাহা অধিকতর সারবান কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে নির্দ্দয়ভাবে সে পত্রিকা আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে কিছু গ্রাহক কমিতে পারে।

(খ) আপনার পত্রিকার কোনও লেখক, অপর পত্রিকায় কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেই তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া গালি দিবেন। তাহাতে সে সব লেখক ক্রমশ ছাড়িয়া আসিতে পারে।

(গ) অপর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিভাবান লেখকদিগের লেখা একেবারে উপেক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে আপনার বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতা সম্বন্ধে অনেকের আস্থা জন্মিতে পারে। সমালোচনাটা খুব জোরালো এবং ঝাঁঝালো হয়।

(ঘ) অপর পত্রিকায় প্রকাশিত সুকবিতা হইলেও তাহাকে অস-

স্বদ্ধ প্রলাপ, 'কাপি' ইত্যাদি বলিবেন—ঐতিহাসিক প্রবন্ধমাত্রকেই মৌলিকতার অভাব দিবেন, দার্শনিক প্রবন্ধমাত্রকেই জটিল বলিবেন—মৌলিক গল্প হইলেও তাহাতে বিলাতী কোনও পত্রিকা হইতে অনূদিত তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবেন—মৌলিক পুরাতত্ত্ব বিষয় কেহ লিখিলেও তাহা Asiatic Research পত্রিকা হইতে গৃহীত এরূপ আভাষ দিবেন। লেখক যদি তাহার পর চড়াও হয়েন ত নীরব রহিবেন। পরসংখ্যায় "নীচ যদি উচ্চভাষে" ইত্যাদি সন্নীতিমূলক প্রবাদের উল্লেখ করিয়া তাহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন। স্পষ্ট কিছু কদাচ বলিবেন না। ইহা করিলে নিজ পত্রিকার অজস্র ত্রুটী সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন থাকিলেও বেশ চলিয়া যাইবে।

(ঙ) সমালোচনা পুস্তক ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আপনার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বন্ধুবর্গের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাই আপনার স্বাধীন মত বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না, তাহাতে দুইটী সুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা:—

১ম। বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও পরের জ্ঞানসাহায্যে আপনার জ্ঞানের আড়ম্বর দেখান হইবে।

২য়। গোপনে আপনার সমালোচনার জন কতক সমর্থক থাকিয়া যাইবেন।

আপনাকে অনেক advice gratis দিলাম আজ আর নয়।*

শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।

---

* লেখকের অপ্রকাশিত সাহিত্য কোড্ হইতে এক পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত হইল।
শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর। (পুস্তক যন্ত্রস্থ—Watch the date).

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩১১। ৮ম সংখ্যা।

## সৎমা।

(কৃষ্ণচন্দ্রের কাহিনী)।

১

কি আমার অদৃষ্ট জানিনা—আমি যখন যে কাজে হাত দিয়াছি তাহাতেই বিপরীত ফল ফলিয়াছে। সমস্ত জীবনে আমি কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিলাম না।

শৈশবে পিতৃহীন হই, কিন্তু জননী ছিলেন, সে দুঃখ বড় বুঝিতে পারিতাম না। খেলা ধুলা করিয়া, শাকান্ন আহার করিয়া এক রকম আনন্দে কাটাইয়া দিতাম।

ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম খেলা ধুলাতেও আমি সুবিধা করিতে পারিতেছি না। আমি যে দলে থাকিতাম সেই দলেরই হার হইত। যে দল খেজুর রস বা আম্র চুরিতে আমার সাহায্য গ্রহণ করিত সেই দলই ধরা পড়িত। তাহারা ধরা পড়িত শুধু নামে—প্রহার লাভ আমার ভাগ্যেই ঘটিত।

খেজুরের রসপূর্ণ ভাণ্ডে লোষ্ট্রাঘাত করিয়া পতমান রসলহরী প্রভাতের স্বর্ণ কিরণে কিরূপ ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে আমি তাহাই তন্ময় হইয়া দেখিতাম।

লগুড়াঘাত ব্যতীত অধিকাংশ সময়ে আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিত না। চৈতন্য লাভ হইলে দেখিতাম, আমার সহচরবৃন্দ রসপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। বিরস বদনে আমায় গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিত। তাহাদের আচরণ দেখিয়া দুঃখে ও বিরক্তিতে আমার চক্ষে জল আসিত। আমার কি অপরাধ যে তাহারা শুধু রস খাইবে আর আমি মার খাইব?

কিছুকাল স্বাধীনতা উপভোগের পরেই মাতৃদেবী বুঝিলেন পুত্রকে এরূপ ভাবে সুখভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং দশম বর্ষে আমি গুরু মহাশয়ের বেত্রচালনাতৎপর হস্তে সমর্পিত হইলাম। বলা বাহুল্য এখানেও আমার সুবিধা হইল না। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা যেন বিভিন্ন গঠনের দশম পংক্তি বিস্তার করিয়া আমায় বিভীষিকা দেখাইত—তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে আমার সাহস হইত না কিন্তু শিকারীর কশাতাড়নে ভীত অনিচ্ছুক অশ্বকেও যেমন অগত্যা আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতে হয় আমাকেও অগত্যা সেইরূপ গুরুমহাশয়ের বেত্রতাড়নে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু দুই কারণে আমার মৃদু গতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল—প্রথমত যুক্তাক্ষরের সুদৃঢ় ব্যূহদ্বারে আসিয়া আমাকে হতাশ হইতে হইল—দ্বিতীয়ত আমার এই গতির চালনীশক্তিরূপা জননী দেহ ত্যাগ করিলেন। তখন আমার বয়স দ্বাদশ বৎসর।

জননীকে হারাইয়া আমার দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি কিছুকালের জন্য যেন একেবারে বিলুপ্ত হইল। আমি সর্ব্বদা জননীর



ছিন্ন কন্থার উপর শূন্য হৃদয়ে পড়িয়া থাকিতাম। কাহারও দয়া হইলে উঠাইয়া আমায় আহার করাইত—কোন দিন অনশনেই কাটিয়া যাইত। এইরূপে এক মাস গেল।

২

আমাদের গ্রামে এক চক্রবর্ত্তী খুড়ো ছিলেন আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার নাকি যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। চক্রবর্ত্তী গৃহিণীও আমায় একটু স্নেহ করিতেন—কখনও দুঃখ করিয়া বলিতেন "আহা ভাল মানুষের আর কাল নাই। ছোঁড়া নিতান্ত "গো-বেচারা," এর উপায় কি হইবে?

চক্রবর্ত্তী তিন দিনের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন, গৃহিণী তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন "কেষ্টার একটা উপায় করিতে হইবে, নহিলে বেচারা মারা যায়।"

দয়ার্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিলেন "আচ্ছা আমার সঙ্গে চলুক্। অধিকারীকে বলিয়া কহিয়া দলে ঢুকাইয়া দিব।"

চক্রবর্ত্তী কাটোয়ার "বড়াল কোম্পানির" যাত্রার দলের বেহালাদার। অধিকারীর নিকট ভাল "বাজিয়ে" বলিয়া তাঁহার একটু সমাদর ছিল। সুতরাং চক্রবর্ত্তী খুড়ো চেষ্টা করিলে যে আমার যাত্রার দলে প্রবেশ করা কঠিন হইবে না তাহা আমি বুঝিলাম।

যাত্রার দলটা আমার কাছে একটা স্বপ্ন রাজ্যের মত ছিল। গালপাট্টা দাড়ি পরিয়া ভীমসেন যখন চক্ষু রক্তবর্ণ ও দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া গদা চালনা করিত, অথবা নারদ যখন দীর্ঘশ্মশ্রু আন্দোলিত করিয়া মা যশোদাকে প্রবোধ দান করিত, তখন আমার কিছুতেই তাহাদিগকে আমার মত সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইত না—তাহাদের কোন মায়া রাজ্যের লোক বলিয়া মনে হইত, তাহারা যে আমাদের

মত আহার নিদ্রা পীড়া ও যাতনার বশীভূত তাহা আমার বিশ্বাস করিতে কোন মতেই প্রবৃত্তি হইত না।

সুতরাং আমি এক অপূর্ব্ব কৌতূহল ও বিপুল আগ্রহ লইয়া যাত্রার দলে প্রবেশ করিতে চলিলাম। আমার সহচর বৃন্দের মধ্যে অনেকেই আমার সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষা অনুভব করিতে লাগিল।

৩

কিন্তু যাত্রার দলে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরেই আমার সুখ-স্বপ্ন চিরতরে ভাঙিয়া গেল। যে রাজ্যকে স্বর্গের নন্দন বলিয়া মনে হইত তাহা দেখিতে দেখিতে আমার সম্মুখে নরকের বিভীষিকারূপে প্রকটিত হইল। সন্ধ্যার সময়ে চতুর্দ্দিকে এক বীভৎস দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইত। চারিদিকে নেশার ধুম লাগিয়া যাইত। কেহ গঞ্জিকার ধূমে দিঙমণ্ডল তিমিরাবৃত করিত, কেহ বা ভর্জ্জিত চণক সহযোগে তীব্র সুরা গলাধঃকরণ করিয়া দুর্গন্ধ ও বিকৃত মুখভঙ্গী সহযোগে পিশাচের অনুকরণ করিত, কেহ বা একান্তে বসিয়া সুদীর্ঘ নল সংযোগে অহিফেন ধুম পান করিয়া তন্ময় হইত—আমার ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যাইত।

নেশাখোরকে আমার বরাবর একটা ভয় ছিল। চতুর্দ্দিকে নেশার রাজত্ব দেখিয়া আমি প্রাণপণে চক্রবর্ত্তী খুড়াকে জড়াইয়া ধরিতাম। রাত্রি আটটার সময় নৃত্য গীত শিক্ষা আরম্ভ হইত। আমাদের নৃত্যগীতের যে শিক্ষক ছিল তাহাকে দেখিয়াই আমার ভয় হইত। তাহার নত প্রশস্ত নাসিকা, আরক্ত ঘূর্ণায়মান চক্ষু, শীর্ণ ঘনকৃষ্ণ দেহ ও দোলায়মান গুম্ফ দর্শন করিবামাত্র আমার অভ্যস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইত। কাজেই বেত্রাঘাত, চপেটা, পদতাড়ন নির্ব্বিচারে আমার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হইত। কোথাও নাচিতে একটু তাল কাটিয়া যাইত! কোথায় সুর একটু নীচু হইত—নিষ্ঠুর অনুযোগ



টিও উপেক্ষা করিত না—তাহার হুঙ্কার ও আস্ফালনে আমার প্লীহা পর্য্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিত। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত নিদ্রালস চক্ষুকে হুকষ্টে বিস্ফারিত রাখিয়া প্রত্যহ এই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। তাহার উপরে আবার যখন কোথাও যাত্রা করিতে যাইতাম তখন আর বেত্রদণ্ডের বিশ্রাম থাকিত না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে নিদ্রাজড়িত চক্ষে প্রায় উলঙ্গ দেহে রাখাল সখী সাজিয়া নৃত্য করিতে পৌষ রজনীর তুষার শীতল বায়ুস্পর্শে কম্পিত পদ যদি ঈষৎ স্খলিত হইত, অথবা বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত দেহে শুষ্ক কণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে যদি কণ্ঠস্বর একবার ভাঙিয়া যাইত তাহা হইলে সে দিন আর রক্ষা থাকিত না। সে দিন আহারে পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত হইত উপরন্তু রাত্রের আহার বন্ধ হইয়া যাইত। সমস্ত রাত্রি পৃষ্ঠ ও জঠরের যন্ত্রণাজনিত অনিদ্রায় ছটফট করিতাম। কিন্তু নিরাশ্রয় হতভাগ্য বালকের জন্য কাহার হৃদয় কাঁদিত!

শুধু ইহাই নহে। এতদ্ভিন্ন ছোকরাদের সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠগণের কাপড় কাচিতে ও তামাক সাজিতে হইত—এবং যিনি যাহা হুকুম করিতেন তাহাই তামিল করিতে হইত। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে মাঝে মাঝে খুড়াকে কাঁদিয়া বলিতাম "আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দাও" খুড়া হাসিয়া বলিতেন "দিন কতক পরে সব সহিয়া যাইবে।"

আমার সঙ্গী কেহ ছিল না। অন্যান্য ছোকরারা লুকাইয়া লুকাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠগণের অসাক্ষাতে তাহাদের তামাক, গাঁজা, গুলি ও মদ্যের অংশ চুরি করিয়া সেবন করিত, স্ত্রীলোক দেখিলে রঙ্গরহস্য করিত—তাহাদের সঙ্গে মিশিতে আমার সাহস হইত না। তাহারাও স্ফূর্ত্তিহানির ভয়ে আমায় চাহিত না। আমি অবকাশ পাইলেই নীরবে শুইয়া শুইয়া পরলোকগতা জননীকে ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতাম।

৪

এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু তবু এই অমানুষিক অত্যাচার আমার অভ্যস্ত হইল না। কষ্ট সমানই রহিয়া গেল। আমি কাহারও সহিত মিশিতে পারিলাম না। আমাদের অধিকারী একজন নবাব বিশেষ ছিলেন। আহার নিদ্রা, মাদক সেবন এই সকল প্রিয় কার্য্যেই তাঁহার দিবস অতিবাহিত হইত। কখনও কখনও আমাদের সঙ্গীত চর্য্যা পরিদর্শন করিতেন। অবশ্য সেদিন যে কর্ণ ও গণ্ডদেশ সমধিক আরক্ত হইয়া উঠিত এ কথা বলা বাহুল্য। আমার দুর্গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। কারণ অধিকারীর জবাকুসুমসঙ্কাশ চক্ষু দর্শন করিলে আমার তাল মান কিছুই মনে থাকিত না।

আমাদের আর এক কর্ত্তব্য ছিল। প্রতিদিন এক এক জন ছোকরার প্রতি অধিকারীর পরিচর্য্যাভার পড়িত। তাম্রকুটসজ্জা হইতে তৈলমর্দ্দন বায়ুবীজন, পাদনীড়ন সমস্তই এই পরিচর্য্যার অন্তর্গত ছিল। মাসের মধ্যে এই একদিন আমি প্রাণ হাতে করিয়া কাটাইতাম।

কিছুদিন হইতে আমার প্রতি অধিকারীর কেন এত কৃপা হইয়াছিল জানি না—প্রতি সপ্তাহে অধিকারী গৃহিণী (?) আমায় ডাকাইয়া আহার করাইতেন। অধিকারী যে সময়ে কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন ঠিক সেই সময়ে আমার আহারের ডাক পড়িত। আমি প্রাণ হাতে করিয়া দ্বিতলের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিতাম। আমার বুকের মধ্যে ভীতিকম্পন স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইত। অপরিচিত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার শৈশব হইতে কেমন একটা সঙ্কোচ ও ভীতির ভাব ছিল। আমি ছোট বেলায় একবার আমার এক প্রতিবেশীর মুখে তাহার অলক্ষিতে শুনিয়াছিলাম "মাগো, সাক্ষাৎ রাক্ষুসী গো সাক্ষাৎ রাক্ষুসী, বছর ফিরতে



না ফিরতে একেবারে আমার সোণার চাঁদ বাছাকে চুষে খেয়ে ফেল্লে"। সেই অবধি আমার কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেক রাক্ষসী ছদ্মবেশে বসবাস করিয়া থাকে। তাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আমার বড় একটা সাহস হইত না।

অধিকারী-গৃহিণীকে দেখিয়া আমার শৈশবের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার স্থূল খর্ব্ব ঘনকৃষ্ণ বিশালোদর দেহ এবং ঘূর্ণায়মান আরক্ত লোচনযুগশোভি বিস্তৃত নাসাগহ্বর ও বিকটদশনযুক্ত বদনশোভা দেখিয়া তাহাকে কিছুতেই আমার মানুষী বলিয়া মনে হইত না।

এতদ্ভিন্ন আমায় দেখিলে তাহার চক্ষুতটে কেমন একটা আমিষদর্শনকারী মার্জ্জারসুলভ লালসাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিত, দেখিয়া আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। কোনক্রমে খাদ্যসামগ্রী দ্রুতবেগে গলাধঃকরণ করিয়া আমি ছুটিয়া নীচে চলিয়া আসিতাম। অন্যান্য ছোকরারা আমায় দেখিয়া কত কি কাণাকাণি করিত ও মৃদু মৃদু হাসিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমার বক্ষঃস্পন্দন নীরব হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিত।

ক্রমশ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# জাতীয় সঙ্গীত।

নবীনচন্দ্র—Rule Britania rule the waves! বাঙলায় ঠিক বজায় রাখ্‌তে পাচ্চিনে। হুঁ, হুঁ, হয়েছে :—শাসন করহে ভারত ঢেউ। ঠিক হোলোনা—মন্দও হয়নি।

পরাণচন্দ্র (প্রবেশ করিয়া) কি হে নবীন কি হচ্চে?

নবীন—তাড়াতাড়ি একটা জাতীয় সঙ্গীত রচনা কচ্চি।

পরাণ—তাড়াতাড়ি কেন ?

নবীন—চট্‌কোরে যখন দরকার হবে, তখন পাব কোথা ? আর দরকার তো প্রায় উপস্থিত।

পরাণ—কথাটা কি ?

নবীন—তুমি কি দেশের লোক নও ? রোজ খবরের কাগজে টেলিগ্রাম বেরুচ্চে, তুমি কি কিছুই জান না ?

পরাণ—কোন্ খবরটা, তা ঠিক বুঝতে পাচ্চিনে।

নবীন—হিঃ হিঃ হিঃ! জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে দিলে, তা জান না ?

পরাণ—তাতে তোমার জাতীয় সঙ্গীত রচনা করা কেন ?

নবীন—কেন ? এবার পূর্ব্ব হোতে সূর্য্য উদয় হলো। ভারত জেগে উঠ্‌লো। পশ্চিমের অধোগতি; ইংলণ্ডের বিনাশ। শাসন করহে ভারত ঢেউ।

পরাণ—পিছু হতে ডাকি আমরা ফেউ।

নবীন—চালাকি নাকি ?

পরাণ—চালাকি কিসের ? ফেউ যে বাঘকেও তাড়া করে।

নবীন—নাঃ, হচ্চে না। ঢেউ কথাটার মিল জুটছে না! হাঁ হাঁ—এবারে দিব্বি জুগিয়েছেঃ—ভারত শাসন কর তরঙ্গ।

পরাণ—কাঁধে নিয়ে ঝুলি—হাতে কড়ঙ্গ।

নবীন—দেখ পরাণ, আমরা সূর্য্য, জাপান চন্দ্র; আমাদের আলোকে জাপান আলোকিত। আমাদের দেশের ধর্ম্ম নিয়ে জাপানের ধর্ম্ম। আমাদের সম্পদের ছায়াটুকু নিয়ে জাপানের সৌভাগ্য।

পরাণ—তবে কেন শ্রীরাধার বগলে ছেঁড়া কাঁথা ?

নবীন—তুমি ভারত সৌভাগ্য বোঝ না। দক্ষিণে সাগর—



পরাণ—থামো, হয়েছে। সাগরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? আমাদের জাহাজে পা দেওয়া মহাপাপ।

নবীন—হলই বা! বিদেশে যাবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা ঘরে বোসে বড় হয়েছি, ঘরে বোসেই বড় হব।

পরাণ—এবার উন্নতির মাত্রা চড়িয়ে দেওয়া যাক; বোসে বোসে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধোরে গেল। এবারে শয়ন—(পরাণের তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে শয়ন)

নবীন—সময় নষ্ট হচ্চে। "অসভ্য জাপান জাগিল এখন—

পরাণ—সুসভ্য ভারত করিল শয়ন।

নবীন—উঁহু অন্য রকম ভাব এসে পড়্‌ছে। (চিন্তা করিয়া) ঢেউটাই থাক—

শাসন কর হে ভারত ঢেউ
এদেশেতে দাস হবে না কেউ।

শুন্‌ছ পরাণ ?

পরাণ—(পাশ ফিরিয়া শুইয়া)—চমৎকার হচ্চে। ফেউটাও রাখো; বরং আর একটা ঢেউ জুড়ে দেও।

নবীন—(কর্ণপাত না করিয়া স্বগত) ইংরাজীর ঐ দুটো লাইনই শোনো ছিল; পরাণকে জিজ্ঞাসা কোরে নেওয়া কিছু নয়। আচ্ছা অন্যভাব লাগিয়ে দি :—

সজোরে আমরা করিরে গমন—

(নেপথ্যে—ওগো বাবু মশাই—)

ওহে পরাণ, একবার চুপি চুপি দেখে আয়তো লোকটা কে ?

পরাণ—(তথা করণ এবং ফিরিয়া আসিয়া) মিউনিসিপালিটির টেক্সের পেয়েদা রাঙা কাগজ নিয়ে এসেছে।

নবীন—যা, তুই বল্‌গে যা, যে এবাড়ীতে কেউ থাকে না;

আমি ভাড়ার খোঁজে এসেছিলুম, তা লোকজন না দেখে ফিরে যাচ্চি।

পরাণ—আমি বরং বলিগে যে বাড়ীর বাবু পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে গেছেন।

নবীন—কচ্চিস্ কি, ওই এল যে—ঘরে ঢুক্‌লো বুঝি; কি জাত্ তার—ঠিকানা নেই। আমি এই পথ দিয়ে পালাই।

পরাণ—ঠিক্ হয়েছে—"সজোরে আমরা করিরে গমন।" তার পর কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

# সাময়িক-প্রসঙ্গ।

## লিটন বনাম কর্জ্জন।

লিটনের স্বদেশ যাত্রাকালে ভারতবর্ষের সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে বিকট তাণ্ডব নৃত্য লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহারা হাঁপ ছাড়িয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, এতদিনে আমাদের দুঃখ কষ্টের অবসান হইল। পদ্মার উদ্বেল বারিরাশি বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেরূপ উদ্দাম তরঙ্গে ছুটিতে থাকে, তাঁহাদের নিরুদ্ধ চিত্তবেগ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া তদ্রূপ উচ্ছলিত হইয়াছিল, লিটনের সাধের প্রেস এক্ট তাহা রোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। লিটনের উপর বীতরাগের কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। তিনি সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন, বৃটিশজাতি চিরকাল ভারতবাসীকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছে। যথার্থ বৃটিশ সন্তানের ন্যায় স্বীয় কার্য্যকলাপের দ্বারা তিনি এই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কাজে কথায় মিল রাখিয়াছেন এই তাঁহার



গুরুতর দোষ—দারুণ দুর্ব্বলতা। চিরদিন ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতার আলোচনা করিয়া আমাদের মনোবৃত্তি নিচয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। শাসকের শ্রীমুখ-নিসৃত একটী মধুর বাণী আমাদের কর্ণে অমৃতের প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়, তাঁহার কার্য্যের শত কঠোরতা চক্ষে প্রতিভাত হয় না।

লিটনের বিরুদ্ধবাদীরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখান, তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা প্রজাশক্তির খর্ব্বতা-বিধায়ক এবং দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বোধ হয় তাঁহারা ভুলিয়া যান, সকল দেশে সকল সময়ে সবল দুর্ব্বলের স্বত্বধ্বংশের প্রয়াস পাইয়াছে, এ কথারও প্রমাণ ইতিহাসেই আছে। ঐ প্রজাশক্তি লইয়া তাঁহারা অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা করেন, হাওয়ার সহিত লড়াই করিয়া থাকেন। তাঁহারা জোর করিয়া কল্পনা করেন যে, ইংরাজ যেমন রাজার সহিত কলহ বিবাদ করিয়া তাহার স্বত্ব, অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছে, তাঁহারাও আন্দোলনের উচ্চরবে গগন বিদীর্ণ করিয়া রাজার সহিত একটা বোঝা পড়া করিয়া লইবেন। এই হেতু রাজপ্রতিনিধি বিশেষের আগমন ও বিদায় লইয়া অধিক বাক্‌যুদ্ধ ঘটে। কর্জ্জন সাহেব আবার আসিতেছেন শুনিয়া অনেকের চিত্তচাঞ্চল্য দৃষ্ট হইতেছে কোন কোন অঞ্চলে অবসাদের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই মনগড়া কষ্টের কোন কারণ দেখা যায় না।

ভারত শাসনে ইংরেজের যে একটা অপরিবর্ত্তনশীল নীতি প্রজার হাস্য-অশ্রু তুল্য উপেক্ষা করিয়া মন্থরগমনে স্বীয় গন্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছে এ কথাটা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

লিটনের শাসনকালের প্রধান ঘটনা দিল্লী দরবার, কাবুল অভিযান ও ভারনাকিউলার প্রেস এক্ট। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা অনুমান করেন এইগুলি কালের বিশাল আলেখ্যে তাঁহার নাম চিরমসীময় করিয়া

রাখিয়াছে। দিল্লী দরবার লিটনের রাজত্বের এমন কি তাঁহার জীবনের অতি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার দুহিতৃরচিত জীবন বৃত্তান্ত ইহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

সাধারণের চক্ষে দিল্লী দরবারের কোনই সার্থকতা ছিল না। রাজনীতির হিসাবে ইহার আবশ্যকতা তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই।

কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত শাসনভার গ্রহণকালে দেশীয় রাজাদিগের সহিত কোম্পানির যে সকল সন্ধিবন্ধন ছিল, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা স্বীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। সে সময় আরও বিধি-বদ্ধ হয় যে ভারতবর্ষের যে অংশ ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে ন্যস্ত হইবে সে সমগ্র ভূখণ্ডে তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তখনও বহু ভারতীয় নৃপতি হীনবল হইয়াও পুরুষানুক্রমিক সন্ধি অনুযায়ী বৃটনের মিত্ররাজ স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশ সমূহ প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজের শাসনাধীন ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের ইহা বড়ই অন্তরায়। প্রবীণ সাম্রাজ্যবাদীর চক্ষে এই ব্যবস্থা সঙ্গত বোধ হইল না। লিটনের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ইহার প্রতিকারের একটী অদ্ভুত খেয়াল উঠিল। ডালহৌসির পররাজ্য-গ্রাসিনী নীতি লিটনের কূটমন্ত্রে উৎসবের রঙিল পরিচ্ছেদে ভূষিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে নামিয়া আসিল। শোণিত রঞ্জিত রণক্ষেত্রে শ্মশানের চিতা শয্যায় শত যোদ্ধার অপঘাতে যাহা সম্পন্ন হইত, উৎসবের মঙ্গল নিক্কণে তাহা সাঙ্গ হইল। এই দুরূহ কার্য্যে লিটন বিলাতের বড় মন্ত্রী ডিজরেলি বা বিকন্সফিল্ডের সহায়তা পাইয়াছিলেন। উভয়েই এক ধর্ম্মের উপাসক, উভয়ের চিন্তা, সাধনা এক। ডিজরেলি সাম্রাজ্যবাদের জনয়িতা। এই দুরাকাঙ্ক্ষ য়িহুদি জগতে স্বীয় মাতৃভূমির প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়াছেন। লিটন যোগ্য গুরুর যোগ্য চেলা। ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজ্যের সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রচার করাই যে দিল্লী দরবারের মুখ্য উদ্দেশ্য



লিটনের পত্রাংশ হইতেই তাহার উপলব্ধি হয়। ভারতের রাজাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ডিজরেলিকে লিখিয়াছিলেন—Here is great feudal aristocracy which we can not get rid of, which we are avowedly anxious to conciliate and command but which we have as yet done next to nothing to rally round the British crown as its feudal lord.

কবিসুলভ কল্পনাবলে ভাবী দরবারের মনোজ্ঞ ছবি আঁকিয়া লাট-কবি লিটন সাম্রাজ্যবাদীকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন ভারতের লোকগুলা ভাব প্রবণ ও আড়ম্বরপ্রিয়, ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহারা আসল তত্ত্বটা বড় বুঝে না। একটা আমোদের কাঠাম খাড়া করিতে পারিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। গুরুদেব শিষ্যের বুদ্ধির তারিপ করিয়া তাঁহার মতে সায় দিলেন। দরবারের আয়োজন চলিতে লাগিল। এদিকে বিলাতে বড় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ইংলণ্ডের রাণী ভারত-ঈশ্বরী (Empress of India) উপাধি লইলে ভারত শাসন মহাসভার করায়ত্ত থাকে না। ইংলণ্ডের রাজারাণী বিধি নিয়মের দ্বারা চালিত, সম্রাট যথেচ্ছাচারী। আরও একটা প্রশ্ন উঠিল রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত ঈশ্বরী হইলে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না? কথাটার উপর গ্লাডষ্টোন বড় ঝোঁক দিলেন। গ্লাডষ্টোনের বাগ্মীতায় ভীত হইয়া চটুল বিকন্সফিল্ড প্রকাশ করিলেন উপস্থিত ব্যাপারে সে সব কোন ঝঞ্ঝাট নাই। রাণী মহারাণী (Empress) সমানার্থবাচক। ভারতবর্ষের রাজাদিগের সম্মতিক্রমেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

সার্থকতাবিহীন, নিরর্থক একটা ভূয়া উপাধির প্রয়োজনতা কি বিকন্সফিল্ড সে কথার কোন স্পষ্ট জবাব দিলেন না। গরজ এমনই বালাই। পরের কথা লইয়া সময় ক্ষেপণ করা মহাসভার সভ্যেরা

পছন্দ করেন না, সুতরাং কথাটার শীঘ্রই উপসংহার হইল। দরবারের স্থান নির্ণয়ে লিটনের ভাবানুগৃহীতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। যে ঐতিহাসিক দিল্লী নগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন যে স্থানে মহারাজ পৃথ্বিরাজের সার্ব্বভৌমিত্ব ঘোষিত হইয়াছিল, যেখানে ময়ুর-তক্তে বসিয়া মোগল বাদসাহগণ আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থান যে বৃটিশ গৌরব ঘোষণার যোগ্যস্থল, সূক্ষ্মদর্শী লিটন তাহা বুঝিয়াছিলেন, তজ্জন্যই বৃটিশ ভারতের মহিমাময়ী রাজধানী ত্যাগ করিয়া দিল্লীর ঐতিহাসিক ভস্ম-স্তূপে দরবারের সূচনা করিয়াছিলেন। দরবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তাঁহার মুন্সিয়ানা বড় কম প্রকাশ হয় নাই। বলি-উদ্দেশে আনীত ছাগশিশুর ন্যায় সমাগত নৃপতিবৃন্দের লিটন যথেষ্ট খাতির যত্ন করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, বক্তৃতায় যথারীতি মহারাণীর ঘোষণা পত্রের উল্লেখ করিয়া ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার আভাস দিয়া, সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এক্ষণে কর্জ্জনের দরবারের কথা বলা যাক্। দরবারের জন্য লিটনকে ঘটনার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, কর্জ্জনের বেলা কার্য্য পরম্পরায় ঘটনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। লিটনের দরবার প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদ, কর্জ্জনের দরবার সাম্রাজ্যবাদের বিজয়ঘোষণা। মূলে অভিন্ন, কোন তারতম্য নাই। লিটন যাহা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কর্জ্জন তাহা সদর্পে সম্পন্ন করিয়াছেন। একে যাহা political stratagem অন্যে তাহা bold measure. ভারতের রাজাদের যে status ও political rights লইয়া লিটনের আমলে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল, কর্জ্জনের হাতীর মিছিলের পদতলে তাহা কি নিঃশব্দে পদ দলিত হইয়াছে!



প্রথম দরবারে লিটন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতশাসনে রাজা বা রাজপ্রতিনিধির ইচ্ছাই আইন কানুন, মহাসভার মধ্যবর্ত্তিতার কোন আবশ্যকতা নাই, বৃটিশ রাজই ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। উৎসবের অবসানে তিনি ভারতেশ্বরীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার মনোভাব কতকটা অনুমিত হয়। দরবার-গৃহে নজর প্রদান কালে মহারাজ সিন্ধিয়া ভারতেশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "সাহেনসা বাদসাহ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, ভগবৎ সমীপে আমাদের প্রার্থনা ভারবর্ষে আপনার রাজ্য দৃঢ় হউক।" লিটন বাহাদুর সিন্ধিয়ার বাক্যের ভাষ্য করিয়া যাহা মহারাণীকে লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিব—His (Scindia's) words have special significance which is recognised through out India. The word used by the Scindia to recognise your Majesty's position in reference to himself and other Princes, is a word which the Princes of India had hitherto-fore been careful to avoid using. For it signifies in original the power of issuing absolute order which must be obeyed.

কর্জ্জন দরবারের মূল বিষয়ে লিটনের পদবী অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বৃদ্ধ কবি লিটনের জীর্ণ কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছিল। নিপুণ শিল্পী যেমন অপরিস্ফুট অকিঞ্চিৎকর চিত্র অলোকে ও ছায়াপাতে উদ্ভাসিত করে, তিনি লিটনের কাজ-চলা দরবারকে বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে সম্প্রদায় রাজ প্রতিনিধির একটুকু স্মিত হাস্য, একটুকু কৃপা কটাক্ষের ভিখারী, রাজসূয় যজ্ঞের নায়কের নিকট তাঁহারা কতটুকু সম্মানের দাবী করিতে পারেন? তাঁহার বক্তৃতায় বৃটিশ-গৌরব-দ্যোতক বাগাড়ম্বর

থাকিলেও মহারাণীর ঘোষণা পত্রের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠার কারণ এই যে তাঁহারা ঐ ঘোষণা পত্রকে রাজনীতির Magna carta স্বরূপ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, যাহা কিছু বাকযুদ্ধ ঐ ঘোষণা পত্র লইয়া। একটুকু বুঝিয়া দেখিলে সে উৎকণ্ঠা আশঙ্কার কোন কারণ দেখা যায় না। তাঁহাদের রাজনীতির মুখ্য আধার—সে সাধের ঘোষণা পত্র ইতিপূর্ব্বেই সলিস্-বারি political hypocrisy বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

লিটনের কাবুল অভিযান ও কর্জ্জনের তিব্বত মিসন একই উদ্দেশে প্রণোদিত। উভয়েই বিভিন্ন স্থানে দিব্যকর্ণে রুষঋক্ষের কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন।

কর্জ্জনের সিক্রেট এক্ট লিটনের প্রেস এক্টের পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, একে যাহা সাম্প্রদায়িক ছিল, অন্যে তাহা সার্ব্বজনীন হইয়াছে।

লিটন যে কথাটা ঠারে ঠোরে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কর্জ্জন বাহাদুর সে কথা সেদিন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—We do not require Perliamentary interference in governing India.

কিন্তু আন্দোলনকারীদিগের চক্ষু ফুটিবে কি?

শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী।

(খ) শিশুগণের মানসিক বৃত্তি সমূহের অনুশীলনে ক্রীড়ার উপকারিতা। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে শিশুগণের স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, সতেজ ক্রীড়া দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের মনোযোগ, পর্য্যবেক্ষণ, বিচার, স্মৃতি, কল্পনা এবং অন্যান্য মনোবৃত্তি গুলির কীদৃশ অনুশীলন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তির সম্যক বিকাশ না হইলে মানব জীবনের কোন সোপানেই কোন প্রকার শিক্ষালাভ বা শিক্ষাপ্রদান সম্ভব হইতে পারে না। শিশুগণের স্বাভাবিক ক্রীড়াশীলতা উদ্দেশ্যহীন নহে। ক্রীড়াদ্বারা সহজেই তাহাদিগের মনোবৃত্তি বিকশিত হইয়া থাকে।

(গ) শিশুগণের নৈতিক শিক্ষায় ক্রীড়ার উপকারিতা। ক্রীড়া যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করে তাহা নহে, কিন্তু নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তি সমূহেরও বিকাশ সাধন করিয়া থাকে। ক্রীড়াক্ষেত্রেই—ক্রীড়ার মধ্য দিয়াই শিশুগণের প্রথম ন্যায়ান্যায় বোধ জন্মিয়া থাকে। ক্রীড়ার মধ্য দিয়াই তাহারা পরস্পরের ব্যবহার সমালোচনা করিতে শিখে, ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ করে, ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন ও অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করে। তদ্দ্বারা তাহাদের নৈতিক বিচারশক্তির যাদৃশ অনুশীলন হয়, নীতিজ্ঞান যাদৃশ পরিস্ফুট হয়, সহানুভূতি ও প্রীতি, সাহস ও উপচিকীর্ষা যাদৃশ জাগরিত হইয়া উঠে, নীতিবিজ্ঞানের শতসহস্র মৌখিক যুক্তি অথবা নীতিশাস্ত্রের মৌখিক উপদেশে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় কিনা সন্দেহ। ফ্রোবেল শিশুজীবনে ক্রীড়ার এই তিন প্রকার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, ইহাকে তাঁহার শিক্ষা প্রণালী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন।

ক্রীড়ার সহিত ড্রিলও (Drill) কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মধ্যে স্থান প্রাপ্ত

হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে শৃঙ্খলা ও শাসন, শিশুগণের সমবেত বাধ্যতা ও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা এবং তাহাদিগের সামাজিক বৃত্তি স্ফুরণের পক্ষে ড্রিল অত্যন্ত উপযোগী। পাশ্চাত্য প্রদেশীয় কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহে ড্রিলের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। বালকবালিকাভেদে উহা তথায় বিবিধ সুন্দর আকার পরিগ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য, উহাকে আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক।

২। Kindergarten Gifts বা শিশুশিক্ষার খেলনা।—"খেলার ছলে শিক্ষা" এ কথাটী অনেকেই শুনিয়া থাকেন। ফ্রোবেল শিশুগণের খেলনাপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া, তাহাদিগকে খেলার ছলে শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি সুন্দর খেলনা প্রস্তুত করেন। কিন্তু সে গুলিকে খেলনা না বলিয়া তিনি Gifts বা উপহার বলেন। বাস্তবিকই শিশুগণের প্রতি এগুলি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি উপহার। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণত লোকে এগুলিকে Kindergarten toys বলে। কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতাগণ ইহাদিগকে Frobel's Gifts বা ফ্রোবেলের উপহার কহিয়া থাকেন। ফ্রোবেল বহু বিবেচনা পূর্ব্বক, মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রানুসারে, জড়বিজ্ঞান ও গণিতের মৌলিক নিয়মানুসারে, তাহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিশুগণ এইগুলি লইয়া খেলা করিতে অত্যন্ত আমোদপ্রাপ্ত হয় এবং খেলা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে সহজে, গণিত, জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিখিয়া ফেলে। এই খেলনাগুলি দ্বারা শিশুগণের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয়ের অনুশীলন হয়, মনোযোগ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, বিচারশক্তি প্রখর হয় এবং তাহাদিগের বুদ্ধিকে বিজ্ঞানশিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলে।

৩। Kindergarten Occupations বা শিশুবিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী।—আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিশুগণের



অন্তরে ক্রিয়াশীলতার এক উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। তৎপ্রণোদিত হইয়া তাহারা অনবরত নির্ম্মাণ-চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকে। শিশুগণের সেই স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা, সেই নির্ম্মাণস্পৃহার অগ্নিতে যদি অনবরত ইন্ধন ক্ষেপণ করা না যায় তবে তাহা গৃহমধ্যে ও বিদ্যালয়ে অযথা প্রযুক্ত হইয়া এমন সকল কার্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকিবে যাহাকে আমরা অবিমিশ্র অনিষ্ট ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। এই স্বাভাবিক অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিবার জন্য ফ্রোবেল স্বপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী মধ্যে এমন কতকগুলি শিশুজনসুলভ কার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন যাহা প্রাপ্ত হইলে শিশুগণের আনন্দের সীমা থাকে না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমি সেই শৈশব কার্য্যাবলীর কয়েকটীর নামমাত্র উল্লেখ করিব। সে গুলির প্রক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। Stick laying বা শলাকা স্থাপন Ring laying বা বৃত্তস্থাপন; Tablet laying বা ফলকস্থাপন; Pea-work বা বীজ সংস্থাপন ও সংযোজন; Paper cutting বা কাগজ কর্ত্তন; paper folding বা কাগজ ভাঁজ করণ; Mat weaving বা শীতলপাটী বয়ন প্রণালী; Perforating বা কাগজে ছিদ্র করণ; Clay modelling বা মৃণ্ময় গঠন ইত্যাদি। (১) এই শিশুজনসুলভ কার্য্যাবলীর মধ্যে মানবসমাজের যাবতীয় শিল্পকার্য্যের মৌলিক নিয়মসকল নিহিত রহিয়াছে। শিশুগণ এইগুলিতে নিপুণতা লাভ করিলে ভবিষ্য জীবনে যে কোন শিল্পের মধ্যেই সহজে প্রবেশ এবং বিচক্ষণতার সহিত তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে পারে।

এইসকল কার্য্য কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে এরূপ মনোহর ভাবে শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে যে তদ্দ্বারা তাহারা ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম-

(১) কিণ্ডারগার্টেন খেলনা ও কার্য্যাবলীর সকলগুলি এদেশের উপযোগী হইবে না বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার কতিপয় মাত্র গ্রহণ করত অবশিষ্টগুলি বর্জ্জন করিয়াছেন।

নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া উঠে। কিণ্ডারগার্টেন কার্য্যাবলী যে কেবল শিশুগণের কার্য্যকরী শক্তি বিকাশ করে এমন নহে কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও সামাজিক বৃত্তি নিচয়েরও সম্যক বিকাশ সাধন করিয়া থাকে।

৪। অঙ্কন-বিদ্যা। এই বিষয়টীর শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বহু বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মানবজ্ঞানের এমন কোন বিভাগ নাই, মানবসমাজের এমন কোন কার্য্য নাই, এমন কোন ব্যবসায় নাই যাহাতে অঙ্কন-বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। তদ্ব্যতীত, শিশুগণের মনোবৃত্তি বিকাশের পক্ষে, তাহাদিগের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের পক্ষে এমন উপায়ও দ্বিতীয় নাই। ফ্রোবেল শিশুপ্রকৃতি মধ্যে এই অঙ্কন চেষ্টার মৃদু স্ফুরণ দর্শন করত ইহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবার জন্য কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মধ্যে অঙ্কন শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুগণকে প্রাথমিক অঙ্কন শিক্ষা দিবার রীতি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উদ্ভাবিত। অতি সহজ, সরল রেখা পাত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর জটিল অঙ্কনে উপনীত করাই এই রীতির উদ্দেশ্য। শিশুগণ প্রথমত "দাগা বুলান" হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে যে পরিমাণে তাহাদের ক্ষুদ্র হস্তগুলি শিক্ষিত ও নিয়মিত হইয়া উঠে, এবং মনোবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহারা স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বনে স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারে মুক্তহস্ত অঙ্কন অভ্যাস করে। অবশেষে এমনটী হইয়া দাঁড়ায় যে যাহা দেখিবে তাহাই অঙ্কন করিয়া দিতে পারিবে। (১) অঙ্কন শিক্ষা দ্বারা শিশুগণের দর্শন শক্তির অনুশীলন হয়, পর্য্যবেক্ষণশক্তি বিকাশ লাভ করে; চিত্তের সমাধান, সত্যচিন্তা ও সত্য কথনের অভ্যাস

(১) গবর্ণমেণ্ট নবপ্রবর্ত্তিত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে ফ্রোবেলের এই মৌলিক প্রণালী গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু আধুনিক মত ও রীত্যনুসারে শিশুগণকে অঙ্কন শিক্ষা দিবার আদেশ করিয়াছেন।



হয় এবং নীরব কর্ম্মনিষ্ঠার সাধনা হইয়া থাকে। অঙ্কন শিক্ষার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণের হস্তলিপিরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

৬। পদার্থশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিকপাঠ ( Object Lessons and Lessons on Elementary Science )—পদার্থশিক্ষা আরম্ভ করিয়া প্রথমত শিশুগণ—পদার্থনিচয়ের বিবিধ আকার ও বর্ণ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। বস্তুতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞান লাভ হইলে পর, তাহাদিগকে সহজ বৈজ্ঞানিক পাঠ প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিশুগণের বয়ঃক্রম ও বুদ্ধির বিকাশানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া, তাহাদিগকে সোপানপরম্পরায় উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতির স্থূল স্থূল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নানাবিধ ক্রীড়াসামগ্রী, চিত্রপট, মৃণ্ময়মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিবিধ উপকরণ অবলম্বনে এবং জীবনিবাস, বৃক্ষবাটিকা প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, শিশুজনবোধগম্য সহজ ভাষায়, প্রত্যক্ষ প্রণালীতে প্রাগুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৬। অভিনয় ও কর্ম্মসঙ্গীত। ( Action Songs ) ইহা শিক্ষা জগতে একটী অভিনব ও মনোহর বিষয়। প্রাগুক্তরূপে পদার্থতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক পাঠ শিক্ষা হইলে শিশুরা ভঙ্গীসহকারে খেলায় তাহার অভিনয় করিয়া থাকে এবং তৎসহিত কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত করিতে থাকে। যদি কোন শিশুপ্রিয় সহৃদয় ব্যক্তি কোন কিণ্ডারগার্টেনে উপস্থিত হইয়া শিশুদিগের এই অভিনয় দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তবে তিনি মুগ্ধ না হইয়া থাকিতেই পারিবেন না। তন্তশালা, মুদ্রাযন্ত্র, কাগজপ্রস্তুতের যন্ত্র, দীপশলাকার যন্ত্র; বস্ত্রবয়ন যন্ত্র, কাচপাত্র নির্ম্মাণাগার প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসিয়া শিশুগণ বিদ্যালয়ে অঙ্কন বিদ্যার সাহায্যে তৎসমুদায়ের আলোচনা করে এবং অভি-

নয় ও সঙ্গীতে বর্ণনা দ্বারা এই সকল তত্ত্বকে সজীব ও মনোহর করিয়া তুলে। এতদ্বারা বিবিধ বস্তু ও বিষয়ের তত্ত্ব তাহাদের মনে চির মুদ্রিত হইয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের একটী তত্ত্বের মধ্যে ইহার কারণ নিহিত আছে। ভাবের সহিত মিলিত হইলেই, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইলেই যে কোন তত্ত্ব হউক না কেন, তাহা জন্মের মত মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। একটী উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। বাল্যকালে বৃদ্ধ মাতামহের আদেশে তাঁহার নিকট বসিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিতাম। হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান কতবার পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ধারণাই হয় নাই। তৎপরে যখন একবার—একবার মাত্র হরিশ্চন্দ্র নাটকের যাত্রাভিনয় দেখিলাম,—যখন আলোকমালা-সমুজ্জ্বল নীল চন্দ্রাতপের নিম্নে, কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদশোভিত নানা বেশধারী অভিনেতৃগণের ভাবভঙ্গী ও সঙ্গীতবাদ্য সম্মিলিত অভিনয় দর্শনে পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, তখন হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানের সমগ্র শিক্ষা প্রাণে যেরূপ গাঢ় মুদ্রিত হইয়া গেল, এই প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইয়া আজ তাহা হৃদয়ে সেইরূপই বিদ্যমান দেখিতে পাইতেছি। সকলের সম্বন্ধেই এই নিয়ম। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সকল শিক্ষারই সামাজিক প্রণালী মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বটীর উপর, এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুগণের বিদ্যা-শিক্ষার নিয়মও এই প্রকার হওয়া উচিত ফ্রোবেল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিশুগণ অভিনয় ও সঙ্গীতে যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করে। তাহাদের নাট্যাভিনয় শিক্ষাবিষয়ে—বিজ্ঞান বিষয়ে নীতিবিষয়ে, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সহিত শিশুগণকে ভাব প্রকাশের (Art of Expression) শিক্ষা দেওয়া ফ্রোবেল অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি স্বপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী মধ্যে শিশুদিগের জন্য অভিনয় ও সঙ্গীতের অবতারণা করিয়াছিলেন।



৭। শিশুগণের কাহিনী শ্রবণ ও তাহার পুনরাবৃত্তি।—বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই বিষয়টীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি সন্দেহের অতীত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস এই, যে কাহিনী শ্রবণ বিষয়ে পিতামহীর অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের নিকট শিশুগণের উচ্চতর স্থান আছে। শিশুগণ অতিশয় কাহিনী প্রিয়। গল্প পাইলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। বাঘের গল্প, ভূতের গল্প, দেশভ্রমণের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, উপকথা—কিছুই তাহাদের নিকট উপেক্ষার বিষয় নহে। তাহাদের ধারণার উপযুক্ত হইলেই, তাহারা কথক মহাশয়কে ঘেরিয়া বসিয়া একমনে একধ্যানে গল্প শুনিতে থাকিবে। ইহাতে এই তথ্য বুঝা যায় যে শিশুগণের মনোযোগঅনুশীলন ও চিত্তসমাধানের পক্ষে গল্প একটী প্রধান উপায়। মনোযোগ ব্যতীত, চিত্তস্থৈর্য্যের অভ্যাস ব্যতীত শিশুগণকে কোনরূপ শিক্ষা দান করাই সম্ভবপর নহে। তদ্ব্যতীত, কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে স্মৃতি ও ধারণাশক্তি উন্মেষিত হইতে থাকে। শিশুগণের মনোযোগ মনোহর গল্পের মধ্যে স্বতঃই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী মনে করিয়া রাখিতে শিখে। ইহা হইতে পুনরাবৃত্তির বাসনা তাহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। অবশেষে তাহারা কাহিনী শ্রবণ ও তাহার পুনরাবৃত্তিতে এতাদৃশ অভ্যস্ত হইয়া উঠে যে তন্মধ্যে একটী মাত্রও প্রয়োজনীয় ঘটনা বিস্মৃত না হইয়া অবলীলাক্রমে পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে পারে। গল্পে তাহাদের মনোযোগ ও পুনরাবৃত্তির অভ্যাস পাঠের সময়েও কার্য্যকারী দেখা যায়। ইহাতে মনোযোগের এতাদৃশ সাধনা হয় যে অন্য সময়ে শিশু যখন পাঠ করিবে বা লিখিবে তখন তদ্গত চিত্তে তাহাই করিবে, অন্য কিছু করিবে না। পুনরাবৃত্তির অভ্যাস দ্বারা শিশুদিগের মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা জন্মে। অতঃপর যখন তাহারা ইতিহাসের পাঠ আরম্ভ করে, তখন আর স্বতন্ত্রভাবে, কৃত্রিম উপায়ে,

তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহারা পূর্ব্বাভ্যাসবশত আপনাপনিই ঐতিহাসিক পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারে; ইতিহাসের প্রয়োজনীয় ঘটনা অনায়াসে মনে করিয়া রাখিতে পারে; সে বিষয়ে অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারে এবং প্রবন্ধ রচনার পূর্ব্ব-শিক্ষা ব্যতীত আপনাপনি প্রবন্ধ রচনা করিতে পারে। অবশ্য রচনারীতির শিক্ষায় তাহার সম্পূর্ণতা সাধন হইয়া থাকে। সুকাহিনীর সৎকথার নৈতিক উপকারিতা যে কতদূর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বালকবালিকাগণের উপর সুকথার নৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে।

৮। লিখন, পঠন ও গণিত। প্রাগুক্ত প্রণালীর শিক্ষাদ্বারা যে পরিমাণে শিশুগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহাদিগকে লেখা পড়া ও গণিত শিখান হইয়া থাকে। এই প্রস্তাবে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিব যে কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ও গণিত শিখানর প্রণালী সম্পূর্ণরূপে মনোবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শিক্ষক সেই প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়াছেন তিনি পণ্ডিত হইলেও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবার অনুপযুক্ত। এই প্রণালীর শিক্ষা শিশুগণের পক্ষে অতিশয় মনোরম, তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক কোমল প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল এবং অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত প্রণালীর শিক্ষাপেক্ষা সহজসাধ্য।

৯। নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে শিশুগণকে কেবল মৌখিক নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হয় না অথবা শিশুগণের মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা দ্বারাও তাহার বিচার হয় না। ফ্রোবেল অন্যান্যবিষয়ের ন্যায় কার্য্য দ্বারাই শিশুগণকে নীতিশিক্ষা দিতেন। ইহাই তাঁহার নীতিশিক্ষার প্রণালী। অনুষ্ঠান দ্বারা, ব্যবহার দ্বারাই নৈতিক



গুণসমূহ জীবনে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, বাক্য বা বক্তৃতা দ্বারা নহে। সুতরাং শিশুদিগের চরিত্র গঠন করিয়া তুলা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপরেই নির্ভর করে। এবিষয়ে বিদ্যালয়ে এমন একটী "আবহাওয়ার" সঞ্চার করিয়া রাখা প্রয়োজন যাহার মধ্যে আসিয়া পড়িলেই শিশুগণ আপনাপনি সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারে অভ্যস্থ হইতে থাকিবে। ফ্রোবেল স্বীয় পবিত্র ও মধুর চরিত্রের প্রভাব শিশুগণের মনে ও জীবনে সঞ্চার করিতেন। তাঁহার চরিত্র উন্নত এবং হৃদয় ভগদ্ভক্তি ও মানবপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। শিশুগণের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ প্রীতি ছিল। সেই প্রীতির মধ্যদিয়াই তাঁহার দেবোপম চরিত্রের তেজ ও মধুময় হৃদয়ভাব সকল শিশুগণের জীবনে সংক্রামিত হইয়া পড়িত। শাসন, দণ্ডবিধান প্রভৃতি নীতিশিক্ষার অতি নিকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ উপায়। প্রীতি ও স্নেহই এবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। শিক্ষকের অকপট স্নেহ, সহানুভূতি, তাঁহার মধুর ব্যবহার শিশুগণের হৃদয় জয় করিয়া তাহাদিগকে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে বা অসদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত রাখে, অন্য শাসনের প্রয়োজনই হয় না। সৌন্দর্য্যবৃত্তির অনুশীলন নীতি শিক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশের লোকে সাধারণত এতথ্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এজন্য কঠোর বৈরাগ্যময় নীতির শাসন প্রথমাবধি শিশুগণের স্কন্ধে আরোপণ করা হয়। তাহার ফল এই হয় যে তাহারা অচিরেই সর্ব্বপ্রকার নৈতিক উপদেশের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়ে এবং অসদুপায় অবলম্বনে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপিপাসা চরিতার্থ করে। পর্ব্বত-নিঃসৃত নির্ঝরিণীর স্বাভাবিক প্রবল গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিলে যদ্রূপ সেই বাধাপ্রাপ্ত জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া অপরদিক দিয়া আপন পন্থা প্রস্তুত করিয়া লয়, তদ্রূপ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ পরিপরিপূর্ণ, চিরনবীন, চিরসুন্দর প্রকৃতির অভিমুখে প্রধাবিত শিশুর স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, উহা সবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া

অস্বাভাবিক উপায়েও আপন তৃপ্তি সাধন করিয়া লইবে। ফ্রোবেল এই তথ্যটী স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি শিশুগণকে লইয়া নদীতীরে প্রান্তরে, উপবনে, নিকুঞ্জে, পর্ব্বতে, উপত্যকায় ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ সম্ভোগ দ্বারা তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতেন। এজন্য কিণ্ডারগার্টেনের নীতিশিক্ষা প্রণালীও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের শিশুগণকে অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, পীড়িতাশ্রম এবং সাধারণ সেবালয় সমূহ প্রদর্শন ও নানাবিধ পুণ্য কাহিনীর উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণন এবং অন্ধ, আতুর, রোগী অনাথ, কাঙ্গাল, গরিবদিগের সাহায্যার্থে ফুল, ফল, আহার্য্য, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি সাধ্যমত সংগ্রহ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান দ্বারা তাহাদিগের অন্তরের নৈতিক বৃত্তিসমূহ স্ফুরিত করিয়া দেওয়া হয়। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য চিন্তা করিতে শিখা, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থে প্রীতি লাভ করা, মহান্ জনসমাজের মঙ্গলের নিকট ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করাই সামাজিক শিক্ষা। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর যাবতীয় বিষয় গুলির শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে এই মূলমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। এ প্রস্তাবে তাহার বিশিষ্ট অলোচনা সম্ভবপর নহে। আপাতত এ সম্বন্ধে শেষ কথা এই, যে বালকগণের ঈদৃশ নীতিশিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপরেই নির্ভর করিতেছে, পুস্তক বা পরীক্ষার উপরে নহে।

১০। ধর্ম্ম শিক্ষা। কি প্রকারে শিশুর মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়, ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত হইয়া উঠে, আমি ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কি উপায়ে সেই ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মপিপাসার চরিতার্থতা সাধন হইতে পারে এতৎ সম্বন্ধেও কিণ্ডারগার্টেন প্রবর্ত্তকের বিশেষ মত ও কার্য্য আছে। তাহা সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক



এ ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা পরিত্যাগ করিব। কেবল এই মাত্র ইঙ্গিত করিব যে এ বিষয়টীও শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য। ভারতে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মুখে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উথাপন করা কোন প্রকারেই নিরাপদ নহে। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভগবদ্ভক্তি মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। তাহার অনুশীলন বা আদান প্রদানে কোন বাধা বা বিপত্তি নাই।

আমি আর দুইটীমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। তন্মধ্যে,—

প্রথম,—কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক। এতদ্দেশে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর সম্যক প্রবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে শিক্ষকতার আদর্শকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরও উচ্চে তুলিতে হইবে। তাহার সর্ব্বপ্রথম উপায় শিশুশিক্ষকের বেতনের হার বৃদ্ধি করা। কেননা, সেরূপ আদর্শানুসারে প্রস্তুত হইবার জন্য অতি সামান্য বেতন বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ যুবকগণের পক্ষে কোন প্রকারেই আকর্ষণের বিষয় নহে। গবর্ণমেণ্টের চিন্তা এ বিষয়টীর উপর পতিত হইয়াছে, আমি এরূপ বিশ্বাস করি। প্রাইভেট স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণও এ বিষয়টী গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবটীকে কার্য্যে পরিণত করেন তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় কথা,—শিশুশিক্ষকগণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অধ্যয়নকে আপনাপন পবিত্র নিত্যব্রত বলিয়া গ্রহণ করুন। নিত্য অধ্যয়ন ব্যতীত অধ্যাপনার উপযোগিতা লাভ হয় না। বিশেষত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর অন্তর্গত যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিলাম, তাহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও গভীর চিন্তা না থাকিলে তদ্বিষয়ের শিক্ষাদান করা একেবারেই অসম্ভব। অতএব যাঁহারা কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক হইবার বাসনা রাখেন, তাঁহারা এই ব্রতের

গভীর দায়িত্ব স্মরণকরত অধ্যয়নে, জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হউন। কোন্ কোন্ বিষয়ের জ্ঞানলাভ তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন তাহা আমি বলিতেছি। সর্ব্বপ্রথম মনোবিজ্ঞান। চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রকে সর্ব্বপ্রথমে দেহতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হয়। কারণ, তিনি দেহেরই চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শিক্ষকতার ছাত্রকে তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথমে মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নপূর্ব্বক তদ্বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, কারণ শিশুগণের মন লইয়াই তাঁহার ব্যবসায়। দ্বাদশ শিশির বাক্স ও একখানি সংক্ষিপ্তচিকিৎসা পুস্তক লইয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চলিতে পারিত, অধুনা শারীরতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতীত আর ডাক্তারি করা সম্ভব নহে। এদেশে এযাবৎ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষকতা চলিয়া আসিল কিন্তু এমন দিন সত্বর উপস্থিত হইতেছে যখন আর তাহা চলিবে না। শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে। আমার বিবেচনায় ট্রেনিং স্কুলের পাঠ্যতালিকামধ্যে মনোবিজ্ঞানের স্থান হওয়া উচিত। শিক্ষকের অধ্যয়নের দ্বিতীয় বিষয় শিক্ষাদানশাস্ত্র (Art of teaching)। অধুনা সভ্যজগতে শিক্ষাদানপদ্ধতির প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের নিয়মসকল কি উপায়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্যে প্রযুক্ত হয়; শৃঙ্খলা শাসন ও সময়নিষ্ঠানুসারে কোন্ কোন্ বিষয় কি রীতিতে শিক্ষা দান করিলে ঈপ্সিত ফললাভ হয়, পাশ্চাত্যজগতে এ সকলের একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও তাহার ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশের শিশুশিক্ষকগণকে সেই শিক্ষাদানশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক তদনুসারে শিক্ষাকার্য্যের উপযোগী হইতে হইবে। চিকিৎসাব্যবসায়ীর যেমন দেহতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব, শিক্ষাব্যবসায়ীর তেমনি মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদানশাস্ত্র। শিক্ষক এই দুইটী পরিহারকরত এক পদও চলিতে পারেন না। তৎপরে, যে শিক্ষকের উপর যখন যে বিষয় শিক্ষাদানের ভারার্পিত



হইবে, তখন সেই বিষয়টী সম্বন্ধে অগ্রে স্বয়ং জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক উহা শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে যে গুলি শিক্ষণীয় বিষয় ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এতদ্দেশের নিম্নশিক্ষা মধ্যে এই প্রণালীর প্রবর্ত্তন করত, যেরূপে ইহার পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে শিশুশিক্ষক তদন্তর্গত দুই একটী বিষয়মাত্র অধিগত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যিনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক হইবেন তাঁহাকে এতদন্তর্গত সকল বিষয়গুলিরই সার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেই বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বৃত্তান্ত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, দেহতত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান এবং শ্রমিক কার্য্যাবলী। ড্রিল এবং অঙ্কনবিদ্যা সকলের সহিত যুক্ত আছে—মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাদানশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিদ্যা এই ছয়টী বিষয়ও ইহার সহিত সংযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ হয়ত ঈদৃশ প্রস্তাব শ্রবণে আমাকে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু আমি কিণ্ডারগার্টেনের মূল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষকগণের নিকট ঈদৃশ উপযোগিতা দাবী করিতেছি। কেবল আমি দাবী করিতেছি তাহাই নহে, এই শিক্ষাপ্রণালী দাবী করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছেন, সমগ্র দেশ দাবী করিতেছে, ভারতের ভাবী মঙ্গল শিক্ষকগণের নিকট এই উপযোগিতা দাবী করিছে। কারণ আমাদের দেশের ভাবী বংশের সুশিক্ষা, তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—শিক্ষা-সাহিত্য ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। অস্মদ্দেশে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে শিক্ষা-সাহিত্য ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য ও শিক্ষাকার্য্যের অবশ্য প্রয়োজনীয়, বঙ্গভাষায় তাহার গ্রন্থ অতি বিরল, যাহা আছে তাহাও

প্রয়োজনের হিসাবে উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট নহে। এজন্য বঙ্গভাষার গ্রন্থকর্ত্তাগণের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশ এখনও এতাদৃশ অপকৃষ্ট রহিয়াছে যে শিশুগণের হস্তে তাহা প্রদান করা মহাবিপজ্জনক। সেই সকল গ্রন্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে শিশুগণের নবীন, কোমল চক্ষু নিতান্ত ব্যথিত হইতে থাকে এবং অচিরেই Miopia নামক চক্ষুব্যাধির সূত্রপাত হয়। আজীবন তাহারা সেই ব্যাধি ভোগ করিয়া থাকে। ঐ গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই কাগজ অপরিষ্কার এবং মুদ্রণ এমনই কদর্য্য ও ঘনসন্নিবিষ্ট যে তাহা দেখিয়া শিশুগণের পাঠে রুচি ও আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদের মনে আতঙ্কেরই সঞ্চার হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থপ্রণেতাগণের হয়ত শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা অল্প। কেহ কেহ এ কথা বলিতে পারেন, যে গবর্ণমেণ্ট শিশুপাঠ্য পুস্তকের মূল্যের হার যেরূপ অল্প নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাতে এতদপেক্ষা সুন্দর ও পরিষ্কার মুদ্রণ অসম্ভব। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যে গ্রন্থকারগণ যদি নিজ নিজ লভ্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষীণদৃষ্টি হন, তাহা হইলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। এখন এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার সময় সমুপস্থিত। সুতরাং এক্ষণে নূতন প্রণালীতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নবপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে না। তজ্জন্য নিরাশ হইবাবার কারণ নাই। কোন নবপ্রবর্ত্তিত বিষয়ের প্রথম ফল উত্তম হয় না। আমি আশা করি, শিশুপাঠ্য গ্রন্থকারগণ অচিরেই বুঝিতে পারিবেন কিরূপ প্রণালীতে কিণ্ডারগার্টেন গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। নবব্রতী কিণ্ডারগার্টেন গ্রন্থকারগণ, অতীব তীব্র হইলেও, ন্যায্য সমালোচনার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন ও বিনীত হৃদয়ে সর্ব্বদাই আপনাপন ত্রুটি সংশোধন করিয়া



চলিবেন। কেবল শিক্ষকগণ কেন, গ্রন্থকারগণও কিণ্ডারগার্টেন ইংরাজী গ্রন্থাবলী, বিশেষ মহাত্মা ফ্রোবেলের স্বকৃত গ্রন্থাবলী, অভিনিবিষ্ট চিত্তে সর্ব্বদাই পাঠ করিবেন এবং তদ্বর্ণিত বিষয় গুলিকে এদেশের উপযোগী করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিবেন।

## উপসংহার।

ইয়ুরোপীয় জাতির গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপযোগী কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী আমাদের দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে এই প্রণালীর সার্ব্বভৌমিক মূলসূত্র গুলি গ্রহণ করত এদেশের শিশুশিক্ষায় তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের দেশের শিশুবিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন পূর্ব্বক, আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাকরত যতদূর সম্ভব আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। শিশুদিগের জীবনে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র বিশারদ, শিক্ষাকার্য্যে সুনিপুণ, শিশুহৃদয়রঞ্জনসমর্থ শিক্ষকগণের উপর তাহাদের শিক্ষাভার অর্পণ করিতে হইবে। শিশুগণের বিদ্যামন্দির চিত্রপট, মৃণ্ময়মূর্ত্তি, বাদ্যযন্ত্র, ক্রীড়াসামগ্রী এবং শিক্ষাদানোপযোগী নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থে পূর্ণ করিতে হইবে। শিশুবিদ্যালয়ের সংশ্রবে সুপরিস্কৃত বায়ুপরিসেবিত, বিশুষ্ক ও প্রশস্ত ব্যায়ামক্ষেত্র ও ক্রীড়াভূমি এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাফলপুষ্পসমন্বিত ছায়াযুক্ত উদ্যান বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ঈদৃশ বিদ্যালয় সমূহে, ঈদৃশ সুশিক্ষিত শিক্ষকগণ দ্বারা সস্নেহে ও সযত্নে, শিশুগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে—তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ হইলে, এবং সৌন্দর্য্যবৃত্তি উৎকর্ষলাভ করিলে, বাসনা সংযত এবং

কার্য্যকরীশক্তি যথোপযুক্ত নিয়োজিত ও পরিচালিত হইলে, নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তির স্ফুরণ এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমাবকাশ ও চরিতার্থতা হইলে, তাহাদিগের জীবন সামঞ্জসীভূত পূর্ণ বিকাশের পথে উপনীত হইতে পারিবে এবং তবেই তাহারা যৌবনবয়সে সংসারক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া পরিণামে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

---

## পূর্ণিমারাত্রে।

রজতকিরণবাসে আবরিয়া তনু,
সেজেছে প্রকৃতি যেন রূপসী নবীনা—
বিশদ প্রীতির সনে ঘোমটা খুলিয়া,
চেয়ে আছে বিশ্বপানে স্বপনমগনা!
নীরব আকাশ অই, চন্দ্ররশ্মিকরে
চাহে বাঁধিবারে তারে প্রেম-আলিঙ্গনে—
প্রকৃতি হাসিছে তাই; ক্ষুদ্রনদী, পাশে
শুভ্রবারি বহি' চলে অলসগমনে!
বিভোর মদিরতপ্ত নেশা মাতোয়ারা,
যেন চরাচর-হৃদি করেছে চঞ্চল!
সুমন্থর মলয়ের মৃদুল নিশ্বাস,
লুটায় পল্লববক্ষে, আবেশবিহ্বল!
অদূরে অশোকতলে, পুষ্পিত-যৌবনা
কল্পনা আমার, চাহে বাজাইতে বীণা!—

শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। } ১৩১১। { ৯ম সংখ্যা।

## সৎমা।

৫

আজ শনিবার। অধিকারী সন্ধ্যার সময় এক বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রী হইয়া গ্রামান্তরে গিয়াছেন। রাত্রির মধ্যে ফিরিবার সম্ভাবনা অল্প।

রাত্রি ৯ টার সময় আমার আহারের ডাক পড়িল। একাকী অধিকারী গৃহিণীর সম্মুখীন হইতে হইবে ভাবিয়া আমার আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অধিকারী নিকটে থাকিলে আমার তবু একটু সাহস হইত। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। কাঁপিতে কাঁপিতে আমি উপরে উঠিলাম।

আজ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আর আমার নিষ্কৃতি নাই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। সেই ভীষণদর্শনা রাক্ষসী আজ বহুমূল্য অলঙ্কার ও রক্তাম্বরে মণ্ডিত হইয়া উপাধানে শরীরভার রক্ষা করিয়া আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতেছিল। রাক্ষসী নহিলে এরূপ করিবে কেন? আমি কোন স্ত্রীলোককে ত এরূপ ভাবে তাম্রকূট সেবন করিতে দেখি

নাই। আমাকে দেখিয়া তাহার চক্ষে লালসার অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহার মিসিরঞ্জিত বিকট দশন ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া রাক্ষসী বলিল "আমার কাছে এস।" গল্পে শুনিয়াছিলাম পর্ব্বতবাসী অজগর সর্প বিশেষের সম্মুখে পড়িলে হরিণাদি জন্তু সকল তাহার সম্মোহনী দৃষ্টি-শক্তি প্রভাবে গতিহীন হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সেই সর্ব্বগ্রাসী সর্প ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাকে সংবেষ্টন করিতে থাকে।

আমারও সেই অবস্থা ঘটিল। আমি একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন সেই রাক্ষসী আলুথালু বেশে টলিতে টলিতে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি একমনে দুর্গানাম করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে রাক্ষসী "এস ভাই এস" বলিয়া আমাকে সবেগে আলিঙ্গন করিল। আমি অন্তিম আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

আমার চীৎকার শব্দে দলের লোকের ৮।১০ জন দ্রুতবেগে উপরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের দেখিয়া রাক্ষসী তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল। "কি, এইটুকু ছোঁড়ার এত আস্পর্দ্ধা! আমাকে ঘুমন্ত দেখে আমায় গায়ে হাত দিয়েচে। আসুক বড়াল, কাল জুতো মেরে যদি না তাড়াইত আমার নাম নয়। হারামজাদা, গুখেগোর বেটা" ইত্যাদি।

আমি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। "না রাম না গঙ্গা" কিছুই বলিতে পারিলাম না। শেষ রাত্রে অধিকারী ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রাতে পাদুকাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যাত্রার দল হইতে বিতাড়িত হইলাম।

৬

তারপর তিন চার বৎসরকাল যে কি কষ্টে কাটিয়াছে তাহা বলিতে



পারি না। এক যাত্রার দল হইতে অন্য যাত্রার দলে গিয়া, দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া, বৈষ্ণবের দলে মিশিয়া কোন প্রকারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। কোথাও কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিতে পারি নাই। কেহ আমাকে পাগল বলিত, কেহ আমাকে বোকা বলিত, কেহ হাসিত, কেহ ঘৃণা করিত। এত কষ্টেও কিন্তু আমার এক সান্ত্বনা ছিল—আমি মা হারাইয়া আবার মা পাইয়াছিলাম।

যখন পীতোজ্জ্বল সর্ষপপুষ্প শোভিত মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতাম, আমার মনে হইত আমার মার রূপে জগত আলো হইয়া রহিয়াছে—প্রভাতের অরুণ কিরণ যখন অন্ধকারের সমুদ্র ভেদ করিয়া নীলাকাশে বিকশিত হইত তখন মার হাসি হাসি মুখখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম—পাখীর কাকলিতে মার গলা শুনিতাম, মৃদু পবন চালিত সরোবর বক্ষে রক্তপদ্মের আন্দোলন দেখিয়া মার গমনভঙ্গী মনে পড়িত আর উচ্ছ্বাসভরে গাহিতাম :—

"হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা!" এইরূপ কর্ম্মহীন জীবন লইয়া একদিন হরিপুরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম—যাইতে যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই গ্রামে আমার এক মামার বাড়ী। জননী বর্ত্তমানে মামা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী যাইতেন। তার পর বহুকাল আর তাঁহার খোঁজ খবর পাই নাই। মামার নাম রামধন বসু। মনে করিলাম একবার দেখা করিয়া যাই। জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া মামার বাড়ী নির্ণয় করিয়া দ্বার দেশে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সম্ভবত মামীমা দ্বারে জল দিতেছিলেন। "মামীমা?" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মামীমা আমায় দেখিয়া লজ্জায় অবগুণ্ঠিত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাজেই আমিও "মামা" "মামা" করিয়া অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মামা আমাকে দেখিয়া সস্নেহে আহ্বান করিলেন।

মামীমাতে আমি আমার কল্পিত জগৎজননী মূর্ত্তি শরীরিণী দেখিলাম। সে স্নেহ, সে ভালবাসা, সে যত্ন, সে ধর্ম্মভাব, সে নিষ্ঠা এ জন্মে আমি ভুলিব না। মামীমা আমাকে দুই দিনের মধ্যে তাঁর আপনার করিয়া লইলেন—তাঁহার শীতল স্নেহ-প্রলেপে আমার অষ্টবর্ষব্যাপী হৃদয়বেদনা মুহূর্ত্তে বিলীন হইল।

কিন্তু আমার জীবনে সুখ বিধাতা লেখেন নাই। কি অপরাধ করিলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—একদিন প্রভাতে মাতুলের পাদুকাবৃষ্টি আমায় গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল।

নিরপরাধিনী মামীমাও নির্ব্বাসিতা সীতার ন্যায় গৃহতাড়িতা হইলেন।

* * * * *

এখন আমি সাক্ষাৎ শিবতুল্য এক গোস্বামীর পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত আছি। তাঁহার ভগবতী রূপিণী সহধর্ম্মিণীর যত্ন ও স্নেহে পূর্ব্ব কষ্ট আবার ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। আবার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

এক বৎসর পরে মামীমার তত্ত্ব লইবার জন্য তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম। শুনিলাম মামা তাঁহাকে লইয়া বিদেশে চাকরি করিতে গিয়াছেন।

ক্রমশ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---



# অর্ঘ্য।*

কি অজ্ঞাত পুণ্য বলে লভেছিনু তব দরশন,
বিস্ময়ে হরষে আজি তাই ভাবি' আকুলিত মন।
অন্তহীন প্রান্তরের মাঝে সেই শান্ত তপোবন,
তারি মাঝে তব বাণী কি অমৃত করিত সৃজন।
শান্তিস্নাত শুভ্র মূর্ত্তি মুক্তআত্মা ঋষির মতন,
পূর্ণরূপে অধিকার ক'রেছিলে হৃদয়-আসন।
পুণ্য মদিরার গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া অন্ধ মন,
তোমারি অপূর্ব্ব কুঞ্জে গুঞ্জরিয়া করিত ভ্রমণ।

আজি হায়! কর্ম্ম স্রোতে কোন্ দূরে পড়েছি ভাসিয়া,
ক্ষীণপুণ্য হ'য়ে যেন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছে হিয়া।
তবু স্মৃতিমন্দিরের রুদ্ধ দ্বার ক্ষণ-উদ্ঘাটিয়া,
মানস-নয়নে নিত্য লই তব মূরতি হেরিয়া।
হে দেবতা ঋষিরূপি! লহ অর্ঘ্য করুণা করিয়া,
ভাসিতেছে তব রূপ এ বিজনে নম্র স্তব্ধ হিয়া।

---

# আশীর্ব্বাদ।

ভাবে ভরা পত্রখানি তোমার করিনু আমি দৃষ্টি,
নন্দন-কানন হ'তে আচম্বিতে একি ফুল-বৃষ্টি।

---

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে যে পত্র লেখেন সেটি ও তাহার উত্তর "অর্ঘ্য" ও "আশীর্ব্বাদ" নাম দিয়া প্রকাশ করা হইল। সঃ সঃ।

হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তোমার এই সরস বাথানি,
সযতনে হৃদয়ে রাখিনু আমি বহুমূল্য মানি।
তপোবন বিরাজে তোমার মনে তুল্য যার নাই,
ঋষি যদি দেখিবারে মানস দেখনা সেই ঠাঁই।
হায় এ যে কলিযুগ! তপোবন কবির স্বপন,
ঋষি চেয়ে কৃষী পূজ্য পুণ্য ধান্য করয়ে বপন।
নরেন্দ্র-ভাণ্ডারে তব কাব্যধন মাণিক্যের বাড়া,
দীন দ্বিজ তোমারে কি আর দিবে আশীর্ব্বাদ ছাড়া।
পালুন তোমারে নিত্য ভৃত্য যার দশদিকে ফিরে,
ক্ষিতি অপ্ অনল সলিল ব্যোম আজ্ঞা ধরি শিরে।

———

## গুপ্ত-তত্ত্ব।*

( সমালোচনা )

যে সকল বিষয়ের উপর মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বাস্থ্য বহুপরিমাণে নির্ভর করে, সে সকল বিষয়ের আলোচনাকে অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করা আদৌ যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না।

বালকের সরলতা ও শান্তিপূর্ণ জীবনসমুদ্রে যে দিন যৌবনের তরঙ্গ-চঞ্চল জলোচ্ছ্বাস সহসা উপস্থিত হইয়া তাহার শুভ্র হৃদয়ে বাসনার পঙ্কিল ফেনরেখা আঁকিয়া যায় সে দিন তাহাকে তাহার চঞ্চলতা ও মলিনতার-জন্য ধিকার দেওয়া যায় না! প্রকৃতির নিয়মে ইহা ঘটিবেই। ইহাকে উপেক্ষা করা মূর্খতামাত্র। এই পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া

* মূল্য ।০ আনা ৪১ নং লোয়ার সার্কুলার রোড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



রাখা, পূর্ব্ব হইতে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া, ইহাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

কিন্তু অন্তঃসারহীন কপট সুরুচির দোহাই দিয়া আমরা কেহই এ সকল কথা বালকের কাছে উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করি না! কাজেই চঞ্চলতাজনিত মানসিক বিকারের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্যক বুঝিতে না পারিয়া অপরিণামদর্শী বালক যে কোনপ্রকারে আপনার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করিবার উপায় অন্বেষণ করে এবং জ্ঞানের আলোক দেখিতে না পাইয়া অন্ধকারে জীবন তরণী যথেচ্ছ বাহিয়া ভীষণ পর্ব্বতসংঘর্ষে তাহাকে বিচূর্ণিত করে।

যে দিন ভারতে আশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, যে দিন শিশু আপনার চঞ্চলতাময় কৈশোর ও বাসনা-বিক্ষুব্ধ যৌবন সুপবিত্র তপোবনে ধর্ম্ম-নিষ্ঠ আত্মসংযম পরায়ণ অধ্যাপকের প্রভাব মধ্যে, কুসংসর্গমাত্র হইতে দূরে থাকিয়া জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আলোচনায় অতিবাহিত করিত সেদিন ব্রহ্মচর্য্যবিচ্যুতির তাদৃশ আশঙ্কা ছিল না।

কিন্তু আজ এই বিলাসবিহ্বল সমাজে ইন্দ্রিয় সেবার সহস্র দৃষ্টান্ত-সম্মুখে, ধর্ম্ম ও নীতিভ্রষ্ট অবস্থায় ইন্দ্রিয় সংযম এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া দৃঢ়পদে জীবনপথে অগ্রসর হওয়ার দৃষ্টান্ত আজিকার দিনে প্রতিদিন বিরল-দর্শন হইয়া উঠিতেছে।

শুধু কল্পনা হইতে এ কথা বলিতেছি না বহুদিন ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের অবসর লাভ করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে অতি অল্প বয়সে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুতি আমাদের দেশে সংক্রামক মহামারীর ন্যায় দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং আজিকার দিনে জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় সকল কথা বালকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবকের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই সকল কথা অনেক সময়ে বলিবার উপযুক্ত প্রণালী স্থির করিতে না পারায় বলা যায় না। ভয় হয় পাছে বলিবার দোষে নির্ম্মল-চিত্ত বালক উপদেশের উত্তমাংশ গ্রহণ করিয়া উপদেশের অপকৃষ্ট অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে! পাছে হিতে বিপরীত হয় চিরন্তন অভ্যাসবলে অনেক সময় এ সকল কথা কিরূপে উত্থাপন করিব স্থির করিতে না পারিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে হয়। আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে ফেথ্ অর্ফাণেজের এ জ্যুশন সাহেব "গুপ্ত-তত্ত্ব" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বালকবৃন্দের অভিভাবক ও শিক্ষকবর্গকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে এই সকল গুপ্ততত্ত্ব এমন কৌশলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে ইহা পাঠ করিলে বালকদের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

জ্যুশন সাহেব একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মে প্রচারক সুতরাং তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র বাইবেলের প্রভাব বিদ্যমান। হিন্দুবালকের পক্ষে সে সকল বিষয় বুঝিবার কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুস্তক খানির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সকল গোপনীয় কথা নিঃসঙ্কোচে বালকদিগের নিকট উত্থিত করিবার জন্য তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অতিশয় সুন্দর। জ্যুশন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার এই গুপ্ততত্ত্ব ডাক্তার সিল্‌ভেনাস্ রচিত "বালকের জ্ঞাতব্য" নামক ইংরাজী পুস্তকের মর্ম্মানুবাদ। ইংরাজী পুস্তকের মূল্য তিন টাকা সুতরাং উহা অনেকের নিকটেই দুর্লভ। গুপ্ততত্ত্বের মূল্য চারি আনা মাত্র।

জ্যুশন সাহেবের এই হিতৈষণা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

কামপ্রবৃত্তি মানুষের অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে ভুল ভ্রান্তি বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই



ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং জ্যুশন সাহেব যদি ক্রমশ ডাক্তার সিল্‌ভেনাসের এই বিষয় সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তক ও অনুবাদিত করিয়া সুলভে প্রচার করেন তাহা হইলে সাধরণের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

জ্যুসন সাহেবের আরও প্রশংসার কথা এই যে সমালোচ্য পুস্তক খানির ভাষা খৃষ্টিয়ানী বাংলা নহে, ভাষা বেশ সরল ও সরল।

কিন্তু একটী কথা। আমাদের দেশের যে সকল গ্রন্থকার অসার নাটক নভেল লিখিয়া মাতৃভাষার মন্দিরদ্বার আবর্জ্জনাস্তূপে রুদ্ধপ্রায় করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা জ্যুসন সাহেবের মত এই সকল পুস্তকের অনুবাদ করিয়া কেন তাঁহাদের করকণ্ডতি নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ বাসীর উপকার সাধন করিবার উৎকৃষ্ট অবসর অবহেলায় উপেক্ষা করিতেছেন?

শ্রীযতীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

---

# শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি

## ১। নৃসিংহানন্দ।

চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ভাবরাজ্যে একবার বসন্তের শুভাগমন হইয়াছিল, সেই সঙ্গে বহু কবিকণ্ঠ কাব্য-কুঞ্জ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কাঁটোয়ার সন্নিকটস্থ শ্রীখণ্ড গ্রামে এমনি একটী কবিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে নরহরি সরকার ঠাকুর তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

নরহরি সরকার ঠাকুরের পর শ্রীখণ্ডে বহু বৈষ্ণব কবির ও সাধকের আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাদের মধ্যে রঘুনন্দন, মুকুন্দ দাস, গোবিন্দ দাস

কবিরাজ, রামচন্দ্র কবিরাজ, বলরামদাস, লোচনদাস, রায়শেখর, গোপাল দাস, পীতাম্বরদাস, জগদানন্দ, নৃসিংহানন্দ, চিরঞ্জীব, দামোদর, রতিকান্ত ঠাকুর, কানাই ঠাকুর, লোকানন্দ দিগ্বিজয়ী—প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আজ আমরা নৃসিংহানন্দ ঠাকুরের পরিচয় লইব।

নৃসিংহানন্দ শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত সরকার ঠাকুরের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অচ্যুতানন্দ ঠাকুর। নৃসিংহানন্দ ঠাকুর কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—দুইটী বিষয়ের দ্বারা তাহা অনুমান করা যাইতে পারে—

প্রথমত। মহারাজা হরিনাথের তিনি ইষ্টদেব ছিলেন।

দ্বিতীয়ত। কবি জগদানন্দের তিনি সমসাময়িক এবং পরম বন্ধু ছিলেন।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সম্ভবত তিনি ১৬৮০ হইতে ১৭৪০ শকাব্দার মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার তিরোভাব পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে ঘটিয়াছিল। আজি ও শ্রীখণ্ডেগ্রামে তদ্বংশীয় মোহান্তগণের যত্নে এবং কাশিমবাজারাধিপতির অর্থসাহায্যে প্রতিবৎসর মহোৎসব হইয়া থাকে।

তাঁহার প্রভাবে ও আদর্শে মহারাজ হরিনাথও ভক্তপ্রেমিক হইয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যের রচিত সুললিত সুন্দর পদাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃসিংহানন্দ একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক প্রবাদ আজিও আসিতেছে। গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীতে তাঁহার প্রেমাভিষিক্ত কবিহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভক্ত প্রেমিক কবির কবিতায় প্রেম উছলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রিয়তমের রূপবর্ণনা করিতে করিতে তিনি অবনীর সমস্ত সৌন্দর্য্য



চয়ন করিয়াও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন,—কি যেন অভাব রহিয়া গেল, আরও যেন কি হইলে হইত।

তাঁহার চিরপ্রফুল্ল ভাবশতদলগুলি যেন প্রেম সাগরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা শিরীষকুসুম-পেলব কোমল, ভয় হয় বর্ণনার ভর সহিবে না, সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের নিস্ফল প্রয়াসে বুঝি তাহারা প্রনষ্টশোভা হইবে।

এক একটী কবিতা যেন ভাব নির্ঝরিনী—তাহা পদের পর পদে, বাক্যের পর বাক্যে মুখরিয়া উচ্ছ্বসিয়া কল্লোলে কল্লোলে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নহিলে কবিতার কল্পনায় ঘনঘটা, ছায়ালোকের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা নাই,—ছন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তাহাতে বড় বিরল, কিন্তু ভাবুক ভক্ত কবির হৃদয়ের স্বতউৎসারিত ভাবধারা বলিয়াই তাহা এত সুন্দর, এত অল্প আয়াসে, বিনা আড়ম্বরে, পাঠকের মনমুগ্ধ করে। কবিত্বর নিদর্শনস্বরূপ যথেচ্ছ দুএকস্থল উদ্ধৃত করিয়াছিঃ—

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবি বলিতেছেন যে এমন মনোহর তাঁহার রূপ মাধুরী যে, যে অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবে, আর নয়ন ফিরাইবার যো নাই—

"একি অপরূপ রূপ গোকুলে আইল।
যে অঙ্গে লাগিল আঁখি সে অঙ্গে রহিল॥" স্থানান্তরে ঃ—
"অকলঙ্ক মুখশশী দেখি শশী ভাবনা।
দেখ দিনে দিনে ভেল ক্ষীণ তনু আপনা॥
শ্রবণ ধরিতে ধায় দেখ দুটী নয়না।
হেরিয়ে হরিণী হলো ঘন বনে গমনা॥
নীল উৎপল নীল মণি জিনি বরণা।
নব নীল ঘনগণ নহে ইথে গণনা॥

হর সুরাসুর নর করে কত যাপনা।
নরসিংহ দাস করে পদযুগ বাসনা॥"

আর একস্থলে :—

"নব ঘন শ্যামরূপ কিবা শোভা সুগঠন।
পালটিতে নারি আঁখি, নিরখি মোহিত মন॥
নবনীল কান্তমণি যিনি তনু সুচিকন।
নিরমিল কোন বিধি নিধি অমূল্য রতন॥
হাসি হাসি মুখশশী সুধারাশি বরিষন।
ক্ষুধিত লুভিত আশে উড়িছে চকোরীগণ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা যেন মনমথ শরাসন।
ভূলিল নৃসিংহমন ভাসে জলে দুনয়ন॥"

তাঁহার রচিত অন্যূন ৬০টী পদাবলী আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনায় নিঃশেষিত হইয়াছে। পদাবলীর বেশীর ভাগই খাঁটী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, কয়টী মাত্র মিশ্র. মৈথিল ও বাঙ্গালাভাষায় রচিত হইয়াছে। কবির ভাষা ও শব্দের উপর বেশ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী পদাবলী এক অক্ষরের শব্দেই মুখ্যত রচিত হইয়াছে। কোথাও পদাবলীর প্রতিপদের প্রথম শব্দগুলির আদ্য অক্ষর এক। যথা :—

"কালা কানু কান্ত শোভা কিবা মনোহর।
কম্বু কণ্ঠ কঞ্জু আঁখি কপাল সুন্দর॥"

ইত্যাদি।

স্থানে স্থানে পদাবলীতে অনুপ্রাসের রস আর ও উথলিয়া উঠিয়াছে। যথা :—

"কঞ্জু নয়ন যুগে কে দিয়েছে অঞ্জনা।
ভুরু যুগ ভুজগী ভূজগে দেয় গঞ্জনা॥"



"পালটিতে নারি আঁখি, নিরখি মোহিত মন।
"ওগো আমি কানু রূপ কিসে দিব তুলনা।
রতি পতি দ্যুতি জিতি দেখ অতি শোভনা॥"
"দেখ সই কানুরূপ মুনি মনোহর।
জলধর বরণ কিরণ দিবাকর॥
অপরূপ গঠন নবীন কলেবর।
সরোরুহ নয়ন বদন শশধর॥
উতপল চরণ লুবুধ মধুকর।
নরসিংহজীবন মরণ গতিকর॥"

আরও দুএকটী পদাবলী উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"বড় সাধ লাগে গোকুলের চাঁদ দেখিগো নয়ান ভরে।
যাবনা যাবনা সই এ রূপ অমিয়া ছেড়ে॥
পালটিতে নারি আঁখি তিল আধ অবসরে।
তুলনা দিব কি চাঁদ অকলঙ্ক কলেবরে॥
কত মরকত মণি আনি উপমার তরে।
যে লাগি কঠিন অতি সে লাগি ত্যজিনু তারে॥
কহয়ে নৃসিংহ দাস এরূপ জাগে যে অন্তরে।
মজিল তাহার কুল থাকিতে পারে না ঘরে॥"

এমনি মধুররূপে কবি বিভোর ছিলেন, এমন প্রিয়তমের ভাবে কবি হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

"চিরদিন এ মন্দিরে, গোরা চাঁদ এসেছে গো,
ওগো সই হের দেখ গিয়া।
মোহনিয়া ছাঁদে কত চাঁদ পড়িয়া কাঁদে,
মদন বাঁধিতে নারে হিয়া॥

কেনা দেখি মেঘ ভানে, চাতকী ডাকিছে গো,
শিখি নাচে উনমত হইয়া॥
নয়ন যুগলে কত, চপলা খেলিছে গো,
মুখচান্দে চকোর চাহিয়া॥
বরণকিরণছটা, অরুণ দেখিয়া গো
ফিরে তনু তাপিত হইয়া।
চরণ কমল লোভে লুভিত ভ্রমর গো
ফিরে ঘন ঘন গুঞ্জরিয়া॥
কহয়ে নৃসিংহানন্দ, সানন্দ হইয়া গো,
হেনরূপ কভুনা হেরিয়া॥"

এহেন গৌরাঙ্গ রূপ তিনি বর্ণনা করিবেন কি করিয়া? কবে প্রেমিকের তাহার প্রিয়তমের রূপবর্ণনা করিয়া হৃদয়ের আশা মিটিয়াছে? কবি বলিতেছেন :—

"হেরইতে গৌর বয়ান।
বিহি বহু না দিল নয়ান॥
কি বলিব রূপের বাখান।
উপমা নাহিক দিতে আন॥
গোরারূপে গোরা পরমাণ॥"

"গোরা রূপে গোরা পরমাণ" এই একটী মাত্র ছত্রে কি সুন্দর কবিত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আর অধিক উদ্ধৃত করিব না, ইহা হইতে তাঁহার কবিত্ব কতকটা অনুমিত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে শ্রীখণ্ড নিবাসী সরকার ঠাকুর বংশীয় সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত গৌর গুণানন্দ ঠাকুর আমাকে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি প্রদান করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।



# আলোচনা।

বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের Sensational উপন্যাস সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মিষ্টার আর্লনল্ড্ স্মিথ্—সুবিখ্যাত Westminister Review পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"The increasing mass of sensational literature which appears daily is a serious symptom of mental debility in the country at large"—অর্থাৎ বর্ত্তমান সাহিত্যে এই যে প্রতিদিন Sensational উপন্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা দেশব্যাপী মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ মাত্র।" ইংরাজী সাহিত্য সুবৃহৎ এবং বহুকালব্যাপী চেষ্টায় ইংরাজ লেখকগণ কঠোর সাধনার ফলে ধীরে ধীরে বল্মীকের ন্যায়—সুমহান স্তূপ গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। আজ যদি সামাজিক অবস্থার বশে এবং আধুনিক কর্ম্ম-বহুল জীবনের অবসাদবশত তাঁহাদের সাহিত্যে এই মানসিক দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা যে পরিমাণে আশঙ্কার কারণ—আমাদের বঙ্গভাষার এই কৈশোরে এই ব্যাধির আক্রমণ সে তুলনায় শতাধিক পরিমাণে চিন্তার বিষয়। বাংলা দেশের বালক যেমন কৈশোরেই সতেজ প্রাণশীলতা হারাইয়া স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আক্রান্ত, আমাদের সাহিত্যেও তেমনি সেই মানসিক দুর্ব্বলতাব্যাধি প্রবেশ লাভ করিতেছে দেখিয়া আমাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়াছে।·· আমাদের জীবনে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়—আমাদের সাহিত্যের এই নবযুগেও তেমনি জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য জীবনেও যেমন সাহিত্যেও তেমনি—সংযমের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

ইংরাজ সাহিত্যে এই দুর্ব্বলতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মিঃ

আর্ণল্ড স্মিথ্ বলিয়াছেন জীবন সংগ্রামের তীব্রতার ফলে ইংরাজ সমাজে যে ক্লান্তি যে মানসিক অবসাদ—তাহা দূর করিবার জন্যই লোকেরা এই সকল উত্তেজক উপন্যাস পড়িয়া থাকে—ভাল জিনিস পড়িবার মত মানসিক শক্তির তাহাদের অভাব। কেহ কেহ যেমন সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার চিন্তা এড়াইবার জন্য মদ্যপান অভ্যাস করে—তেমনি এই কঠোর জীবন সংগ্রামের অবসাদ এড়াইবার জন্য কেহ কেহ এই সকল Sensational উপন্যাস, সাহিত্যের এই সকল মানসিক-বিকার-সম্ভূত আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া জীবনের গভীর সত্যালোচনা হইতে নিজেকে বিমুখ করিয়া রাখে। তাই আমরা বর্ত্তমানের গুরুতর প্রশ্ন সকলকে দূরে সরাইয়া এই আপাত মধুর উত্তেজক সামগ্রী লইয়া নিজেকে ভুলাইতে বসিয়াছি—সাহিত্যও ক্রমে 'অদ্ভুত রহস্য' 'গুপ্তকথা' লইয়া তাহার পসারা পূর্ণ করিতেছে। তাই আজ আমরা "ওয়াল্টার স্কট" 'ডিক্‌ন্স' ত্যাগ করিয়া 'রেণল্‌ডস্' পড়িতেছি—'রাডিয়ার্ড কিপলিং আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে—তাই "Milton is more admired than read."

---

## তুমি ও আমি।

তোমাতে মিশিব বলি হায় কতকাল,
করেছি মানস ; কিন্তু নাহি হৃদে বল।
আমি ক্ষুদ্রতম, তুমি অনন্ত চিন্ময়,—
আমার এ ক্ষুদ্র কায়া তাতে হবে লয়।
তুমি বিশ্বব্যাপী দেব, ওহে পরাৎপর
—আমি ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য প্রাণী পাপী স্বার্থপর।



তোমার ও নামে দেব সতত ওঙ্কার
শুনিয়া বিস্ময় স্তব্ধ সারা চরাচর।
আমি শান্ত, তুচ্ছ, হীন, দুর্ব্বল জীবন।
তুমি তার মাঝখানে আনন্দ প্রধান।
আমি অন্ধ,—তুমি দেব দিব্য চক্ষুষ্মান্।
আমি ক্ষুদ্র নর,—তুমি অজ্ঞাত ধেয়ান।
মহানিদ্রাপরে দেব আমার নিয়তি
তোমার পদারবিন্দে মম পরিণতি।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

---

## আটকৌড়ে ও আইবড়।

( শব্দ সমালোচনা )

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদীপে দুইখানি বাঙ্গলা অভিধান নামক প্রবন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার সমীচীনতা সম্বন্ধে বোধ হয় সাহিত্যানুরাগী কোন মহোদয়েরই সন্দেহ নাই। এরূপ অভিধান যে বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব তাহাতে আর প্রতিবাদ নাই। কিন্তু সুবিজ্ঞ রামানন্দ বাবুই বলিয়াছেন এরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলন করা অতিশয় কঠিন এবং আয়াসসাধ্য ব্যাপার ; আর তাহা সঙ্কলন করিতে যে গুরুতর পরিশ্রম এবং অসাধারণ সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান ও প্রতিভা আবশ্যক তাহা অস্মদ্দেশে একজন ব্যক্তির ভাগ্যে সঙ্ঘটিত হওয়া একান্ত কঠিন। কিন্তু তাই বলিয়া নীরব থাকা কর্ত্তব্য নহে। কবে কোন মাহেন্দ্র ক্ষণে বঙ্গসাহিত্যের ভগ্ন কুটীরে সে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন সেই

অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকা সুলক্ষণ নহে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের সেই স্বর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে যাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব সেইরূপে যদি আমরা প্রত্যেকে সামান্য দুই চারিখানি করিয়াও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া ইতস্তত রাখিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে কালে কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ স্বীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে সেই বিক্ষিপ্ত ইষ্টকাবলী সংগ্রহিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া, এবং নূতন ইষ্টক আহরণ করিয়া সেই সুবর্ণ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন এবং স্বীয় সুধাধবলিত যশঃস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া যাইতে পারেন। এই ক্ষীণ আশার মোহিনী বাণীতে মুগ্ধ হইয়া এই দীন, দুর্ব্বল সেবক এইরূপ ইষ্টক সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছে। মাসিক সাহিত্য পত্রের পৃষ্ঠাই এইসব সংগ্রহ রক্ষার উপযুক্ত স্থান। সাধনা প্রভৃতি পত্রেও এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ শব্দ সমালোচনা পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। আমি অতি অজ্ঞান, যাহা পাইব তাহা প্রকৃত ইষ্টক কিনা, তাহা অন্ধতমশাবৃত আমার বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে গুলি বিজ্ঞ বহুদর্শী মহাত্মাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিব, তাঁহারা তাহার দোষ গুণ বিচার করিবেন। এই সাহসে, এই আশায় অদ্য দুইটি বাঙ্গলা শব্দের বিচার সাহিত্যবিদ্‌গণের গোচরে আনয়ন করিতেছি।

কিছু কাল হইল পণ্ডিতবর সাহিত্যসভার সভ্য এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহোদয় বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত শব্দের নির্ণয় করিতে গিয়া নব্যভারত পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আট কৌড়ে এবং আইবড় এই দুইটি বাক্যের জন্ম স্থান এবং বংশ নির্ণয় প্রসঙ্গে অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন আমার নিকট তাহা ভ্রমসংকুল বোধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে আমার কর্ত্তব্যে একটি প্রবন্ধে লিখিয়া শ্রদ্ধাস্পদ



শ্রীযুক্ত নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রকাশিত না করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়কে দেখিতে দেন এবং বিদ্যানিধি মহাশয় ভবিষ্যতে তাঁহার ভ্রমসংশোধন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এতকাল গত হইয়া গেল. আর সেবিষয় তাঁহার কোন উচ্চ বাচ্য দেখিতেছি না। নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই, কারণ তিনিও তাহা বোধ হয় জ্ঞাত নহেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বর্ত্তমানে বেঙ্গল গেজেটের অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন, এ অধমের সে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাঁহার স্মৃতি অতিক্রম করিয়া কোনও অন্ধকারময় গুহায় হয়ত চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে কিন্তু ঐতিহাসিক বিষয়ের ভ্রমও যেমন মরাত্মক এবং আলোচনার যোগ্য, সাহিত্যের শব্দ সম্বন্ধের ভ্রমও সেইরূপ কদাপি উপেক্ষণীয় নহে বিবেচনার সংক্ষেপে ঐ দুটি শব্দ সমন্ধে অশেষশাস্ত্র পারদ্রষ্টা বিদ্যানিধি মহাশয়ের মূল্যবান্ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত এবং এই দীন, অজ্ঞানের সহজজ্ঞানসঞ্জাত মন্তব্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুধীগণ সমীচীনতা নিরূপণ পূর্ব্বক প্রকৃত বস্তু গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

আট কৌড়ে—সুপণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয় এই শব্দটি সমালোচনা কালে ইহার বংশাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে আট কলাই হইতেই ইহার উৎপত্তি বটে কিন্তু আট কলাই শব্দ আজ কাল বঙ্গদেশে অপ্রচলিত।

কিন্তু বাস্তবিক আটকলাই শব্দ বঙ্গদেশে অপ্রচলিত নহে। আটকলাই হইতেই আট কৌড়ের উৎপত্তি। 'আটকলাই'ই ইহার আদি পুরুষ। তারপর 'ড়লয়োরভেদ' এই সূত্রানুসারে সুকোমল আটকলাই কট্‌কটে 'আটকড়াই' হইয়া গেল; তার পর তার ছেলে

হইল :'আটকড়ি' বা 'আটকড়ে' ; তার পুত্রই 'আটকৌড়ে' এই কলিকাতা অঞ্চলে অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। পল্লীগ্রামের আটকলাই এর পৌত্র বা প্রপৌত্র সহরে আটকৌড়ে নামে পরিচিত হইয়া নিজ বেশভূষা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সব এত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন যে আজ কালকার অনেক হঠাৎ বাবুর মত তাঁহাদিগের বংশ নির্ণয় বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কেবল জাতি স্বভাবটা হাজার করিয়াও বদলাইতে পারেন নাই সুতরাং সন্তানের জন্মের আট দিনের দিনই প্রসূতির গৃহদ্বারে হাজির হইতে হয় বলিয়াই আমরা এই "শাঁকচুন্নির পুত্র শশাঙ্কশেখর"কে চিনিতে পারি। 'আট-কলাই' কাছে থাকিলে পাছে কোন সূত্রে লোকে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে পারে তাই তিনি অনেক গুণধর বংশধরের ন্যায় বৃদ্ধকে পূর্ব্ব-বঙ্গ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু আর বুঝি তাঁহার থাকা হয় না, তার 'কুলের কথা' বাহির হইয়া পড়িতেছে।

আটকলাই এই সব সভ্য দেশ হইতে বিদূরিত হইলেও পূর্ব্বাঞ্চলের দরিদ্র অসভ্য দেশে সে এখনও পূর্ণ প্রভাবে প্রচলিত। এই সহর কলিকাতাটিই যদি সমগ্র বঙ্গদেশ না হয় এবং এখানে যে সব শব্দ অবজ্ঞাত হইয়াছে, তাহারাই যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট অপ্রচলিত করিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু সকল সাহিত্য-সেবী সে মত স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিবেন কি না তাহা বিবেচ্য।

জেলা ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশ, জেলা পাবনার অনেক স্থল প্রভৃতি স্থানে 'আটকলাই' শব্দ প্রচলিত আছে এবং ইহার নামের সার্থকতাও সেই অনুষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ আট প্রকার কলাই যথা মুগ, মটর, অড়হর, ছোলা, মাষ কলাই, কুলথ বা কালি কলাই, মুসুরি এবং খেঁসারি ভাজিয়া একত্রে মিশ্রিত করা হয় এবং তাহাই জাত বালকের অষ্টাহে বালকগণকে ডাকিয়া বিতরণ



করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা আনন্দে ঐ ভর্জ্জিত কলাই চর্ব্বণ এবং কুলা ও ধামা প্রভৃতি বাদন পূর্ব্বক বিচিত্র গীতে জাত বালকের কল্যাণ ও আয়ুকামনা করিয়া চলিয়া যায়। ইহার উপর যদি খৈ, মুড়ি, এবং বাতাসা তাহাদিগের মধ্যে দেওয়া হইল তবে তো কথাই নাই, সোণায় সোহাগা! তাহা হইলে কিশোর বালকগণের উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্যে এবং উচ্চ চীৎকারে বালকের রিষ্টি বিনষ্ট যতদূর হউক না হউক সে বাটীর নির্জ্জনতা এবং শান্তি যে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বিনষ্ট হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! এই গরীবের সাদা সিদে আটকলাই কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে আসিয়া আর একজন হইয়াছেন, ইহার সম্বর্দ্ধনা সন্দেশ মিষ্টান্নাদি সহযোগে না হইলে হয় না। কারণ এখানে তিনি সভ্য, অসভ্যোচিত কলাই ভাজা তাঁহার সহ্য হয় না। কিন্তু আদৎ জন্মদাতা 'আটকলাই'।

এস্থলে প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে ঐ সব পূর্ব্ব অঞ্চলে জাতবালকের ষষ্ঠাহে যে ষষ্ঠী পূজা হইয়া থাকে, সেই দিনকার রাত্রিকে ছয় কলাইয়ের রাত্রি বলে, এবং সেদিন ছয়কলাই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সব দেশে আটকলাই ব্যতীত ছয়কলাই ও একজন আছে। অনেক স্থলে অষ্টাহের অনুষ্ঠান তেমন প্রচলিত নাই, ষষ্ঠাহের অনুষ্ঠান বেশী প্রচলিত। এবং ঐ দিন রাত্রেই বিধাতা পুরুষ জাত বালকের কপাল-দেশে তাহার জীবনের শুভাশুভ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান ঐ সব দেশে এই সংস্কারই প্রচলিত। সে জন্য বিধিকে বিধিমত অনুরোধ করিতেও ত্রুটী হয় না। ষষ্ঠী পূজার পরই ছয়কলাইয়ের আয়োজন হইয়া থাকে। যাহা হউক এ বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করিলাম মাত্র।

আমার মনে সময় সময় এইরূপ ধারণা হয় যে এই আটকলাই ছয়কলাইরাও আর্য্যঋষিবংশ হইতেই জন্মিয়াছে। সংস্কৃত অষ্টাহকৃত্য

এবং ষষ্ঠাহকৃত্য বা ষট্‌কৃত্য হইতেই উহারা ক্রমে উদ্গত ও প্রচলিত হইয়াছে। এবিষয় ভাষাবিৎগণের বিবেচনা করিয়া দেখার যোগ্য। যাহা হউক আটকলাই শব্দ যে কলিকাতা এবং অন্যান্য পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত নাই বলিয়াই বঙ্গে অপ্রচলিত তাহা যেন কেহ মনে না করেন, পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থলে উহার রীতিমত প্রচলন আছে এবং তাহাতে উল্লিখিত রূপ বা তদ্রূপ অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।

তারপর সুপণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয় 'আইবড়' কথাটির মূল নির্ণয় প্রসঙ্গে অনেক উৎকট যুক্তি তর্কের উপস্থাপন করিয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে অবধারিত করিয়াছেন যে 'আইবড়' কথাটি 'আয়ুর্বৃদ্ধি' কথাটিরই অধস্তন ৪র্থ বা ৫ম পুরুষ। অনাদি আর্য্যঋষি কন্যা 'আয়ুর্বৃদ্ধির' গর্ভের সন্তান হইতেই 'আইবড়' বা 'আয়বড়'র উৎপত্তি। 'আয়ুঃ' কথার অপভ্রংশে 'আই' এবং 'বৃদ্ধি' কথার অপভ্রংশে 'বড়' হইয়াছে এবং 'আয়ুর্বৃদ্ধান্ন' কথাটির অপভ্রংশই আইবড় ভাত। সংস্কৃতবিদ্যা-নিধি মহেন্দ্র বাবুর এইরূপ ভাষাতত্ত্বে দক্ষতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি; আর মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয় তাঁহার লিখন ভঙ্গীতে। তাঁহার প্রকটিত মত যে স্বতঃসিদ্ধ, অকাট্য, এবিষয়ে তিনি নিজে তো সন্দেহ রাখেনই না, অন্যকেও সন্দেহাবসর প্রদানে তিনি অনিচ্ছুক এবং বিরক্ত।

যাহা হউক, তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে বলিতে হইতেছে যে আমার বিবেচনা হয়, 'আইবড়' বংশ নির্ণয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিদ্যা তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমার এরূপ মনে করিবার কারণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

আমি যে সামান্য সংস্কৃত পুস্তক, শাস্ত্র গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়াছি তাহার কোথাও 'আয়ুর্বৃদ্ধান্ন' বলিয়া কোন আচার আমার দৃষ্টিপথের



বিষয়ীভূত হয় নাই। অবিবাহিত যুবকের বিবাহানুষ্ঠানের পূর্ব্বে 'আয়ুর্বৃদ্ধান্ন' নামক কোন মাঙ্গলিক আচারের প্রসঙ্গ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় নাই দুই একজন সুপণ্ডিত শাস্ত্র বিশারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ঐ আইবড় জননীর কোন সন্ধান পাই নাই।

এজন্য আমার বিশ্বাস যে এই 'আয়ুর্বৃদ্ধান্ন' বাক্যটি কোন সুচতুর সংস্কৃতপক্ষপাতী মহোদয়ের কুশাগ্রধীর পরিচায়ক। 'আয়ুর্বৃদ্ধান্ন' ময়ূর পুচ্ছ শোভিত কাক মাত্র—'আইবড় ভাত'ই ঐরূপ সুচতুরের চেষ্টায় সুসংস্কৃত হইয়া আয়ুর্বৃদ্ধান্নে' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন এই বাঙ্গলা কথাটার কোন সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই, অমনি প্রচলিত কথাটির অংশার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক আই—আয়ু, বড়—বৃদ্ধি এবং ভাত=অন্ন করিয়া এই আয়ুর্বৃদ্ধান্ন গঠন করিয়া ফেলিলেন। সংস্কৃতের ন্যায় থাতসহ ভাষা আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না, সুতরাং সেও ইহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইল এবং পঞ্জিকাকারগণ ইহাকে রীতিমত পোষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্বান্বেষণে যত্ন করিলেন না। বিবাহার্থী বরের বা কন্যার মঙ্গল এবং আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় এই অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ইহাই ঐ শব্দের সার্থকতা প্রতিপাদন করিল।

কিন্তু প্রকৃত শব্দটি উহা নহে। আমি কোনও একখানি সংস্কৃত পুস্তকে এই আচারের একটি নাম পাইয়াছিলাম "অব্যূঢ়ান্ন" আচার। সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা; কোন্ পুস্তকে পাইয়াছিলাম তাহা পর্য্যন্তও আমার মনে নাই সুতরাং সে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও পারিব না। তাহা না হউক, কিন্তু 'আইবড় ভাত' কথাটি যে ঐ অব্যূঢ়ান্নে'রই বংশধর তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে অব্যূঢ় এই শব্দটির অর্থ অবিবাহিত। 'বিবাহ' এবং 'ব্যূঢ়' উভয়ের প্রকৃতি এক, কেবল প্রত্যয় ভেদে ভিন্ন আকৃতিমাত্র। তারপর যে 'ব্যূঢ়' নহে সেই

অব্যূঢ় অর্থাৎ অবিবাহিত। অব্যূঢ়ায়, অব্যূঢ়ায়ৈ বা যৎ অন্নং তৎ অব্যূঢ়ান্নং। অব্যূঢ়ায় অব্যূঢ়ায়ৈ বা অন্নং দীয়তে যস্মিন্ সঃ অব্যূঢ়ান্নঃ আচারঃ ইতি।

অবিবাহিত বর বা কন্যাকে যে মাঙ্গলিক আচারে অন্নাদিদ্বারা অভ্যর্থনা করা হয় তাহাই অব্যূঢ়ান্ন আচার। এ কথাটি কেমন সার্থক তাহা সকলে দেখিবেন। বর বা কন্যার মঙ্গল উপলক্ষ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি স্বীয় আনন্দ উচ্ছ্বাসে বর বা কন্যাকে যে অন্ন পানাদি প্রদানে সম্বর্দ্ধনা করেন তাহাই এই মাঙ্গলিক অব্যূঢ়ান্ন আচার। সকলে বিবেচনা করিবেন যে আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যান্ন এবং অব্যূঢ়ান্ন এই উভয়ের মধ্যে কোনটির সার্থকতা এ ক্ষেত্রে অধিক।

তারপর দেখুন, যে ব্যক্তি এক পত্নী বিয়োগের পর দারান্তর পরিগ্রহ করে তাহাকে সেই দ্বিতীয় বার বিবাহের সময় আর আইবড় ভাত দেওয়া হয় না। যদি আয়ুর্বৃদ্ধি কামনাতেই এই আচারের প্রচলন হইত, তবে দারান্তর গ্রহণকারীর আত্মীয়গণ তখনই তাঁহার আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় বিরত থাকেন কেন? কিন্তু তাহা নহে। এই আচারটি অব্যূঢ়ান্ন; সুতরাং যাহারা অব্যূঢ় বা কুমার তাহাদেরই কেবল এ আচারে অধিকার। যিনি একবার বিবাহিত হইয়াছেন, তাঁহার আর অব্যূঢ়ত্বের দাবী করিবার উপায় নাই সুতরাং তদনুসঙ্গিক অন্নের প্রত্যাশাও তাঁহার নাই কেবল কুমার কুমারীগণেরই তাহাতে অধিকার, তাঁহারাই প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে উন্মেষিত আশা কলিকার মৃদু মধুর সুবাসামোদিত চিত্তে সেই স্নেহকর প্রদত্ত অন্ন, পরমান্নাদির উপভোগ সুখ অনুভব করিতে থাকুন, আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধির স্থান সেখানে নাই।

তারপর ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ভাষার অপভ্রংশতা কথার অর্থ ধরিয়া হয় না, শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই তাহা হইয়া থাকে। যাঁহারা ইংরাজি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাবলী পড়িয়াছেন তাঁহারা তাহা বিশেষ রূপেই জ্ঞাত আছেন এবং ইহাও তাঁহারা জ্ঞাত



যে ঐরূপ সাধারণ অপভ্রংশতার স্থলে লোকে শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়াই তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে, অর্থের দিকে অতদূর লক্ষ্য রাখিবার যোগ্যতা বা অভিপ্রায় তাহাদের সাধারণত থাকে না এবং পণ্ডিতগণ ঐ শব্দ শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিলেও সাধারণে উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে। সুতরাং আয়ুঃ স্থলে আই হওয়া সম্ভব হইলেও বৃদ্ধির অর্থ বড় স্থির করিয়া তারপর তার অপভ্রংশতা সাধিত হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না। বরং অব্যূঢ় কথাটা উচ্চারণ করা কিছু কষ্ট সাধ্য বলিয়া সাধারণের রসনা উহাকে ক্রমে কোমলত্বে পরিণত করিয়া লইয়াছে এই স্বাভাবিক। 'অব্যূঢ়' হইতে এইরূপে 'আব্যূঢ়' জন্মিল; কিন্তু ব্যূঢ়টা তখনও বড় কট্‌কটে রহিয়া 'ব্যূঢ়' এর 'য' কারকে পূর্ব্বনিপাত করিয়া অনেকটা সহজ ও কোমল 'আয়বূঢ়' করা হইল, 'উ'র 'উ'ত্ব প্রাপ্তি হইতে আর দেরী হয় নাই, সুতরাং 'আয়বুঢ়' তাহা হইতে সহজেই আইবুঢ় এবং আইবড় হইয়া পড়িল। এইরূপ উচ্চারণ বিপ্লবে ভাষারাজ্যের অনেক শব্দ যে স্বীয় পদ এবং আকৃতিচ্যুত হইতেছে ইহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থ স্থিরই রাখিয়া শব্দের উচ্চারণের পরিবর্ত্তনে 'অব্যূঢ়' একেবারে আইবড় বা আইবুড়ত্বে উপনীত হইয়াছে। এইটিই ভাষা বিজ্ঞানানুযায়ী স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বোধ হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় দৃষ্টান্ত স্থলে ভারতচন্দ্রের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও আমার কথাই অধিক সমর্থিত হয় বলিয়া মনে করি। যথা—

'ঘরে আইবুড় মেয়ে বারেক না দেখ চেয়ে।' ইত্যাদি। এ স্থলে 'আইবুড়'র স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কল্পিত আয়ুর্বৃদ্ধিকে বসাইয়া 'আয়ুর্বৃদ্ধি মেয়ে' বলিলেই ভাল অর্থাপত্তি হয় না আমার প্রস্তাবিত অব্যূঢ় মেয়ে বলিলেই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত হয় তাহাও সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

তারপর উড়িষ্যাদেশেও এই আচার প্রচলিত আছে তাহাকে তদ্দেশীয় ভাষায় "অব্‌ড়া" বা "অব্‌ড়াথিয়া" বলিয়া থাকে। থিয়া অর্থ থাওয়া আর 'অবড়া' অর্থ অবিবাহিত। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন অব্যূঢ় হইতে অবঢ়া বা অবড়া হওয়াই স্বাভাবিক কি আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইতেই অবড়া হওয়া স্বাভাবিক, কোনটি মানবীয় সহজবাক্যপ্রিয়তার উদাহরণ একজন উড়িয়া পণ্ডিতও আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'অব্‌ঢ়া' সংস্কৃত 'অব্যূঢ়'রই অপভাষামাত্র। আমাদিগের নিকটও তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থলে এই আচারকে 'থুবড়া' থাওয়া বলে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই 'থুবড়া' যে 'অব্যূঢ়'র দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি তাহা স্থির করিতে পারা যায়। অবিবাহিতা, বয়স্থা কন্যাকেও 'থুবড়া' বলিয়া ঐ সব স্থানে গালি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতেও থুবড়ার অব্যূঢ়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সব কারণে আমার বিশ্বাস যে সংস্কৃত 'অব্যূঢ়'ই 'আইবড়, আইবড়, অবড়া থুব্‌ড়া' প্রভৃতির আদি পুরুষ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধির সঙ্গে ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় তাহাদের বংশ গণনা এবং কোষ্টিবিচারে ভ্রম করিয়াছেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

# প্রথম বাঙ্গালী খৃষ্টান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলাস্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিনামার রাজধানী শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরে বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরী সাহেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণচন্দ্র পাল নামক জনৈক



বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বঙ্গীয় খৃষ্টান-সমাজের ইহা স্মরণীয় ঘটনা। এই কৃষ্ণচন্দ্র পালকে বঙ্গীয় খৃষ্টান কুলের আদি পুরুষ বলিলেও বলা যায়; কেন না বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার খৃষ্টান হইবার বিবরণ অনেকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে বলিয়া নিম্নে ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

হুগলী নদীর তীরস্থ চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে সূত্রধরের (ছুতারের) গৃহে ইংরাজি ১৭৬৪ খৃঃ অঃ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মুন্নুক চাঁদ পাল। ইনিও (কৃষ্ণচন্দ্র) পৈতৃক ব্যবসায় সূত্রধরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মমতই ইহাদের উপাস্য। এই সময়ে বঙ্গে আউলচাঁদ প্রবর্ত্তিত কর্ত্তাভজার দল ক্রমে ক্রমে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছিল। বঙ্গের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকই ইহাদের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র ও কর্ত্তাভজা হইলেন। তাঁহার কর্ত্তভজা হইবার কারণও ছিল। কর্ত্তভজা সম্প্রদায় কেবল যে তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন তা' নয়—তাঁহারা মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা কঠিন রোগও আরোগ্য করিতেন বিশ্বাসে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিল। কথিত আছে কোন সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা অপারক হইলে জনৈক কর্ত্তভজা নাকি তাঁহার সেই কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে কর্ত্তাভজাদলের তীর্থ-ভূমি "ঘোষপাড়া"র আউলচাঁদের গুরুবংশ পাল মহাশয়দিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং উহাদের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন। তাহাতেই নাকি তাঁহার রোগ একেবারে আরোগ্য হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র কোন সময়ে চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে

আগমন করেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। যাহ'ক তাঁহার শ্রীরামপুরে বাস করিবার পরে ইংরাজি ১৮০০ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরী সাহেব তাঁহার সহযোগী মিঃ টমাসের সহিত তথায় আগমন করেন এবং বঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপুরের বাজার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন মিঃ টমাস খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র একমনে সে বক্তৃতা শুনিলেন। নূতন দ্রব্য দর্শনে বা নূতন গল্প শ্রবণে লোকে প্রথম প্রথম এইরূপ আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক যে খৃষ্টধর্ম্মের বক্তৃতা শুনিয়া তন্ময় হইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তখনকার দিনে নিম্নশ্রেণীর ভিতর লেখাপড়ার প্রচলন আদৌ ছিল না। শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা একরূপ বন্ধ ছিল। চণ্ডির গান, ধর্ম্মের গান, রামায়ণ গান, যাত্রা ও কথকতা প্রভৃতি হইতে তাহারা ধর্ম্মকথা শুনিত। এরূপ অবস্থায় তাহারা যাহা শুনিত তাহার ভাল মন্দ সত্যাসত্য বিচার করিত না, তাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। যাহা হউক কৃষ্ণচন্দ্র মিসনরী টমাস সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া অবধি ভাবিতে লাগিল কিরূপ মুক্তিলাভ হয়? মুক্তি লাভের জন্য তিনি পাদরীদিগের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার খৃষ্টানসংসর্গ লাভের একটা উপায়ও হইল। একদিন নদীতে স্নান করিতে করিতে কৃষ্ণচন্দ্র সহসা পদস্খলিত হইয়া হইয়া পড়িয়া যান এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি শুনিলেন যে মিসনারীদিগের মধ্যে একজন ভাল ডাক্তার আছেন। এই শুনিয়া তিনি ডাক্তার সাহেবকে আনিবার জন্য স্বীয় কন্যা ও তাঁহার জনৈক বন্ধু পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। এই ডাক্তার সাহেব আর কেহ নহেন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পাদরী টমাস! কথিত আছে তিনি ডাক্তারী বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।



টমাস সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে পাদরী কেরীও আসিয়া রোগী কৃষ্ণচন্দ্রকে খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তিকা পড়িবার জন্য উপহার প্রদান করেন। বাঙ্গালীদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য পাদরীদিগের এই প্রথম চার প্রস্তুত হইল! এই সময় হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কেরী প্রভৃতি খৃষ্টভক্তগণের ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ভ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র আরোগ্য হইবার পর প্রত্যহ খৃষ্টানী আড্ডায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং মিঃ ওয়ার্ড ও কেরী পুত্র ফেলিক্সের নিকট প্রত্যহ বাইবেল পড়িতে যাইতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বহুদিনের আশা আজ যেন ফলবতী হইল! একদিন মিঃ টমাস সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন যে তুমি বাইবেল পড় কিন্তু তাহা বুঝিতে পার কি? সে বলিল "হাঁ শুধু আমি কেন? আমার বন্ধু গোকুলও বুঝিতে পারিয়াছে।" মিঃ টমাস হাসিয়া বলিলেন "তবে আজ হইতে তোমরা উভয়ে আমার ভাই হইলে, আইস, আজ আমরা কয় ভাইয়ে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করি।" এই সময় তাহাদের দিবা আহারের সময় হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ও তাহার বন্ধু গোকুল ফাঁদে পা দিল! সকলে মিলিয়া একসঙ্গে আহার (খানা) করিতে বসিল। বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তান কর্ত্তৃক ইংরাজি খানা খাইবার ইহাই প্রথম দিন বলিয়া বোধ হয়।

মিসনরীগণ কর্ত্তৃক এদেশীয় লোককে এই প্রকার উপায়ে খৃষ্টান করিবার পথ সুপ্রশস্ত করার জন্য স্পষ্টবাদী ও তেজস্বী পাদরীপুঙ্গব সুপ্রসিদ্ধ য়েভারেণ্ড ৺ লালবিহারী দে মহাশয় উহাকে অবৈধ ও মূর্খের কৌশল মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—It was unnecessary, because the kingdom of heaven does not consist in meats and drinks, and a Hindu may be an excellent Christian though he may have never eaten wiih a single Christian.

বস্তুত তখনকার বঙ্গীয় সমাজে কঠোর জাতিভেদ শৃঙ্খলা এইরূপে শিথিল করিতে পারিলেই এদেশের লোককে খৃষ্টান করা যেন সহজ হইবে বলিয়া পাদরীগণের বিশ্বাস ছিল। পাদরীদিগের এই বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া সরলহৃদয় লালবিহারি দে মহাশয় বলিয়াছিলেন "And we consider the act to have been unwise as it might lead Hindus and Mohomedans believe that to become Christian was only to eat and drink with Europeans. বিচক্ষণ পাদরী লালবিহারী দে মহাশয়ের কথাগুলি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। পাদরীগণ তখনকার কঠোর সামাজিক শাসনের দিনে যে এদেশের লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে পারিত সাহেবের সঙ্গে খানা খাওয়ায় প্রলোভনই তাহার প্রধান কারণ। পাদরীগণের এই সনাতন নীতি এদেশে এখনও বর্ত্তমান!

যাহা হউক মিসনরীদিগের সহিত কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলের একত্রে ভোজন করার সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধু গোকুল কে এবং কোন্ জাতি তাহা জানা যায় না। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতীয় ভুক্ত ছিলেন না তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি! কেন না এখন যেমন ইংরাজি শিক্ষার অবাধ প্রচলনে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকই একসঙ্গে একই স্কুলে একত্রে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন তখনকার দিনে কিন্তু এদেশে এমনটী ছিল না। তখন এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হয় নাই বলিলেই হয়। যদিও স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল তথাপি নিম্নশ্রেণীর লোক প্রায়ই লেখাপড়া শিক্ষা করিত না। যে দু'একজন ছাত্র পড়িত তাহারা কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির সঙ্গে একত্র বসিয়া আলাপ করিতে সাহস করিত না। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণও তখনকার দিনে নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ করিত। এরূপাবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত গোকুলের



বন্ধুত্ব হওয়া সমশ্রেণী ভিন্ন কখনই সম্ভবে না। যাহা হউক উহাদের এবম্ভূত যথেচ্ছাচারিতায় সমগ্র শ্রীরামপুর মহা উত্তেজিত হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয়গণ এই অভাবনীয় ও স্বশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার শুনিয়া ক্রোধে ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের আশা ত্যাগ করিয়া তাহার বাটী হইতে বলপূর্ব্বক তাহার কন্যাকে লইয়া আসিল এবং সস্ত্রীক কৃষ্ণচন্দ্রকে লইয়া শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সনাতন স্বজাতীবাৎসল্যবশত ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিবেন না বলিয়া উহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তখন তাঁহারা তৎকালীন ডিনেমার গবর্ণর সমীপে কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র সাহেবের সহিত খানা খাইয়া সাহেব হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাহার সহিত আর তাহার কন্যাকে রাখিতে পারা যায় না বিদেশীয় বিচারকগণ অনেকেই যেমন অপরূপ যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া থাকেন এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল! গবর্ণর সাহেব তাহাদিগকে বলিলেন "যে কৃষ্ণচন্দ্র সাহেব হয় নাই—খৃষ্টান হইয়াছে। খৃষ্টান হইয়া সে ভালই করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার প্রতি তোমরা কোন রূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তাহাদিগকে ঐ কন্যা প্রত্যার্পণ করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে আইনের আমলে আনিতে না পারিয়া তাহার আত্মীয়গণ তাহার প্রতি নানা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। উত্তেজিত আত্মীয়গণ পাছে তাহাকে হত্যা করে এই ভয়ে গবর্ণর সাহেব তাহার রক্ষার্থ তাহার বাটীতে একজন সিপাই নিযুক্ত করিলেন।

তারপর পূর্ব্বোক্ত ১৮০০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর রবিবারে কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরী কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরে খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষিত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের দীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কেরী সাহেব তদীয়

আত্মজ কেলিক্সকে গঙ্গাগর্ভে নামাইয়া দীক্ষিত করেন; পরে বঙ্গীয় খৃষ্টানের "আদি পুরুষ" কৃষ্ণচন্দ্র পালের দীক্ষা হয়। এই দীক্ষা উৎসবের সময় খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক অপরূপ বাঙ্গালা ভাষায় যে স্তোত্র গীত হয় তাহার প্রথম চরণ এইরূপ :—"হে স্বর্গের স্তব্য প্রভো খৃষ্ট!"

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

---

## অনুনয়।

যে মালা দিয়াছ গলে রচি তব করে
আজি সে শুকায়ে যায় রবি খর করে,
কুসুম ঝরিয়া যবে হবে ধুলি ম্লান
তব প্রেম সখি যেন লয় তার স্থান।

শ্রীপ্রফুল্ল নারায়ণ রায়।

---

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। } ১৩১১। { ১০ম সংখ্যা।

## শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি।

২। রায় শেখর।

রায় শেখরের জীবনী লইয়া আমাদের কিছু গোলে পড়িতে হইয়াছে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে পূজনীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শশীশেখর, চন্দ্রশেখর ও রায়শেখর, সম্ভবত ইহা একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র; বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতও তাহাই, অথচ তাঁহাদের কেহই প্রমাণ প্রয়োগ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

আর এক কথা, তাঁহারা সকলেই রায়শেখরকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "পড়ান গ্রাম নিবাসী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই দুইটী বিষয়েই আমার মতভেদ আছে। প্রথমত আমার মতে রায় শেখর ও চন্দ্রশেখর দুই জনেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এবং রায় শেখর ও শশীশেখর যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম তাহার কোনও বিশেষ প্রমাণ আজিও প্রাপ্ত হই নাই। বরং পদাবলীর শেষে, "পাপিয়া শেখর রায়" "দুখিয়া

শেখর রায়" "কবি শেখর রায়" প্রভৃতি যে নামের বিভিন্ন ভণিতা দেখিয়াছি তাহা সম্ভবত রায় শেখরের।

দ্বিতীয়ত আমার মতে রায়শেখর শ্রীখণ্ডনিবাসী; যদি পড়ানগ্রাম শ্রীখণ্ডের অন্তর্গত ভূতপূর্ব্ব কোনও গ্রাম বিশেষের নাম হয়ত বলিতে পারি না; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিন্তু এ গ্রামের অস্তিত্ব স্থির করিতে পারি নাই।

রায় শেখর যে শ্রীখণ্ড নিবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার পদাবলী হইতেই পাওয়া যায়।—তাঁহার গুরু-বন্দনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব সুমদন
শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখবর বিমল সুধাকর
উজল খণ্ড সমাজে॥
জয় পঁহু নটন—কলারস ধীর।
নিখিল মহোৎসব গৌর গুণার্ণব,
প্রেমময় সকল শরীর॥ ধ্রু॥
রুচির তরুণতর নটবর শেখর
পীতাম্বর বর ধারী।
গাই গাওয়াইত গৌরগুণামৃত
ভব ভয় খণ্ডনকারী॥
পদতল রাতুল পঙ্কজ নহ তুল
পদনখ ইন্দু পরকাশে।
সে পদ রজনীদিনে শয়নে স্বপনে মনে
রায় শেখর করু আশে॥



স্থানান্তরে :—

"শ্রীরঘুনন্দন পতি তাহা বিনু নাহি গতি
যার গুণে ভব ভয় নাঞি॥"
"শেখরের প্রাণ মুকুন্দ নন্দন
তরল করল প্রেমে।"
"পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গা পায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।"

আর এক স্থানে :—

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার।
কহ কবি শেখর গতি নাহি আর॥

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রাম গোপালদাস ও রসিকদাস বিরচিত অপ্রকাশিত রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা নির্ণয় হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারা যায় :—

১। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের একাদশটী শাখা, তন্মধ্যে রায় শেখর অন্যতর।

২। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখামাত্রেই শ্রীখণ্ড নিবাসী ছিলেন, অতএব রায় শেখর শ্রীখণ্ড নিবাসী।

এবং সেই জন্যই বোধ হয় রায়শেখর শ্রীখণ্ডের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"ভূখণ্ড মণ্ডলমাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে"
ইত্যাদি।

৩। শাখা নির্ণয়ে কবি শেখর রায় সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"অষ্টম শাখার পুন করি নিবেদন
কর্ণ মন তৃপ্ত হয় করিতে শ্রবণ॥

রসের বিধান পদ করিলা বর্ণন।
আমি কি কহিব যশ ভরিল ভুবন॥
শ্রীকবি শেখর রায় নামের প্রচার।
শ্রীরঘুনন্দন বিনা নাহি জানে আর॥"

ইহা হইতেও জানা যায় যে, তিনি রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত। এবং তাঁহার সুমধুর পদাবলী ও লোক-মনোহর কবিত্বে তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সেইজন্য অনেক সময় তাঁহাকে সম্পূর্ণ রায়শেখর নামের পরিবর্ত্তে কোথাও শেখর রায়, কোথাও শুদ্ধ শেখর এই ভণিতায় পদাবলী দেখা যায়।

একখানি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ে কবি শেখর রায় সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"ততঃ সদ্‌গুণযুক্তঃ শ্রীকবিশেখর রায়কঃ।
চিত্রাণি গীত পদ্যানি গীয়ন্তে যস্য সজ্জনৈঃ॥"

শাখানির্ণয়ে শশীশেখর রায় ও রায়শেখর যে একই ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণ কোথাও পাই নাই। এবং তাহাতে শশীশেখর রায়ের নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণসাধক দুর্জ্জয়দাসের সিদ্ধ পীঠ কাঁথেশ্বরী তলার সন্নিকটে যে ত্রিকোণ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই আজিও রায় শেখরের ভিটা বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। তিনি সম্ভবত ১৫৫০ হইতে ১৬০০ খ্রীঃ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

রায় শেখরের পদাবলীতে অপূর্ব্ব ছন্দের ঝঙ্কার কিম্বা ভাবের তেমন প্রগাঢ়তা অনুভূত হয় না, কিন্তু সহজ কথায় অতি সুকুমার প্রেমাকরিত ভাব ধারা নির্ঝরিণীর মত হৃদয়ের কূলে কূলে বহিয়া যায়। ভাবের প্রচণ্ড আবেগ, বাসনার তীব্র ঘূর্ণা হৃদয়কে আন্দোলিত, বিধ্বস্ত করে না, কিন্তু ফুলবনে মলয় সমীরণের মত তাহা ধীরে স্পর্শ করে। চণ্ডীদাসের



রাধিকার প্রেমের মত এখানে প্রেম তেমন পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই, এবং বিদ্যাপতির রাধিকার মত বিরহোন্মাদ, মিলনের অতৃপ্তি ও আকুলতা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, বাসনার তীব্র জ্বালা, প্রেম-জনিত ঈর্ষার বৃশ্চিক দংশন তত সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু রায় শেখরের পদাবলীতে ও হৃদয়ের প্রতি-ভাব, মিলন-বিরহের প্রতি চিত্র, নায়কের প্রতি আত্ম-সমর্পণ, অতি সহজে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাধিকা অভিসারে চলিয়াছেন, চারিদিকে "অদ্ভুত তিমির রঙ্গ" এমন কি "আপনি না চিনে আপন অঙ্গ", ঘনঘোর বর্ষার এমন দিনে সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অতৃপ্তি, রাধিকার মনে ঘনাইয়া আসিয়াছে, আজি রাধিকার "মনমাতঙ্গ অঙ্কুশ নাহি মানেরে।" রাধিকা প্রেম-পূজায় তাঁহার চিরবাঞ্ছিতের নিকট রূপযৌবনমনপ্রাণ অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিতে চলিয়াছেন, তখন "শিথিলীকৃত কবরীভার," "নীলোৎপল রচিত হার" কণ্ঠে শোভা পাইতেছে। মেঘেতে বিজলীর মত, নীল বসনা পরিহিতা রাধিকার বেশের অবকাশপথে লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এদিকে "পরিমল পাই ভ্রমর পুঞ্জ, বৈঠল আসি চরণকুঞ্জ, মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ, লাগল মধুপানীরে।" আর "মুখমণ্ডল শশীউজর, হেরি ধায়ল তহি চকোর, উড়িয়া পড়ে হই বিভোর, চাহে পীযূষদান রে॥" এ সব স্থলে কবির বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, কবি যেন বর্ণনা করিতে করিতে আত্ম-হারা হইয়াছেন, ভাবেআবেশে, সৌন্দর্য্যের মোহে, যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

প্রেমোন্মত্ত প্রেমিকার মনের আকুলতা, মিলনের তীব্রতৃষা নিম্ন-লিখিত পদে কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"মো যদি সিনান লাগিয়া ঘাটে আর ঘাটে পিয়া নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পসারিয়া রয়।

বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকেরে দেয়।
আমার নামের একটী আখর পাইলে হরিষে রয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া ফিরয়ে কতই পাকে।
আমার আদর বাতাস যেদিকে সেদিন সেমুখে থাকে।
মনের কাকুতি বেকত করিতে কতনা সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনুমানে॥"

একটীমাত্র পদে কবি রাধিকার উৎকণ্ঠা চিত্রিত করিয়াছেন :—

ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত, উতপত তেজত শ্বাসা।
ক্ষণে ক্ষণে চমকই, ক্ষণে ক্ষণে কম্পই, পদ পদ কহতঙ্গি ভাষা॥
কুলগুণ গৌরব, অতিশয় সৌরভ, বামপায়ে ঠেললুতায়।
দারুণ প্রেম, সেহ নাহি মানত, পলকে পলকে তলপায়॥
অরুণিত আনন, লোরে ভরুলোচন, পিয়াপথ হেরত রাই।
শিশু-পশু-সঙ্গত, করি হরি আওত, গোথুরধুলি উছলাই॥

রাধাকৃষ্ণের মিলনোজ্জ্বল সুন্দর দুইটীরূপ বর্ণনা কবি অমর তুলিকা-স্পর্শে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দোঁহার রূপের, নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর।
হিরণকিরণ, আধবরণ, আধ নিলীম জ্যোতি।
আধ গলেতে বনমালা দোলে, আধগলে গজমতি॥
আধ শ্রবণে, মকর কুণ্ডল, আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়, আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে উড়ে ময়ূর শিখণ্ড, আধশিরে দোলে বেণী।
কনক কমল, করে ঝলমল, ফণি উগরয়ে মণি॥



মন্দ পবন, মলয় শীতল, কুণ্ডল দোলায় বায়।
রসের পাথারে, না জানি সাঁতার, ডুবল শেখর রায়॥"

কবি অত্যন্ত অবহেলায় এক তুলিকা স্পর্শে সুন্দর এক একটি চিত্র পাঠকের মনে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন :—

"রাই কহে মোর জীব কানু।
সেগুণ কহিতে অবশ তনু।"
"রূপ হেরি কোই না বান্ধহ থেহ।"
"রা রা বোলই ধা নাহি পারই
পুলক পূরল সব দেহা।"

স্থানান্তরে,

"নিরমল বদন বচন অমিয়া রসে,
লাজে সুধাকর রোয়।"
"দেখিয়ে নয়ন শীতল করএ
হৃদয়ে পশিয়া রয়॥"

স্থানান্তরে,

গাঅল কোকিল মধুর গীত।
তরল করল ধনির চিত॥

গৌর-লীলাত্মক একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে কবির বর্ণনাভঙ্গী, রচনা চাতুর্য্য কতকটা বুঝা যাইবে :—

নাচত নগরে নাগর গৌর
হেরি মুরতি মদন ভোর।
যৈছন তড়িত-রুচির-অঙ্গ ভঙ্গী নটবর শোহিনী।
কামকামান ভুরুক জোর
করত কেলি শ্রবণ ওর

গীম শোহত রতন পদক
জগজন মনোমোহিনী।
কুসুমে রচিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পীঠে দোলত লোটন ভার
কর্ণে কুণ্ডল দোলনী॥
মহিষ-দধি-রুচি পিঙ্কনবাস,
হৃদয়ে জাগত রাস-বিলাস,
জিতল পুলক কদম্ব-কোরক
অনুক্ষণ মনভোলনি।
গজপতি ছিতি গমন ভাতি,
প্রেমে বিবস দিবস রাতি,
হেরি গদাধর হাসত বোলত
গদগদ আধ-বোলনী।
অরুণ-বরণ চরণ-কঞ্জ।
তহিপর মণিমঞ্জীর রঞ্জ,
নটনেবাজন ঝনন্ ঝনন্
শুনি মুনিমন-ভোলনী।
বদন চৌদিগে সোহত ঘাম,
কনক কমলে মুকুতাদাম,
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন
কত রস পরকাশনী।
মহাভাব রূপ রসিক রাজ, সোহত ভকত নথত মাঝ,
পিরীতি মূরতি ঐহন রচিতি রায়শেখরভাষণি॥

রায় শেখরের সবিশেষ খ্যাতি "দণ্ডাত্মিকালীলা" রচনায়। "দণ্ডাত্মিকা লীলায়" দিবস যামিনীর প্রতি দণ্ডে দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা লীলার এক একটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রভাতে; পৌর্ণমাসী দেবীর আগমন, তাঁহার উক্তি, মঞ্জরী প্রক্রিয়া, কারুণ্যামৃত স্নান, কান্তমোহন বেশ, ব্রজেশ্বরীর জাগরোণৎকণ্ঠা, কুন্দলতার জটিলাভবনে গমন, জটিলার প্রতি কুন্দলতার উক্তি, রাধিকার প্রতি জটিলা, সখীগণের বিতর্ক অরুণোদ্বয়ে মাতৃখণ্ডিতা, শ্রীকৃষ্ণরূপালম্বে মিলন; শ্রীরাধার হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ।

বেলা চারিদণ্ড সময়ে :—

ভোজন লীলা; পঞ্চমদণ্ডে রাধিকার ভোজন। মাতার উন্মাদ, মাতৃ সম্বোধন। ৭ম দণ্ডে গোষ্ঠগমন, অনুরাগ প্রভৃতি। অষ্টম দণ্ডে গৃহে গমন, শ্রীরাধিকার রাগ-বিভঙ্গ; ৯ম দণ্ডে কৃষ্ণোদ্দেশ, দেবোদ্দেশে গমনোৎকণ্ঠা। ১০ম দণ্ডে দিবাভিসার, ভাবোন্মাদ। ১১শ দণ্ডে মিলনোৎকণ্ঠা, উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কাননে কাতর কুলবতি রাই।
চকিত নয়নে ঘন দশদিশ চাই॥
কোকিল কলরবে বিকল পরাণ।
শুনি শুনি কামিনী ভেলি নিদান॥
উথসি উথসি খসি পড়ে নিবি-ডোর।
গদগদ কণ্ঠ শব্দ ঘন ঘোর॥
বৈঠলি অধোমুখী চিতসঞ্চেধন্দ।
সখীগণ কৌতুকে করুকত ছন্দ॥
উতপত তেজনি দীঘলি শাস।
খেনে রোদন করু খেনে করু হাস॥
কহ কবিশেখর শুন সুকুমারী।
কাহে লাগি কাতর আনব মুরারী॥"

১২শ দণ্ডে কৃষ্ণোৎকণ্ঠা। কৃত্যচাতুর্য্য।

১৩শ দণ্ডে। রসপ্রসঙ্গ।

১৪শ দণ্ডে। মিলন।

১৫শ দণ্ডে। হিন্দোলনলীলা। বন ভ্রমণ—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও সখিগণ মিলিয়া কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন। তখন :—

"সকল কানন মণির বন্ধন,
পরাগে পূরিত বটে।
করি মধু পান অলি করে গান,
ময়ূরী করএ নাট॥"

১৬শ দণ্ডে। বংশী হরণ।

১৭শ দণ্ডে। সূর্য্য পূজা। বটুর গমন।

১৮শ দণ্ডে। পাশক ক্রীড়া।

১৯শ দণ্ডে। বনভোজন।

২০ শ দণ্ডে।

"কুসুমিত কুঞ্জে। অলিকুঞ্জে॥
মলয় সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥"

এমন সময় রাধাকৃষ্ণের নিদ্রালীলা, ২১শ দণ্ড পর্য্যন্ত।

২২শ দণ্ডে—ইচ্ছাচাতুর্য্য।

২৩শ দণ্ডে—চাতুর্য্য, মৈত্র, ঔদাস্য।

২৪শ দণ্ডে—মোদন।

২৫শ দণ্ডে—মাদন।

২৬শ দণ্ডে—সংক্ষিপ্ত বিলাস।

২৭ শ দণ্ডে—কুঞ্জশয্যাথান। বিচ্ছেদানুরাগ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—



"দিন অবসান করি অনুমান
কি জানি কিজানি করে।
দোঁহার বদন নিরখি দুজন,
বচন নাহিক সরে॥
রসিক রসিকিনী বিচ্ছেদ-বিকলিনী,
ছুটলি মুখের হাস।
নোর ঝর ঝর বোল থর থর,
খসিয়া পড়য়ে বাস॥
হিয়ায় জ্বানল বাঢ়ল আনল,
দহই দোঁহার দেহা।
করিতে মৈলানি, কি হৈল না জানি,
জাগল দারুণ নেহা॥"

গৃহাগমন। গৃহ প্রবেশ, অর্য্যোভয় এবং স্নেহ।

২৮শ দণ্ডে। পক্কান্ন রচনা এবং লাবণ্যামৃত স্নান।

২৯শ দণ্ডে। কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের উৎকণ্ঠা :—

"হরিণী-নয়নী-ধনী চকিত-নেহারিনী
খেণে খেণে উনমত ভেলা।
স্বজন সোহাগণ তনু মন জীবন,
সতিনী করিয়া তাহে দেলা॥
খেণে খেণে উঠত, খেণে খেণে বৈঠত,
উতপত তেজত শ্বাসা।
খেণে খেণে চমকই, খেণে খেণে ঝমকই
গদগদ বোলত ভাষা॥
কুল-গুণ-গৌরব সতী-যশ-সৌরভ,
পদ পথ ঠেলনু তায়।

দারুণ সাপ্রেম থেহ নাহি মান
পলকে পলকে তলপায়॥
অরুণিত আনন লোরে ভরু লোচন
পিয়া পএ হেরত গোরি।
শিশু-পশু-সংহতি করি হরি আওত
উড়ত গোখুর ধূলি॥
কহ কবি শেখর ধনি পুন হেরহ
আওয়ে নাগর রাজ।
তুয়া মম মানস প্রতিখণে পূরণ
মিলবি পন্থকি মাঝ॥"

৩০ দণ্ডে। উন্মাদ শান্তি। উত্তর-গোষ্ঠ। উভয়ের প্রেমোন্মাদ।

রাত্রি চতুর্থ দণ্ড পর্য্যন্ত। রাজসভায় গমন। গীত বাদ্যাদি শ্রবণ। ভোজন।

রাত্রি পঞ্চম দণ্ডে। কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের ভোজন।

রাত্রি ষষ্ঠ দণ্ডে। নিভৃতে তল্প রচনা :—

"যমুনা পুলিন চম্পক কানন
বিলাস-মন্দির মাঝ।
বৃন্দা বিধুমুখী বিনোদ-বিছানা
করল তাহাতে সাজ॥
কানন শোভন না যায় কহন,
মদন কোটাল তায়।
ফুল-শর করে ফিরয়ে সহরে
কোকিল পঞ্চম গায়॥
সুগন্ধি শীতল বহই অনিল।
পরাগে পূরিল বাট।



সুখের সায়রী, পড়িয়া ময়ুরী
করত বিনোদ নাট॥"

রাত্রি নবম দণ্ডে—সরণিসন্ধান।

রাত্রি দশম দণ্ডে—কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের অভিসার।

"কাজর-রুচিহর রজনী বিশালা।
তছুপর অভিসার করলহি বালা॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথারা।
গুরুয়া নিতম্বিনী যৌবন ভারা॥
কমলিনী মাঝাখিনী উচকুচ জোরা।
ধাবসে চলু চাহে চলই না পারা॥
রঙ্গিনী সঙ্গিসী সভে করু তোরা।
নব অনুরাগিনী নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক আভরণ বাসয়ে বিকারা।
নুপুর কিঙ্কিনী তেজলি হারা॥
লীলা কমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চল ধরি সখী সামা॥
যতনহি নিঃসরু নবগ দুরন্তা।
শেখর আভরণ ভেলি বহন্তা॥

রাত্রি ১১শ দণ্ড। শ্রীকৃষ্ণাভিসার।

রাত্রি ১২শ দণ্ড। মিলন।

রাত্রি ১৩শ দণ্ড। বন ভ্রমণ।

রাত্রি ১৪শ দণ্ড। সঙ্গীত রাস, একস্থান উদ্ধৃত করিতেছি, :—

"মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর, অলিকুল তাহে দেওত সুর।
থৈ থৈ থৈ বাজত যন্ত্র নাচত ময়ুর মাতিয়া।

বৃন্দাবন সুখদ ধাম, তহি বিহরই রসিক শ্যাম,
তরুনীগণ মোহিত মদন গাঅত কতহু ভাঁতিয়া॥
ফুলি অনিল বহই ধীর, ফুলি চলই যমুনা নীর,
ফুলি কানন, ফুলি মহন, ফুলি অলিকুল শোহনী।

রাত্রি ১৫শ দণ্ডে। নৃত্যরাম।
রাত্রি ১৬শ দণ্ডে। রতি-বৈচিত্র।
রাত্রি ১৭শ দণ্ডে। সখিশিক্ষা।
রাত্রি ১৮শ দণ্ডে। আলি-কলা।
রাত্রি ১৯শ দণ্ডে। নায়ক শিক্ষা।
রাত্রি ২০শ দণ্ডে। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।
রাত্রি ২১শ দণ্ডে। সকীর্ণ সম্ভোগ।
রাত্রি ২২শ দণ্ডে। সম্পূর্ণ সম্ভোগ।
রাত্রি ২৩শ দণ্ডে। বিপরীত।
রাত্রি ২৪শ দণ্ডে। রসোল্লাস।
রাত্রি ২৫শ দণ্ডে। স্বাধীন-ভর্তৃকা।
রাত্রি ২৬শ দণ্ডে। সমদন মদালস।
রাত্রি ২৭শ দণ্ডে। শুকোৎকণ্ঠা।
রাত্রি ২৮শ দণ্ডে। সখী-উৎকণ্ঠা।
রাত্রি ২৯শ দণ্ডে। মদন শয্যোত্থান।
রাত্রি ৩০শ দণ্ডে। কথ্‌খটী বিতর্ক।
প্রভাত সময়ে গৃহাগমন।

এইরূপে রায়শেখর বিবিধ ছন্দে, বিচিত্র ভাবে, নব নব রাগ-রাগিণী সংযুক্ত করিয়া "দণ্ডাত্মিকালীলা"র বিবিধ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি দিবাভাগে প্রতিদণ্ডে মানব মনে যে বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হয়, সেই সুরের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিবিধ রাগ-রাগিণীতে



রাধাকৃষ্ণ লীলার যে বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা বড় কম ক্ষমতার কায নহে। দণ্ডে দণ্ডে যেমন মনের সুর পরিবর্ত্তিত হয়—তাহার বিচিত্র বর্ণনা, বিচিত্র ছন্দও তেমনি পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। ছন্দের ও শব্দের উপর কবির অসাধারণ ক্ষমতা যেমনি, ভাব ও বর্ণনা উপরও তেমনি। যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ আশা করি রায়শেখরের কবিত্ব শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

৩। চন্দ্রশেখর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রায়শেখর ও চন্দ্রশেখর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোপাল দাস বিরচিত অপ্রকাশিত সরকার-ঠাকুরের শাখা-নির্ণয়ে নবম শাখায় ইঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে :—

"তবে আর শাখা পুন করি লেখা,
কবি চন্দ্রশেখর নাম।
বৈদ্যকুলে জন্ম উত্তম লক্ষণ,
শ্রীখণ্ডে বসত মহান।"

ইহা হইতে জানা যায় যে কবি চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য, এবং ইঁহার নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে। ইঁহার সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে ইঁহার কবি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল। শ্রীখণ্ড ক্ষত্র তলাতে ইঁহার বসত বাটী ছিল, এবং তাঁহার সুবর্ণময় রসিক রায় নামক বিগ্রহ-মূর্ত্তি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য মোগলেরা তাঁহার বাটী আক্রমণ করিলে তিনি, সেই বিগ্রহমূর্ত্তি বক্ষে করিয়া রাখেন, মোগলেরা সেই অবস্থায় তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। তথাপি জীবনসত্ত্বেও তিনি বিগ্রহমূর্ত্তি ত্যাগ করেন নাই। যথাঃ—

"চন্দ্রশেখর নাম বৈদ্য আছিলা খণ্ডেতে।
যাহার বসতবাটী খণ্ড ক্ষেত্র তলাতে॥

রসিক রায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয়।
সুবর্ণ ঠাকুর বলি মোগল বেড়িল ততালয়।
এক স্থলে রাখি ঠাকুর তবু না ছাড়িল।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগল কাটিয়া ফেলিল॥
কাটা মুণ্ড পুনঃ পুনঃ বলে নরহরি।
সেই সেবাতে গোপাল দাস ঠাকুর অধিকারী॥"

ইত্যাদি।

ইহার অধিক আর কিছু জানিতে পারি নাই। তাঁহার কবিত্বের পরিচয় তাঁহার পদাবলীতে। চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন :—

"গৌর বরণ হেরিয়া বিজুরী গগণে চমতি কৈল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি হারি পরাজিত ভেল॥
দেখ-দেখ মদন-মোহন রূপ।
মাজার শোভায়, গরব ত্যেজিয়া, পলায়ন গিরিভূপ॥
শুনি করিবর, গমন সঞ্চার, চরণ সঁপিয়া গেল।
ভয় পাঞামনে, কুরঙ্গিনীগণে, লোচন-ভঙ্গিমা দেল॥
কেশের শোভায়, চামরীর গলে, নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।
বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া অভিমানে রহি পড়ি॥
যুবতী গরব, ত্যেজিতে গৌরব, নদীয়া নগর মাঝে।
চন্দ্রশেখর কহ বজর পড়িল যুবতী লাজে॥"

ইহার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিও বেশ সুন্দর। রাধিকা বিরহে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন :—

"চাঁদপানে চাহিতে পরাণ মোর চমকয়ে।"
"আমিয়া কিরণ গরল সম লাগয়ে
কোকিল রব ভেল শেল।"



"মলয় সমীরণ, শশধর চন্দন, কোই নহত অনুকূল।
হরি বিনু হার ভারসম দোলয়ে, শূলসদৃশ ভেল ফুল॥
"কাঁহা হাম যায়ব
কাঁহা গেলে পায়ব
মদন মনোহর রায়।"

ইহাতে রাধিকার হৃদয়ের আকুলি ব্যাকুলি ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখনও দারুণ উৎকণ্ঠায় রাধিকা প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন—সেই চিত্রখানি কেমন ফুটিয়াছে। বর্ণের বাহুল্য নাই, অলঙ্কার-কৃতীত্ব নাই, ভাষার আড়ম্বর নাই—কেবলমাত্র গুটিকতক রেখাপাতে এক একটী ছবি অনায়াসে ফুটিয়া উঠে—এই খানেই বৈষ্ণব কবির কৃতীত্ব—রাধিকা :—

নীজ তনুহা হেরি নিরখিত রাই।
নাগর ভয়মে আদর বহু করই॥
না দেখিয়া চকিত নয়নে পুন রহই॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূষণ পরে পুন ত্যজয়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বৈঠি বিহায়ত শেষে॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রেম কি রীত।
অদরশে দরশ রস পরতীত॥"

কিন্তু "আশা পথ চাহি চাহি রজনী ফুরায়ে গেল" তথাপি কৃষ্ণ আসিলেন না; তখন রাধিকা অভিমান করিয়া বলিতেছেন :—

"অদয়া তুয়া হৃদয় বিহি
কুলিশে গঠন হে॥"

স্থানে স্থানে প্রেমের ঈর্ষা—ও অভিমানে রাধিকার আরক্তিম বদন খানি স্ফুরিত হইতে দেখা যায়। তীব্র পরিহাস করিয়া রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

"কহ বঁধু আপন কুশল আমি ত দৈবাহতা।
কার ঘরে নিশি সুখে গো তাই নে
কহিবে ধর্ম্ম কথা।
তোমার বালাই লইয়া মরি।"

এই তীব্র বিদ্রূপের সহিত শোকে দুঃখে অভিমানে রাধিকার বিদীর্ণ্যমান হৃদয়খানির কি সুন্দর ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের তেমন ছন্দের ঝঙ্কার বা শব্দ চাতুর্য্য নাই। তবে স্থানে স্থানে অনুপ্রাসে রস উথলিয়া উঠিয়াছে যথা :—

"আগ্রহ করি রস, বিগ্রহ সাধন, চাহি অনুগ্রহ দান।
নিগ্রহ করি তারে, সংগ্রহ করি লঁহু, কুগ্রহ দারুণ মান॥"

ইত্যাদি।

৪। কবিরঞ্জন।

ইনি রঘুনন্দন ঠাকুরের দশম শাখা। অপ্রকাশিত শাখা নির্ণয়ে এইরূপ উন্নতি আছে :—

"কবিরঞ্জন নামে ছিলা একজন।
শ্রীখণ্ডে বাস তার বৈদ্যকুলে জনম॥
শ্রীরঘুনন্দনে তাঁর ভক্তি অতিশয়।" ইত্যাদি—

ইহা হইতে জানা যায় ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইঁহার নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে, রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। কবিত্ব ইঁহার ছোট বিদ্যাপতি বলিয়া খ্যাতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। "শ্যাবর গৌর একই দেহ" ইত্যাদি সুপরিচিত পদ ইঁহারই রচিত। ইঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

---



# সৎ-মা।

## (বন্ধুজের কাহিনী)

১

যে দিন আমার প্রথমা গৃহিণী শ্রীমতী মহামায়া দাসী আমার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, সে দিন আমার পরিপূর্ণ হৃদয়কলস যেন সহসা একেবারে জল শূন্য হইয়া গেল।

শূন্য স্থান প্রকৃতি আদৌ ভাল বাসেন না, কাজেই শূন্য হৃদয় মধ্যে বায়ুর বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল এবং দীর্ঘশ্বাসের আকার ধরিয়া তাহা মুহুর্মুহু বাহিরে তাহার নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিতে লাগিল।

বায়ুকে দমন করিবার জন্য বহুবিধ মুষ্টিযোগের আশ্রয় লইলাম। পূজার্চ্চনায় মন দিলাম অহরহ হরিনাম করিতে লাগিলাম, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রতিমূর্ত্তিতে গৃহপ্রাচীর আবৃত করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু বায়ুর শাম্য হইল না। শূন্যময় দেবমূর্ত্তি ও দেবমহিমাকে উপেক্ষা করিয়া বায়ু সমান বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বন্ধুবর্গ আমার উন্মাদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যেহেতু বায়ু বৃদ্ধি উন্মাদেরই রূপান্তর।

তাঁহারা এ স্থলে এলোপ্যাথি চিকিৎসাই ফলদায়ক হইবে স্থির করিলেন। যে কারণে এই রোগের সঞ্চার হইয়াছে সেই কারণ অপসারিত করিলেই রোগ দূর হইবে ইহাই তাঁহাদের অভিমত হইল। কাজেই তাঁহারা আমার জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় বার বিবাহের প্রতি বরাবর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল—কাজেই সহসা একথায় আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

কিন্তু কিছুকাল গত হইলে ঔষধটাকে আর তেমন হাতুড়ের ঔষধ

বলিয়া মনে হইতে লাগিল না। বোধহয় এটাও বায়ু বৃদ্ধির ফল! একদিন খুব ভাল করিয়া এক ছিলিম তাহাক সাজিয়া রৌদ্রে পিট দিয়া ঘণ্টাখানেক এ বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিলাম। ভাবিলাম অভাব দূর করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে বলিয়াই—মানুষের এত গৌরব এত শ্রেষ্ঠত্ব। যে জাতি অভাব দূর করিতে পারিয়াছে সেই জাতিই তত সভ্য। হিন্দু সন্ন্যাসী কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া শীত যাপন করিতেছে, এক মুষ্টি চণকমাত্র চর্ব্বণ করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে—সুতরাং সমস্ত হিন্দু জাতিই অসভ্য, আর ইংরাজ নিত্য নবনব পরিচ্ছদে বর অঙ্গ শোভিত করিতেছে, পশুপক্ষী লতাপল্লব সকলকেই আহার্য্য শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছে, সুতরাং ইংরেজ সুসভ্য—ইউরোপ সুসভ্য।

অভাব নিবারণের চেষ্টা না করা মনুষ্যত্বের হানিকর। মহামায়া গিয়াছে বলিয়া, সুস্বাদু ব্যঞ্জন হইতে বঞ্চিত থাকা, পরিচ্ছন্ন গৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়া, সুমিষ্ট আলাপ ও ততোধিক সুমিষ্ট তাম্রকুট এবং মৃদু-পদসেবা হইতে বর্জ্জিত থাকা—এটা মূর্খতা—অসভ্যতা নহে কি? অনেকক্ষণ ভাবা গেল। কিছু মীমাংসা হইল না। পুরাতন দাসী আসিয়া বলিল "বাবু, রাঁধা-বাড়া হইবে কখন? বেলা যে মধ্যাহ্ন হইল!"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া রন্ধনশালে প্রবেশ করিতে গিয়া দুধের ঘটিটা উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল! বায়ুর বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। রন্ধনেও সুবিধা হইল না। হাত পুড়িয়া গেল, পায়ে ফেন পড়িয়া গেল, ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য ঘটিল।

অপরাহ্নে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে এইরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্রবর্জ্জিত বহুবিবাহকারী পিতৃপুরুষগণের শ্রীচরণ উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম করিলাম।



২

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের বিরুদ্ধে এখনও হৃদয়ে যে সামান্য সঙ্কোচ ছিল, কন্যাদর্শনের পর তাহা সমূলে বিলুপ্ত হইল। ঈষদুদ্ভিন্ন যৌবনের সে কি অপূর্ব্ব শোভা। আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবার এতদপেক্ষা মহৌষধ আর ত কল্পনায় আসে না! সুতরাং অসভ্যতা বিসর্জ্জন দিয়া তৎক্ষণাৎ দিন স্থির করিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু ছোঁড়াগুলা বাটী ফিরিবামাত্র একেবারে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। ছোঁড়াগুলার বোধহয় প্রগাঢ় বিশ্বাস কিশোরী ও যুবতীতে তাহাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার, কাজেই প্রবীণ ব্যক্তিকে সে দিকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিলে তাহাদের নিতান্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ওটা অপরিণামদর্শিতার ফল বুঝিয়া তাম্রকুট সেবনে মনোনিবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কিছু দার্শনিক তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়া ফেলা গেল।

এক জনের একটা সামান্য জিনিষের অভাব হইলে লোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে—এমন কি একটা পাশের বালিশের অভাব হইলেও লোকে বলিয়া থাকে "আহা বেচারার শুইবার বড় কষ্ট হইতেছে!" অথচ একটা আজন্মের সঙ্গীর অভাব একটা চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগের দুঃসহ কষ্ট ইহা দর্শন করিয়া দুই একজন ভুক্তভোগী ব্যতীত সাধারণের সহানুভূতি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না—ইহার কারণ কি?

ইহার মূল কারণ বোধ হয় মানুষের ঈর্ষাপরায়ণতা। মানুষ অপরের দুঃখ দেখিলেই থাকে ভাল। তখন তাহার প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশও করিয়া থাকে বিস্তর! কিন্তু সে প্রকৃত পক্ষে যেমন এই কষ্ট দূর করিতে অগ্রসর হয় অমনি চতুর্দ্দিকে হাস্য ও বিদ্রূপের তরঙ্গ উঠিতে থাকে সকলে তাহাকে ধিক্কার দিতে ও তাহাদের মতে উৎপীড়িতা কন্যার পক্ষাবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়। অথচ কন্যার

প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা যে যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের নিকট কত অল্প তাহা কাহারও ধারণায় আসে না।

ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল সুতরাং হুই ছিলিম তামাক পোড়াইয়া আহারান্তে আমার কতিপয় প্রিয় বন্ধুর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রীষ্মাবকাশে নীলমণি আসিল। তাহার ক্রন্দনোৎসুক মুখ দেখিয়া হৃদয়ের সেই বায়ুবেগটা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। আর দেরি মাত্র না করিয়া সেই দিনই শান্তিপুর হইতে বিবাহের পোষাক খরিদ করিবার জন্য আমার ভূতপূর্ব্ব শ্যালকের উপর পরওয়ানা জারি করিলাম।

৩

বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেটা এত হাস্য বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হয় কেন তাহা আজিও বুঝিতে পারিলাম না।

শূন্যগর্ভ গর্ব্বই বিদ্রূপের বিষয়, স্বার্থত্যাগ প্রশংসারই যোগ্য—এ বিষয়ে মতভেদ সম্ভাবনা নাই।

নবীন যুবক যখন আপনার শ্রীহীন দেহ যষ্টিকে নানা প্রকার সৌখীন সজ্জায় শোভিত করে তখন নিশ্চয়ই তাহার মনে এই গর্ব্বের উদ্রেক হইয়া থাকে যে এই মন্মথ-লাঞ্ছন রূপে করলব্ধা কিশোরীর মনোহরণ করিবই!

কিন্তু কোন প্রবীণ ব্যক্তি যখন কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় এখন তাহার এরূপ চিন্তা আদৌ মনে স্থান পায় না। তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র কিশোরীর মনোরঞ্জনের জন্যই এই উপসর্গ ভোগ করিতে হয়।

সুতরাং এস্থলে প্রবীণের এই নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা কখনই পরিহাসের বিষয় হইতে পারে না।



কাজেই আমার বিবাহের বেশ দর্শনে সমুত্থিত রমণীকণ্ঠের কলহাস্য-ধ্বনি শ্রবণে আমার মনুষ্যজাতির বিবেচনা-শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়া গেল।

যাহা হউক আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর প্রফুল্ল মুখপদ্ম দর্শন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার বিবেচনাশক্তির প্রতি একটু উচ্চ ধারণা জন্মিল।

পরদিন বধূ সমভিব্যবহারে গৃহপ্রবেশ করিলাম। নীলমণি মুখ বিষ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এটা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়। পাড়ায় বোধ হয় সকলে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে যখন সৎমা আসিল তখন তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু এটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে সৎমার সপত্নী-পুত্রের প্রতি অসদাচরণের মূল কারণ অধিকাংশ স্থলেই, সপত্নীপুত্রের অসৎ ব্যবহার।

পিতৃভবন-বিচ্যুতা নিরাশ্রয়া বালিকা যখন প্রথম অপরিচিতপুরে অপরিচিত স্বামীগৃহে আগমন করে তখন হইতেই যদি সে ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, ও হিংসা দ্বারা অভ্যর্থিত হয় তাহা হইলে তাহার মনে স্নেহ ও প্রীতির অঙ্কুর উদ্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে কি?

কাজেই কোন প্রকারে বালিকার অভ্যর্থনার জন্য আমাকেই ব্যাকুল হইতে হইল। কিন্তু আমায় অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই।

বধূ রূপে গুণে সমান অধিকারিণী। সে আসিয়াই রন্ধনাদির ভার গ্রহণ করিল এবং আমাকে কোন কাজ করিতে দিল না। রন্ধনও হইয়াছিল অতি সুন্দর। সুতরাং বধূর মনরক্ষার্থ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই—সহজেই অতি-ভোজন ঘটিয়া গেল। এবং নবীন-প্রেম-সলিল-পূরিত হৃদয়-কুম্ভ হইতে বিরহ বায়ু সবেগে নির্গত হইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযতীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

# সাহিত্যে সমালোচক।

সুরম্য উদ্যান বা উপবন প্রস্তুত করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে একজন বা ততোধিক মালীর প্রয়োজন হয়। মালী উদ্যানের শোভা সম্পত্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে। কিরূপ তরু লতায় উদ্যানের শোভা বর্দ্ধিত হয়, কিরূপ বৃক্ষগুল্মলতাকে আবর্জ্জনা বলে, তাহা সমস্তই মালীর জানা থাকায় সে উপযুক্ত গুলিকে রাখিয়া উদ্যানের বিঘ্নকারী উদ্ভিদগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে॥ সুতরাং সুন্দর উদ্যানে উদ্যানপালের অবস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। উদ্যানপালহীন উদ্যান অতি শীঘ্রই সম্পূর্ণ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং জঞ্জাল আবর্জ্জনা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া উদ্যানের ভাল ভাল পুষ্পতরুলতাসমূহকে নিষ্প্রভ, নিস্তেজ করিয়া ফেলে এবং এমন কি সময়ে সময়ে তাহাদের জীবনের পর্য্যন্ত হন্তারক হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্যানপালের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিশেষরূপ জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন, নতুবা অনেক সুন্দর বৃক্ষলতা তাঁহার অজ্ঞতা নিবন্ধন তদীয় কর্ত্তরিকাঘাতে লুপ্ত হইতে পারে আবার বাহ্যদৃশ্যে মনোরম অনেক জঞ্জাল উদ্যানে যত্ন পাইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রও তত্ত্ব বহু বিস্তৃত, ইহার শাখা প্রশাখা শ্রেণী প্রভৃতি অনেক; সুতরাং উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের সকল বিষয়ে সুনিপুণ একজন মালী পাওয়া বড় সহজ নহে; তাই অনেক উদ্যানেই এক এক শ্রেণীর বৃক্ষ লতা তত্ত্বাবধান জন্য তত্ত্ববিষয়ে পারদর্শী মালী দেখিতে পাওয়া যায়। যে মালী বিলাতী ফুলের গাছের সেবা শুশ্রূষায় বিশেষ তৎপর, সে হয়ত দেশীয় পুষ্পাদির বিষয় তাদৃক অভিজ্ঞ নহে, যে পুষ্প বৃক্ষের যত্ন বিশেষ জানে সে হয়ত শাকশব্জীর বিষয় কিছুই জানে না।



বড় বড় নর্সারিতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক বিভাগের বৃক্ষলতার তত্ত্বাবধান তত্তদ্বিষয়াভিজ্ঞ মালীর দল দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। সেই সুব্যবস্থা, তাহা করাই কর্ত্তব্য।

নর্সারিতে নর্সারিতে প্রায়ই বড় ভাব থাকে না। Two of a trade can never agree সুতরাং সেটা কিছু বিচিত্র নহে কিন্তু নর্সারির অধ্যক্ষগণ যে অন্যনর্সারির নিন্দা না করিয়া নিজ নর্সারির প্রশংসা গাহিতে অনেক সময় অক্ষম হন এইটাই বড় দুঃখের বিষয়। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য এক, সুরম্য উদ্যান প্রস্তুত করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, প্রত্যেকেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিলেই সব গোল মিটিয়া যায়, কিন্তু সেটা যেন প্রায়ই হয় না। যাহা বলিবার জন্য এই বিষয়ের উপস্থাপন করিয়াছি তাহাতে পাঠকবর্গকে একটু অতর্কিত ভাবে প্রবেশ করাইবার জন্যই এই সামান্য উপক্রমণিকা করিতে হইল।

সাহিত্যের সহিত সুরম্য উদ্যানের অতি সুন্দর সাদৃশ্য আছে এজন্য সাহিত্যকে উদ্যানের সহিত বহুকাল হইতেই তুলনা করা চলিয়া আসিতেছে।

সাহিত্যউদ্যানে সুবিজ্ঞ সমালোচকই মালীর কার্য্য করিয়া থাকেন, আর মাসিক পত্রিকাগুলিকে সাহিত্যের নর্সারি স্বরূপ বলিতে পারা যায়। নর্সারিতে ভাল ভাল ফল ফুলের চারা কলমই প্রস্তুত হয় তারপর তথা হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করে; মাসিক পত্রিকাগুলিতেও সাহিত্য উদ্যানের অনেক সুরম্য তরুলতার কলম প্রস্তুত হইতে থাকে, পরে উপযুক্ত কালে তাহারা সাহিত্য উদ্যানে স্থায়ী ভাবে রোপিত হয়। এই নর্সারিতে থাকার সময়ই উদ্যানপাল এই সব কলমের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া থাকে এবং যদি বুঝিতে পারে যে

এই কলম ভাল হইবে না, তাহা হইলে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরিকা দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলে, তাহার আর সাহিত্য কাননে উপনীত হইবার ভরসা থাকে না।

সব গাছই যে নর্সারি হইতে উপনীত হয় তাহা নহে, উদ্যানের মাটীর গুণে অনেক উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট তরুলতা আপনা আপনিও জন্মে বিদেশ হইতেও আনীত হয়, পাহাড় পর্ব্বত হইতেও সংগৃহীত হয়; সেই সব তরুলতার দিকে উদ্যানের সেবায় নিযুক্ত মালীর দলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে; তাঁহারা গাছ চিনিয়া উদ্যানে ভাল শোভা হইবে কি না, এদেশী মাটীতে সে সব গাছ বেশ বাড়িবে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া থাকেন। শ্রীহট্টের কমলালেবু বাঙ্গলার মাটীতে টক হইয়া যায়, এমন নয়নরসনালোভন দ্রাক্ষা বাঙ্গলার মাটীতে জন্মে না। সাহিত্যের উদ্যানেও ঠিক এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। উদ্যানে যদি নয়নলোভনীয় বিষ ফলের বৃক্ষ থাকে অথবা সুন্দর অথচ অচেতনকারী মদির-গন্ধযুক্ত পুষ্পলতা থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ অনিষ্টাশঙ্কায় উদ্যানপালের সে সমস্ত উদ্যান হইতে দূরীভূত করাই কর্ত্তব্য অথবা যাহাতে লোকে তাহা বিশেষ চিনিতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্য উদ্যান সম্বন্ধেও ঠিক তাই। সাহিত্য কাননের বৃক্ষলতার ফল এবং ফুল স্ত্রীপুরুষ সকলেই আস্বাদন ও আঘ্রাণ করিয়া থাকেন, স্বীয় স্বীয় গৃহশোভা বর্দ্ধনের জন্য কত যত্নে রাখিয়া থাকেন সুতরাং তাহাদের মধ্যে দেহও মনের অনিষ্টকারী কোন কিছুই থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অতএব সাহিত্যের পবিত্রতা, হৃদ্যতা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি রক্ষাও বৃদ্ধির জন্য সমালোচকের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। উপযুক্ত সমালোচক অভাবে সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য।



যাহার প্রয়োজনীয়তা যত বেশী, তাহার দায়িত্ব ও ততই কঠিন। এজন্য সাহিত্য জগতে সমালোচকের দায়িত্ব অতিশয় অধিক। সমালোচকের আসন সাহিত্যবিদ্ অন্য সকলেরও অপেক্ষাও যেন উচ্চে; তাই তাঁহার দায়িত্বও তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক।

সাহিত্যকাননে প্রাবেশ লাভ করিবার জন্য প্রার্থীগণের গুণাগুণ যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার সমালোচককে করিতে হইবে সুতরাং যদি তাঁহার অনবধানতার জন্য সাহিত্যের উদ্যানে সুরভি কুসুমের নামে নির্গন্ধ পুষ্প চলিয়া যায় অথবা তাঁহার নির্ব্বাচনের দোষে কোন সুন্দর বৃক্ষলতা সাহিত্যকাননে আহৃত না হইয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেজন্য তিনি প্রকৃতই দায়ী এবং বোধহয় সেজন্য তাঁহাকে পরলোকে বাগ্‌দেবীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

সমালোচক যে বিষয় সমালোচনা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন তাঁহার তদ্বিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ আবশ্যকীয় তাহা বলাই বাহুল্য। লেখকের অপেক্ষাও সমালোচকের সে বিষয় অধিক অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন! তাহা হইলে তিনি সমালোচ্য বিষয়ের দোষগুণ বিচার করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আজকাল বঙ্গসাহিত্যের উদ্যানে উপযুক্ত সমালোচকের বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সমালোচনার নামে কেবল অত্যধিক প্রশংসা অথবা বৃথা নিন্দার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

এতদ্দেশে সমালোচনার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র ও পত্রিকা অর্থাৎ সাহিত্যকাননের নর্সারি। এই সব পত্রিকা ও পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাই প্রধানত বঙ্গসাহিত্যের উদ্যান পালের কার্য্য সম্পদন করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান কালের সম্পদকগণের সমালোচনার প্রণালী দেখিয়া অনেক ব্যক্তিই সংবাদ পত্রের প্রশংসাবাক্যে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা

করেন না ; কিন্তু নিন্দাটা গ্রহণ করিতে অনেকের আগ্রহ দেখা যায়। কোন কোন সম্পাদক প্রকৃতই বলিয়াছেন যে কাগজে প্রশংসা বাহির হইলেই যে সেটা সম্পাদকের মত তাহার কোন অর্থ নাই এতদপেক্ষা আর অবনতির ও নিন্দার কথা কি হইতে পারে ?

পবিত্র সমালোচনা কার্য্যের উপর যখন সাহিত্যের উন্নতি এবং অবনতির এত দূর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে তখন সে কার্য্যে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপ বিমুক্ত হওয়া আবশ্যক কিন্তু অনেক স্থলে তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

তারপর সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়দিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা রাখিয়াও ভয়ে ভয়ে বলিতে হয় যে অনেক সময় তাঁহাদের অনেকে স্বীয় জ্ঞান গরিমার পরিমাণ অসম্ভব অধিক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সেই অহংকৃতির তেজে অন্যান্য সকল ব্যক্তিকেই নগণ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক সময় স্বীয় জ্ঞানগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়েন, তথাপি তাঁহারা স্বীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

এক একখানি মাসিক অথবা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিলেই তাঁহাদের বাগদেবীর বিদ্যার ঝুলিটার উপর একটা অসম্ভব অধিকার জন্মে এবং তাহার বলে তাঁহারা অনেক অঘটন ঘটাইয়া থাকেন পূর্ব্বে হয়ত বিদ্যামন্দিরের সহিত অতি কমই দেখা শুনা ছিল এমন অনেক ব্যক্তিও সম্পাদক হইয়াই বিকট সমালোচক হইয়া পড়েন ; তাঁহাদের কর্ত্তরিকার আঘাত বঙ্কিম, ঈশ্বর, অক্ষয় প্রভৃতি তরুগণের উপরও পতিত হইতে ইতস্তত করে না।

এই সব সমালোচক সাহিত্যের শত্রু ; তাঁহারা সমালোচনার নামে সাহিত্যের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়া থাকেন। "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদক



৺ বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর সমালোচক ছিলেন, মন্দ পুস্তক বা পত্রিকা দেখিলে তাহাদের প্রতি তিনি অতি তীব্র কশাঘাত প্রয়োগ করিতেন তাহার জ্বালা বড় সহজে যাইত না কিন্তু তিনি হিংসাদ্বেষ প্রভৃতির গণ্ডী হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। বন্ধুকেও তিনি নিন্দা করিতে বা অপরিচিত ব্যক্তিকেও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অনেক সমালোচক বড়ই আরাম অনুভব করিতেছেন এটা সাহিত্যের পক্ষে ভাল লক্ষণ নহে। যাহাকে খারাপ বলিতে হইবে তাহা কেন খারাপ, কিসে খারাপ সেগুলি বেশ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা একজনের কতবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফলকে উপহাস বিদ্রূপের পেষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া দেওয়া সহৃদয়তার পরিচয় নহে।

অনেক সময়ই আমরা এইরূপ সমালোচনা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হই। আবশ্যক হইলে দুই চারিটা নিদর্শনও যে আমরা না দেখাইতে পারি তাহা নহে। কিন্তু আমাদের কষ্ট এই যে এইরূপ বৃথা কটুক্তিতে যেমন একদিকে স্বীয় সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না অন্য দিকে সাহিত্য অনেক সময় অনেক ভাল জিনিস হইতে বঞ্চিত হয়।

এজন্য আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাহিত্যের এই শত্রুটির প্রতি সাহিত্যরথীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এখনও এমন লোক অনেক আছে যাহারা এই সব সমালোচনাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করে সুতরাং ঈর্ষা প্রণোদিত এইরূপ সমালোচনায় তাহাদের বিভ্রান্ত হওয়া বিচিত্র নহে।

সমালোচক মহাশয় যদি অন্যের উন্নতি দেখিয়া হিংসায় নানা উপায়ে স্বীয় বিষদন্ত প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই উন্নতি খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন পক্ষপাত-দুষ্ট সমালোচনাজালে নিরপরাধী পাঠকবর্গকে আবদ্ধ করিয়া

স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করেন তাহা হইলে তাহাকে সমালোচনা বলা সমীচীন হয় না।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে সকলের রুচি সমান নহে, সুতরাং একই বস্তু দশ জনের নিকট দশ রকম বোধ হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া রুচির দোহাই দিয়া সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলা চলে না।

বঙ্গসাহিত্য আজ আল বেশ উন্নতি শীল, সুতরাং ইহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ এবং তীব্র দৃষ্টি রাখা ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য কিন্তু সমালোচকেরা যদি মনে করেন যে তাঁহাদের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর এ বাঙ্গলা দেশে নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের সেরূপ মুরুব্বীয়ানার প্রশ্রয় দিতে অনেকেই অস্বীকৃত হইবেন। কোন কোন সমালোচক এইরূপ বিষয়ে বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন এবং অনেক সময় ভদ্রতার সীমা বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন! এ গুলি সাহিত্যের শরীরে কলঙ্কের চিহ্ন! সাহিত্যকে সরল, সুরম্য করিতে হইলে এইসব পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতার বাহিরে আসিয়া সমালোচককে দণ্ডায়মান হইয়া ন্যায় বিচারে যোগ্যাযোগ্যতার মতামত প্রচার করিতে হইবে।

সকল সমালোচকই যে এইরূপ তাহা বলিতেছি না তবে যাঁহারা এই শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদিগের হাত হইতে বঙ্গসাহিত্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবের অবতারণা।

সাহিত্যসেবীগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইলেই সুখের বিষয় হয়।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

---



# সমালোচনা।

কৃষকের সর্ব্বনাশ—শ্রীসখারাম গণেশদেউস্কর মূল্য—৵০। প্রচলিত সনালোচনার ধারা অবলম্বন করিয়া প্রভূত সুখ্যাতিমাত্র করিলে এ পুস্তক সম্বন্ধে কিছুই বলা হইবে না। 'সর্ব্বনাশ' উপস্থিত হইলে শুদ্ধমাত্র সুমধুর বাক্যবিন্যাস হৃদয়ে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধির সহায়তা করে না। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার নিরলঙ্কার বেশের সহিত বিধবার শুভ্র বাসেরই মাত্র তুলনা হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ী, সম্রাটবেশী ব্রিটিশ সিংহ কি প্রকারে ধীরে ধীরে নির্ম্মমভাবে এই পদানত হতভাগ্য দেশের রক্তশোষণ করিতেছেন—তাহা পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারি এরূপ ঔদাসিন্য, এরূপ মনের বল, আমাদের নাই—এ কথা স্বীকার করিতেছি। ভারতের এই সমৃদ্ধিশালী রাজধানীতে বসিয়া দেশের কৃষকমণ্ডলীর সর্ব্বনাশের পরিমাণ সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না, কিন্তু যদি কেহ এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিরই যে কোন ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামের কৃষকের খবর ল'ন তাঁহাকে কোন কথা বুঝাইবার দরকার হইবে না—অথচ এই বাঙ্গলা দেশের কৃষকই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। শুনিতে পাই এক প্রকারের মরণ আছে যাহাতে একটীমাত্র তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের মধ্যে বসাইয়া হতভাগ্যের সমস্ত যন্ত্রণা বোধ দূর করিয়া ধীরে ধীরে তাহার জীবলীলার অবসান করা হয়। আমরাও এই প্রকারে মরিতেছি—কোন যন্ত্রণা বোধ নাই, কোন চেষ্টা নাই, কোন আক্ষেপ নাই—শুধু একটীমাত্র ধমনী ছিন্ন এবং তাহা দিয়াই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে আমরা মরিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি। অথচ আমরা সুখী কেন না কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন। আমাদের অর্থ বাড়িয়াছে—কেন না আমাদের রাজা বলিতেছেন—"যদিও তোমাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব ঘটিয়াছে এবং তোমারা প্রতি বৎসর

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে প্রবিষ্ট হইতেছে—তথাপি তোমাদের দেশে টাকা বাড়িয়াছে।" ইহার উপর আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই—কিন্তু কর্ত্তব্য নাই কি?

**মোসলেম জগতে বিজ্ঞান শিক্ষা** - মৌলভী ইমদাদুলহক্ প্রণীত মূল্য ৶০। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা ভারতীতে লিখিত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত। সমালোচ্য গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও আলোচনার যোগ্য। আমরা সমালোচকসুলভ সর্ব্বজ্ঞতার ভান করিতে পারি না। যে পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধটি সংকলিত তাহা সুবিখ্যাত। আজ কালের এই প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের দিনে মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী কৃত Spirit of Islam গ্রন্থ আমাদের সমক্ষে এক নূতন দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। বাংলা ভাষায় মৌলভী সাহেব Spirit of Islamএর এই অংশ প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মোসলেম জগতে জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, গণিত বীজগণিত, ভূগোল, প্রভৃতির কি প্রকার উন্নতি হইয়াছিল—তাহা পড়িতে পড়িতে বিস্মিত হইতে হয় এবং দুঃখ হয় কেমন করিয়া এ সকল প্রাচ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য জগৎ অলঙ্কৃত করিয়াছিল ও বর্ত্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ পুস্তকে যে সকল কথা লিখিত আছে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয় নাই—এবং এ সকল কথার মিমাংসা করিবার মত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আমাদের নাই—আশা করি কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ইহার যথাযোগ্য সমালোচনা করিবেন।

———

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩১১। ১১শ সংখ্যা।

## সৎমা।

(বসুজের কাহিনী)

৪

দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের উপসর্গ কিন্তু এইবার একটু একটু অনুভূত হইতে লাগিল। সাধারণ দ্বিতীয়পক্ষের ভার্য্যাদের সম্বন্ধে যেরূপ জানা ছিল নববধূতে সে লক্ষণ বড় দেখা গেল না। শুনিয়াছিলাম "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"গণ অতিশয় তোষামোদপ্রিয় হইয়া থাকে এবং তাহাদের মানভঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয় সে কারণে বিবাহের পূর্ব্বে "গীতগোবিন্দ" ও নিধুবাবুর সঙ্গীত হইতে ২।৪ কথা কণ্ঠস্থও করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সুষমাতে সে লক্ষণ আদৌ না দেখিয়া মনটা কেমন দিশাহারা হইয়া গেল।

সুষমাকে অভিমান করিতে একদিনও দেখি নাই এবং চাটুবাণী উচ্চারণ করিতে গেলে সে এমনি তীব্র মধুর পরিহাসের হাসি হাসিয়া উঠিত যে আমার লজ্জায় ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিবার অভিলাষ জন্মিত। এইরূপে আমার ধারণা জন্মিল সুষমা যখন সর্ব্বদা আমায় বিদ্রূপ

করিয়া থাকে তখন তাহার আমাকে পছন্দ হয় নাই। এই ধারণার আরও একটি কারণ, সুষমা কাহারও কাছে সাধারণ বঙ্গবধূর মত লজ্জায় ও ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত না। সে সকলের সমক্ষেই বাহির হইত এবং তাহার কলহাস্য-ধ্বনি কক্ষপ্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না! আমার কয়েকটী তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষের দারগ্রস্ত (সুতরাং আমা-অপেক্ষা বহুদর্শী) বন্ধু আমায় অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে এ সকল লক্ষণ বড় ভাল নয়!

কাজেই সেই প্রাচীন বায়ু রোগটার অল্প অল্প লক্ষণ আবার প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আমি কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম আমার সুষমা কাহার কণ্ঠলগ্না হইবার জন্য এত ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু ফল হইল না। কোন সন্ধানই পাইলাম না। বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল। সুষমাকে নজর-বন্দী করিয়া অহরহ তাহার বদন-সুধাকরকে রাহুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার বাসনা করিলাম। কিন্তু সে আমার অভিসন্ধি বুঝিয়াই তীব্র পরিহাসবাণীতে আমায় জর্জ্জরিত করিয়া কলসীকক্ষে মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

আমি হতাশভাবে বসিয়া পড়িলাম এবং মনোদুঃখে কপালে করাঘাত করিতে লাগিলাম।

সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছিল। ডাকাডাকিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখিলাম ভাগিনেয় কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণকে সেই দুঃসময়ে দেখিয়া মনে একটু আনন্দ হইল। সুষমাকে পাহারা দিবার একজন লোক পাওয়া গেল!



বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—এই দুর্য্যোগের প্রতীকার করিবার জন্য ইতিমধ্যে নীলমণির বিবাহ দিয়াছিলাম এবং "ধূলা পায়েই" বধূমাতার "ঘর বসতে"র ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু বাবাজি আবার তাঁহার বধূর মনরক্ষার্থে হুহুঙ্কার করিয়া তাহাকে স্বয়ং তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন! সংসারে নিঃস্বার্থপরতা ও কৃতজ্ঞতার একান্ত অভাব দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি!

যাহা হউক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। কাজেই তাহার আগমনে প্রাণে কিছু সান্ত্বনার সঞ্চার হইল।

আমি আবার একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম—বায়ুরও কিছু সমতা হইল।

এই সময়ে আমার পূর্ব্বতন শ্বশুরালয় হইতে আমার এক শ্যালক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমার নিমন্ত্রণ পত্র আসিল।

একথা সকলেই অবগত আছেন যে মক্ষিকাগণ মধু নিঃশেষ হইলেও মধুভাণ্ডের মমতা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং আশা করি উক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে আদৌ অসঙ্গত নাই।

বিশেষত বায়ুর সম্পূর্ণ সাম্যের জন্য আমি একটু স্থান পরিবর্ত্তনের সুযোগ বহুদিন হইতে অন্বেষণ করিতে ছিলাম।

কৃষ্ণচন্দ্রকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাত্রা করিলাম। সুষমাকেও কিছু নৈতিক উপদেশ দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু ও পরিহাসকুঞ্চিত ভ্রূযুগ আমাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল!

প্রকৃতিও বোধ হয় সুষমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, নহিলে, এই যাত্রা যে ভীষণ অমঙ্গলময় তাহা বুঝিতে আমার আদৌ অবসর দিল না কেন? বামে দক্ষিণে শৃগাল কিছুই দেখিলাম না। কেবল

ছুই একটা পাখীর কাকলিস্বরে যেন সুষমার কলহাস্যের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল।

বিবাহ বাড়ীতে গিয়া পান-ভোজন ও শ্যালক-শ্যালিকাগণের সহিত হাস্য-পরিহাসে চিত্ত সজীবতা লাভ করিল—বহুদিনের রুদ্ধ আনন্দ-স্রোত হৃদয়ে আবার প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তাহার ফলে একদিন প্রাতে শ্যালিকামহলে বসিয়া সুর করিয়া দাশরথী রায়ের পাঁচালি হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেছিলাম, এমন সময়ে সাক্ষাৎ অমঙ্গলরূপিণী আমাদের গ্রামের নাপিতবধূ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল।

নাপিতবধূর মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে শুদ্ধ বায়ু নহে—বায়ু-সখা-অগ্নি পর্য্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। অ্যাঁ কেষ্টার এই কাজ, অ্যাঁ? দুনিয়ায় কাকে বিশ্বাস করিব? আর কাকে বিশ্বাস করিব?

নাপিতবধূ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল কিন্তু আমার বেগবৃদ্ধি দেখিয়া হতাশ ভাবে অশ্বত্থতলে বসিয়া মন দিয়া "জলপান" খাইতে লাগিল।

আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। কাঁটা গাছে পা কাটিয়া—গোশৃঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া—গোময়-আহরণকারিণীগণের ঘাড়ে পড়িয়া এবং তজ্জনিত গালিরসাস্বাদের সুখভোগে অধিকারী হইয়া প্রাণপণে গৃহাভিমুখে ছুটিলাম।

যখন বাটী পৌঁছিলাম যখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর—শরীর উত্যক্ত—চিত্ত বিষবৎ। আমার হিতকারী বন্ধুবর্গ আমার কল্যাণোদ্দেশে আমার দ্বার দেশে সমবেত হইয়াছেন। ময়রাখুড়ো আমায় দেখিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "বাবাজি পূর্ব্বেই জানি এসব লক্ষণ ভাল নয়!" আমার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি বৃষ্টি হইল। উন্মত্তবৎ গৃহে



প্রবেশ করিলাম। কি আশ্চর্য্য! পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠার কি দুঃসাহস! সুষমা রন্ধন করিতেছে এবং কেষ্টা রন্ধনশালার দ্বারে বসিয়া তাহাকে কি পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেছে। পুস্তক খানা যে "বিদ্যাসুন্দর" বা তজ্জাতীয় হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। ছুটিয়া গিয়া কেষ্টাকে এক পদাঘাত করিলাম।

কেষ্টা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

সুষমা ছুটিয়া নিকটে আসিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল "কি ব্যাপার খানা কি? পাগল হইলে না কি?" ক্রোধ দমন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হুঙ্কার করিয়া বলিলাম "হারামজাদি, আমি হইয়াছি? তোরাই ত আমায় পাগল করিয়াছিস্। একটু লজ্জা বোধ হইল না? সম্বন্ধ বিচার পর্য্যন্ত করিলি না? তোদের খুন করিলে তবে রাগ যায়!" বলিয়াই সুষমাকে ধরিয়া পাদুকাঘাত করিতে লাগিলাম। সুষমা কোন কথাই বলিল না। সকৌতুক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

ঠিক সেই সময়ে নীলমণি তাহার শ্বশুরালয় হইতে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে অবতীর্ণ হইল। আমি পৃষ্ঠবল পাইয়া দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম এবং তদ্দণ্ডে উভয়কে বিদায় করিয়া দিবার জন্য পুত্রবরের প্রতি কঠোর আদেশ দিলাম।

সেই দিন অপরাহ্নে কেষ্টা কাঁদিতে কাঁদিতে একদিকে চলিয়া গেল এবং সুষমাও তরণীযোগে তাহার পিত্রালয়ে প্রেরিত হইল।

নৌকা ছাড়িবার সময় একবার ঘাটে গিয়াছিলাম রাগের মাথায় পাদুকাঘাত করার জন্য মনটা কিছু খারাপ হইয়াছিল, তা ছাড়া এতক্ষণ পাপিষ্ঠার মনে কিছু অনুশোচনার উদ্রেক হইয়া থাকিবে, এরূপ আশাও মনে স্থান পাইয়াছিল।

কিন্তু সেরূপ কিছুই দেখিলাম না।

পরিশ্রমী অথচ বুদ্ধিহীন ছাত্রের প্রতি করুণাপরায়ণ শিক্ষক যেমন স্নেহ ও অবজ্ঞা মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে আমার দিকে সে চাহিয়া রহিল, আমি এইরূপ আচরণ দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম।

উপসংহার।

বায়ুর তারতম্যেই আমার জীবনসূত্র পরিচালিত। আমার জীবনের যাবতীয় সুখ দুঃখ ইহারই হ্রাস-বৃদ্ধির ফল—এ কথা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

পরদিন বায়ুর কিছু সাম্য হইলে পদাহত কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুস্তকখানা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম সেখানা "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী"! তাইত —কৃষ্ণচন্দ্রের ছেঁড়া বেগ হইতে তাহার গানের খাতাখানা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলাম তাহাতে সবই "রামপ্রসাদী পদ"—একটাও "নিধুর টপ্পা" বা "রামবসুর বিরহ" নাই! আমার বিশ্বস্তা বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বারবার জেরা করিয়া যাহা জানিলাম তাহাতে কেষ্টা বা তাহার মাতুলানীর চরিত্রে অপবাদ দেওয়া যায় এমন কিছুই পাওয়া গেল না!

বায়ুর প্রকোপ আবার বৃদ্ধি পাইল। নীলমণির উপর অত্যন্ত ক্রোধ হইল। কেন সে সুষমাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিলাম।

সুষমাকে গিয়া যে আবার লইয়া আসিব, তাহাও পারিলাম না—কারণ তখনো সম্পূর্ণ সন্দেহ মিটে নাই—আর লজ্জাও করিতেছিল। এ অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইল। বায়ু-প্রকোপে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম। কবিরাজদের গরু আমার বাটীর নিকটে চরিতেছিল বলিয়া তাহার রাখালকে ঘাকতক পাদুকাঘাত করিলাম সে গিয়া তাহার মনিবকে বলিয়া দিল। কবিরাজ আমার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। নাপিতবৌএর ভাই একদিন পথে আমায় দেখিয়া



মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল বলিয়া তাহাকে কাপড় চুরির অপবাদ দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিলাম। শেষে মোকদ্দমা মিথ্যা প্রমাণ হওয়ায় স্বয়ং জেলে যাইবার ভয়ে জমি বন্ধক দিয়া তাহাকে ২৫৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া সে দায় হইতে উদ্ধার পাইলাম। ময়রা খুড়ো একজন বাগ্‌দিনীর প্রতি আসক্ত এ কথা প্রচার করিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে তুমুল বিবাদ করিয়া ফেলিলাম।

এইরূপে আমার ৬ মাসের মধ্যে অর্থবল লোকবল সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইল। গ্রামে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল।

সেই সময়ে একটি বন্ধুর অনুগ্রহে দূরদেশে একটী কর্ম্ম জুটিল। কর্ম্ম পাইয়া বায়ুর অনেকটা লাঘব হইলে ছদ্মবেশে একবার সুষমার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম।

গোপনে গোপনে সন্ধান লইয়া যাহা জানিলাম তাহাতে বুঝা গেল সুষমার পক্ষে কলঙ্কস্পর্শ অসম্ভব!

তখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে তাহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম।

তখনো রাগ নাই, অভিমান নাই, দুঃখ নাই! সেই সরল আয়ত নয়ন-তটে কৌতুকহাস্য উথলিয়া উঠিতেছে! অনেক করুণ অনুতাপের কথা কথা শুনাইব মনে করিয়াছিলাম, সেই হাস্য-বিদ্যুৎময় চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সব ভুলিয়া গেলাম। সুষমা কি?

তারপর সুষমাকে লইয়া কর্ম্ম স্থানে আসিয়াছি, এখন বায়ুর সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা।

কেষ্টাকেও আসিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু আমার বায়বীয় অবস্থার প্রতি এখনো তাহার অবিশ্বাস দূরীভূত না হওয়ায় সে আসিতে সম্মত হয় নাই। সকলি ভগবানের ইচ্ছা! শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সমাপ্ত।

# তুমি ও সে।

তুমি নৃপতির প্রিয় প্রমোদ-বাগানে
সাজান 'আইভি' লতা—
সে যে প্রকৃতির চারু নিরালা কুটীরে
লুকান অপরাজিতা।
তুমি লোহিত-কপোল গোলাপের মত
আপন রূপেতে ভোর
সে যে শ্যাম পাতা ঢাকা বৈকালী যূথী
ভাঙ্গেনি সরম-ঘোর।
তুমি প্রেম-সরোবরে সোহাগ মরাল
পুলকে বেড়াও ভাসি,
সে যে হৃদিপিঞ্জরে শ্যামা পাখী মোর
প্রাণে ঢালে সুধা রাশি।
তুমি চম্পক বালা ধনীর কুমারী
সদা গরবিনী মনে,
সে যে গরিবের মেয়ে বন মল্লিকা
থাকে বন-গৃহ-কোণে।
তুমি উৎসব গৃহে সাহানা রাগিণী
উজ্জ্বল মধু গাথা,
সে যে নিশিথে লাজুক নব বধূটীর
চুপি চুপি দুটিকথা।
তুমি হীরক খচিত পুষ্প-আধারে
অঙ্কিত ফুল খানি,



সে যে পঙ্কজবালা শৈবালে ঢাকা
তবু ও শোভার রাণী।
তব হাস্যের ছটা খেলে মুখে চোখে
ভাসি উঠে ক্ষণে ক্ষণে
তার বিজলি-সুহাস নিমেষে মিলায়
পাঠল অধর কোণে।
তব উজ্জ্বল রূপ ঝলসে নয়ন
বৈশাখী বেলা সম,
তার শান্ত মাধুরী শারদ যামিনী
সুষমায় অনুপম।
তব পদ্মার মত উচ্ছল প্রেম
উদ্দাম তৃষা তায়,
তার ফল্গুর মত কল্লোলহীন
প্রেম-ধারা বহে যায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

# সংযম শিক্ষা।

( সমালোচনা )

মানুষ সুখের জন্য লালায়িত। প্রথমটা মনে হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সেই সুখ। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা যায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনিত সুখ অতি অল্পস্থায়ী এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ-স্বরূপ। সুতরাং প্রবৃত্তির পথে চলিয়া লালসা পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টায় ফল নাই—প্রবৃত্তি দমন করাই শ্রেয়ঃ।

তাই ভারতবর্ষে নিবৃত্তির ধর্ম্ম এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এজন্য আমাদের আধুনিক মতের সভ্যতাবৃদ্ধি—এই সকল রেলওয়ে টেলিগ্রাম তড়িতালোক প্রভৃতির বিচিত্র আড়ম্বর—নানাবিধ নব নব খাদ্য সামগ্রীর অসীম পারিপাট্য ও সংখ্যাবৃদ্ধি এবং নিত্য নূতন বেশ-ভূষার বিচিত্র প্রকার-ভেদ—আমাদের দেশে ঘটে নাই। কিন্তু তখন যে সুখ, যে শান্তি, যে সন্তোষ হৃদয়ে হৃদয়ে রাজত্ব করিত—আজিকার লালসাময়, তৃষাময়, ঈর্ষ্যাদ্বেষময়চিত্তে তাহার অস্তিত্ব সম্ভাবনা কোথায়?

কিন্তু সেই অটল সংযম সেই অনাবিল অনাসক্তি এক্ষণে আর আমাদের নাই। যে ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই সংযম প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেদিন হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে সেই দিন হইতে আমাদের সব গিয়াছে।

ভিতরে কোন একটা আশ্রয় বস্তু না থাকিলে ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য বস্তু হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করা অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সেই আশ্রয় বস্তু ছিল—সেই ব্রহ্মানন্দ ছিল—তাই তাঁহারা সে অপূর্ব্ব আনন্দের তুলনায় বাহ্যবস্তুর প্রলোভন অবাধে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা সেই ধ্রুব বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়াছি, কাজেই ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তার উপর সোণায় সোহাগা—পশ্চিমের অসম্ভব বাহ্যবস্তু-প্রিয়তা প্রতিদিন তাহার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় এবং অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য মহিমায় অহরহ আমাদের প্রলুব্ধ করিতেছে। এ অবস্থায় এই সুপ্রবল প্রলোভনের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাও করিতে হইবে, নহিলে উপায় নাই। শান্তি ও আনন্দের কথা দূরে থাক্, পাশ্চাত্য-সুলভ এই অসম্ভব বিলাস-প্রিয়তা সত্বরে দমিত না হইলে আমাদের দরিদ্রের ঘরে দুঃখের অবধি থাকিবে না।



সুতরাং এ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "সংযম শিক্ষা" নামক পুস্তক রচনা করিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার পুস্তকে, আমাদের আহারে, পরিধানে, আমোদ, উল্লাসে, যে অসংযম ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাদের প্রতিই বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সকল ছোটখাট বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আমরা বাহ্য বিষয়ের প্রতি সর্ব্বব্যাপিনী অনাসক্তিলাভে অধিকারী হই। সুতরাং এ সকল বিষয় উপেক্ষার নহে। বিশেষত এই সকল বিষয়ে আসক্তির সঙ্গেই আমাদের অর্থভাণ্ডারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সুতরাং দরিদ্রের দৃষ্টি সর্ব্ব প্রথমে এই দিকেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের কেবল মাত্র উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিরূপে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে সে সম্বন্ধে কার্য্যকর প্রণালী-নির্দ্দেশও করিয়া দিয়াছেন।

ইহাই আমাদের প্রয়োজন। শুধু বাক্যে কোন ফল হয় না, কার্য্যত অভ্যাস করিতে হয়। এবং এই অভ্যাস শৈশব হইতে হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার আদর্শ সম্মুখে থাকা চাই।

চন্দ্রনাথ বাবু এ সকল কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু একটা অন্তরায় আছে। যদি সকলে এক সঙ্গে সংযম অভ্যাস আরম্ভ করিয়া দেন তাহা হইতে হইলে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সমাজের মধ্য হইতে এক-জন সংযম আরম্ভ করিতে গেলে, পুত্র কন্যাদের প্রতিবেশীগণের অসৎ-প্রভাব হইতে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। সে জন্য প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুকরণের নিভৃত প্রদেশে উপযুক্ত শিক্ষকাধীনে বালকদিগের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন অন্য উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থকার আমাদের স্ত্রীলোকগণকেও বিলাসপরায়ণা হইতে দেখিয়া তাঁহাদের তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের শিক্ষক পুরুষেরাই। সুতরাং পুরুষ সুশিক্ষিত হইলে, স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার বড় বেশী প্রয়োজন হইবে না। কন্যা পিতার কাছে, ভগ্নী ভ্রাতার কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে শিক্ষা পাইয়া আপনার কন্যাকে আবার সুশিক্ষিত করিতে পারিবে।

"আমোদে সংযম" সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। গ্রন্থকার বলেন "যেখানে শ্রম সেইখানেই বিশ্রামের প্রয়োজন—যেখানে কর্ম্ম—সেইখানেই আমাদের আবশ্যকতা। আমোদ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী নাই! আমোদ কর্ম্মেরই অংশ—কর্ম্মের অন্তর্ভূত, কর্ম্মের অন্তর্গত। যাহাদের কর্ম্ম নাই, তাহাদের আমোদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং আমোদে অধিকারও নাই। আমোদে তাহাদের মহৎ অনিষ্ট ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যোচিত কর্ম্ম না করিয়া, মনুষ্যোচিত কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইয়া বসিয়া বসিয়া কেবল আমোদ-আহ্লাদ করা সর্ব্বপ্রকার অধোগতি, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার অমোঘ, অব্যর্থ উপায়।"

প্রত্যেক স্বদেশ-হিতেচ্ছু ভারতবাসীর এ কথা হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া রাখিবার যোগ্য। যাহাদের গৃহে অনশন বাহিরে পদাঘাত, হৃদয়ে দৈন্য তাহারা কোন্ লজ্জায় আমোদ করে, উল্লাস করে—বিচিত্র বেশভূষা পরিয়া ভদ্রসমাজে বিচরণ করে? গ্রন্থকার থিয়েটার, সারকাস্ প্রভৃতি প্রমোদাগার উঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন! সারকাস সম্বন্ধে যাই হউক, থিয়েটারগুলির অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাহাদের দ্বারা সমাজের যথেষ্ট অপকার হইতেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উঠাইবে কে? সত্বাধিকারী? এত সংযম যদি সত্বাধিকারীদের থাকিত তাহা হইলে গ্রন্থকারকে "সংযম শিক্ষা" লিখিতে হইত না।



গ্রন্থকার "বাক্যসংযম" সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। আজিকার অসার আড়ম্বরময় বাক্‌চাতুরীর দিনে একথা লিখিলে ভাল হইত।

আর একটা কথা। যে অসংযম আজিকার দিনে শুধু দারিদ্রের নয় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিয়াছে—বালকের শরীরে যে বিষ আশ্রয়লাভ করিয়া সমাজদেহকে ঘৃণিত ও কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে সেই কাম-রিপুর সংযম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবীন লেখক শিশু-সুলভ লজ্জায় কেন অযথা সঙ্কুচিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না।

বহু ভয়ে ভয়ে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-অক্ষরে ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ হইতে স্ত্রীসংসর্গ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার এমন ভাবে সরিয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ ধরা পড়িবার আশঙ্কা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

স্বদেশের কল্যাণকামী তাঁহার মত বিজ্ঞ জনেরপক্ষে এই অস্বাভাবিক সঙ্কোচ উপযুক্ত হয় নাই।

যাহা হউক এই পুস্তক অতি উপযুক্ত সময়ে রচিত হইয়াছে। এই দারিদ্র্য ও দুর্গতির দিনে বিলাসের আড়ম্বর প্রতিদিন আমাদের ধ্বংসের পথে অবনতির পথে লইয়া যাইতেছে। মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইতেছে—অশান্তির হাহাকার উঠিতেছে—হৃদয় অবসন্ন হইতেছে। মনুষ্যত্বলাভ করিতে না পারিলে আমাদের কোন আশাই সফল হইবে না। আজিকার দিনে জাতীয়উন্নতিসম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইতেছে। কিন্তু মনুষ্যত্বলাভ ব্যতীত কোন প্রকার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। এবং মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম সোপান ইন্দ্রিয়-সংযম।

আমরা প্রত্যেককে চন্দ্রনাথ বাবুর এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি।

## ৪। কবিরঞ্জন।

( পূর্ব্বানুস্মৃতি )

ইতি পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, রসিকদাস ও গোপালদাস বিরচিত প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন অপ্রকাশিত "রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা নির্ণয়" গ্রন্থের ৯ম শাখায় উল্লিখিত হইয়াছে যে কবিরঞ্জন নামে শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্যবংশোদ্ভব একজন কবি ছিলেন, তিনি রঘুনন্দনের শিষ্য; এবং কবিত্ব শক্তিতে তিনি যে "ছোট বিদ্যাপতি" বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এ কথাও শাখানির্ণয়কার সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু মাঘ মাসের "বঙ্গভাষা" পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় প্রবীন লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির "কবিরঞ্জন" উপাধি পাওয়া যায়। মিথিলায় এ পর্য্যন্ত ঐ উপাধিযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় নাই পরে প্রমাণ পাইয়াছি যে, "কবিরতন" ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির পদ মিথিলায় পাওয়া যায়। কবিরতন ও কবিরঞ্জন সম্ভবত এক। * * * কবিরঞ্জনের পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়াই মনে হয়।"

আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না। আমাদের মতে কবিরঞ্জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাহার রচনা ও বিদ্যাপতির রচনায় পার্থক্য সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তবে তিনি যে "ছোট বিদ্যাপতি" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন তাহার কারণ বোধ হয় তিনি বিদ্যাপতির আদর্শে সময়ে সময়ে পদাবলী রচনা করিয়া থাকিবেন। তবে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। বিশেষত যে ভাষাগত প্রমাণের বলে নগেন্দ্রবাবু আমাদের গোবিন্দদাস কবিরাজের যশোকিরীট



হরণ করিয়া সুদূর মিথিলানিবাসী জনৈক গোবিন্দ ঝার মস্তকে বাঁধিয়া দিতেছিলেন, তাহাও সকল সময়ে তাঁহার যুক্তির অনুকূল নহে। উদাহরণ স্বরূপ দুইটিপদ পদকল্পতরু হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কি কহব রাইয়ের গুণের কথা।
সবগুণে তারে গড়িলা ধাতা॥
এ রস-বিলাস করিল যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটন গান।
অমিয়া অধিক করিনু পান।
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে।
দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুনহে পরাণ বল্লভ সখা।
সে ধনী পুন কি পাইব দেখা॥
নয়নবান সে হানিল যবে।
বিভোর হইয়া রহিনু তবে॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান।
বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥

আর একটী পদ :—

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব।
কবে পিতানন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
ক্ষীর সর মাখন খায়ব॥
কবে প্রিয় ধবলী শাঙলী সুরভি লেই
সখা সঙ্গে দোহি দোহায়ব।
কবে প্রিয় শ্রীদাম সুবল সখা মেলি
কাননে ধেণু চরায়ব।

কবে যমুনা-তীরে নীপ তরুমূলে
মোহন বেণু বাজায়ব।
কবে বৃষ ভানু কিশোরী গোরী সঙ্গে
কুঞ্জহি রাস বিহারব।
কবে ললিতাদি রাইক প্রিয়সখী
আবেশে কোর পর লয়ব।
কহে কবিরঞ্জন ঐছন শুভদিন
রাইক মান মানায়ব॥

ইহা বিদ্যাপতির ভাষা বলিয়া মনে হয় না—বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী, ও "কবিত্বের পাঞ্জার ছাপ" এ পদাবলীতে মুদ্রিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

কবিত্বের নিদর্শন স্বরূপ কবিরঞ্জনের কয়েকটী পদ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। মাধুর্য্য, সরসতা ও কল্পনার বিচিত্র লীলা ভঙ্গীতে, ছন্দের অপূর্ব্বধ্বনি ও ঝঙ্কারে তাঁহার "ছোট বিদ্যাপতি" আখ্যা অনেক সময় সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যথা :—

"কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।
একজীউ বিহি সে গড়ল ভিন দেহ॥
কহিলে সে কাহিনী পুছে কত বেরি।
নাজানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনে দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনে পিয়াসে পানী নাহি পীব॥
উর বিনুশেজ পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনে তাম্বুল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥



আন সঞ্জে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষে না রহয়ে গেয়ান॥
কহি কবি রঞ্জন শুন বর-নারি।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি॥

যে তুলিকাস্পর্শে প্রেম-বিহ্বল হৃদয়ের চিত্রখানি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বড় সাধারণ নহে!

আর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা পদকল্পতরুতে নাই পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী নামক সংগ্রহ গ্রন্থে আছে। কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের কবি, এবং পীতাম্বর দাস ও শ্রীখণ্ডের কবি, সুতরাং অন্যত্র অসুলভ কবিরঞ্জনের পদাবলী পীতাম্বর দাসের সংগ্রহ করা বিচিত্র নহে :—

রাধিকা তাঁহার প্রিয়তমের সাক্ষাৎলাভে চলিয়াছেন, বর্ষাকাল, রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা, সর্প ও হিংস্রজন্তুসমাকুল বনপথ, রাধিকার কোনদিকে দৃকপাত নাই, প্রেমে তন্ময় একাগ্রমূর্ত্তি, হৃদয়মন তাঁহার প্রিয়তমের চরণে উৎসর্গীকৃত, দূরে নদী গর্জ্জন করিতেছে, অহীকুল চরণবেষ্টন করিতেছে, ফণিমণি দীপশিখার মত পথিপার্শ্বে জলিয়া জলিয়া উঠিতেছে। কবি কি সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন :—

"পন্থ পিছর নিশি কাজর কাতি।
পাতরে ভৈলা নদী সভরাতি॥
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি শঙ্ক।
সুন্দরী হৃদয়ে সুপুর পরিপঙ্ক॥
কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
তুআ অভিসারে না জিএ বরনারী॥
বরাহ মহিশ মৃগ পালে পালাঅ।
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরাঅ॥

ফণি মণি দীপ ভরমে দেই যুক।
কত বেরি লাগিলা নাসিনী মুখে মুখে মুখ॥
কহে কবিরঞ্জন করহ সন্তোষ।
আজুকার বিলম্ব গমনে নাহি দোষ॥

আর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা অধীরা নায়িকার উক্তি, পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী"তে সঙ্কলিত হইয়াছে :—

চরণ নখর মণি রঞ্জন চাঁন্দ।
ধরণী লোটায়ত গোকুল চান্দ॥
ঢবকি ঢবকি পড়ে লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি করল পহুঁ মোর॥
রোখে তিমির এত বৈরিক জনে।
রতনক ভৈলাল গৌরিক ভাণ॥
নারী জনমে হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি॥
লাগল কুদিন মুঝে করলহুঁ মান।
অবহুঁ না নিকসএ কঠিন পরাণ॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারী।
প্রেম অমিয়া রসে লুবধ মুরারী॥

অভিমান অনুতপ্ত রাধিকার সাশ্রু নয়নকমল দুইটী, আরক্তিম মুখচ্ছবিখানি, এবং হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা কবির তুলিকাস্পর্শে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদাবলী হইতেই পাঠকগণ তাঁহার কবিতার রসমাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন, আশা করা যায়।

৫। গোপালদাস।

তাঁহার পূর্ণ নাম রামগোপাল রায় চৌধুরী। পিতার নাম শ্যাম রায় চৌধুরী, পিতামহের নাম গঙ্গারাম চৌধুরী। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ



চক্রপাণি চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতা মহানন্দ চৌধুরী গৌরাঙ্গ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। স্বরচিত "রসকল্পবল্লী" গ্রন্থে গোপালদাস স্বয়ং তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়।
নীলাচলে দুইভাই প্রভুকে মিলয়॥
রঘু নন্দনের সেবক বলি প্রীতি করিলা।
দুই জনের মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা॥
মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
সেবাধর্ম্ম করি তুমি করহ সাধন॥
চক্রপাণিকে কহেন তুমি সংসারি বৈষ্ণব।
পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব।
তাঁর আজ্ঞা পাঞা দুঁহে খণ্ডকে আইলা।

তাঁহারা দুই জনে শ্রীখণ্ডে আগমন করিলে, সরকার ঠাকুর প্রীতি সহকারে তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ প্রদান করেন। আজিও শ্রীখণ্ডে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বংশাবলীর তালিকা আমাকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন, তাহাতে চক্রপানী চৌধুরী মহানন্দ চৌধুরী হইতে গোপালদাস, পীতাম্বর দাস ও আজি পর্য্যন্ত সমস্ত বংশাবলীর নাম সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। গোপালদাস জাতিতে বৈদ্য।

শ্যাম রায়ের দুই পুত্র,—মদন গোপাল ও রামগোপাল। জ্যেষ্ঠ মদন গোপাল একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, "গোবিন্দ লীলামৃত" গ্রন্থে তিনি বিস্তর পদাবলী রচনা করেন। যথা :—

"তার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ধুরী মদন রায়।
রাধাকৃষ্ণলীলা কথা সদায় হিয়ায়॥

গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছে বৈষ্ণব পদধূলি॥"

আজি আমরা রামগোপাল বা গোপালদাসের পরিচয় লইব।

গোপালদাস স্বরচিত "রসকল্পবল্লী" গ্রন্থে মাতৃকুলের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"অল্পকালে পিতৃবিয়োগ না কৈল অধ্যয়ন।
মাতা চন্দ্রাবলী মোরে করিলা পালন॥
মাতামহ মহাবংশ গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়।
প্রমাতামহ মধুসূদন বৈষ্ণব-আশয়॥
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে তিঁহ করেন বায়ন।
যাহে নৃত্য করেন শ্রীশ্রীরঘুনন্দন॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীখণ্ডে যে কীর্ত্তন সম্প্রদায় ছিল, যে সম্প্রদায়ে শ্রীরঘুনন্দন নৃত্য করিতেন, সেই কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মৃদঙ্গবাদক "বৈষ্ণব আশয়" শ্রীমধুসূদন দাস তাঁহার প্রমাতামহ। মাতামহ মহাবংশ গৌরাঙ্গ দাস, মাতার নাম চন্দ্রাবলী। অল্প বয়সে গোপালদাসের পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং লেখাপড়ায় তাঁহার ততটা আস্থাও ছিল না। মাতা চন্দ্রাবলীই তাঁহার পুত্রকে পালন করিতেন।

গোপালদাস "রসকল্পবল্লী" প্রণয়ন করিয়াই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কি উপলক্ষে এ গ্রন্থ রচিত হয় সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আচার্য্য ঠাকুর প্রিয় রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
গঙ্গাপার বসতি নাম ফরিদপুর॥
তিঁহ এক সেবকের শিক্ষার কারণ।
আমাকে শিখাইতে কহিলা কথন॥



সেই ক্রমে ভাষা কৈল নাহি লবে দোষ।
রাধাকৃষ্ণ কথা দেখিলে সন্তোষ॥"

পুস্তকখানি দ্বাদশ কোরকে বিভক্ত,—ইহাতে বিচিত্র ছন্দে ও রমণীয় ভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ কোরক :—

১ম কোরক—মঙ্গলাচরণ।
২য় কোরক—নায়ক বর্ণন।
৩য় কোরক—নায়িকার পরিচয়।
৪র্থ কোরক—ভাব বিচার।
৫ম কোরক—নায়িকা বর্ণন।
৬ষ্ঠ কোরক—বিপ্রলম্ভ।
৭ম কোরক—ভাব অনুরাগ।
৮ম কোরক—অষ্ট নায়িকার ভাব।
১০ম কোরক—সম্ভোগ বিবরণ
১১শ কোরক—নানালীলা।
১২শ কোরক—গ্রন্থ সমাপ্তি।

এই কয়টী কোরক লইয়া যে, মনোরম কাব্য-কুসুম-স্তবক রচিত হইয়াছে তাহার অপূর্ব্ব সুষমা ও সুরভিতে মন মুগ্ধ করে।

এই গ্রন্থ খানির রচনাকাল ১৫৬৫ শকাব্দা, যথা :—

"আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্গ শর-ব্রহ্ম নবপতি শাকে॥"

এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইতে প্রায় সাতমাস লাগিয়াছিল। কেতু গ্রামে এই গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হয় এবং শ্রীখণ্ডে ইহার সমাপ্তি :—

"সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।
বুধবার দীপ যাত্রা হইল প্রত্যাসন্ন॥

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি।
পুস্তক হৈল কৈল দণ্ডবৎ নতি॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈষ্ণবখণ্ডে।
বৈষ্ণব গোসাঞীর দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥"

এই গ্রন্থ ছাড়া আরও বিস্তর পদাবলী তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাস বিরচিত "রসমঞ্জরী" নামক একটী সংগ্রহ আছে, তাহাতে গোপালদাসের অনেকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে; "পদ কল্পতরু" গ্রন্থে ও তাঁহার কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন "গোপাল দাস কৃত রসরতি মঞ্জরী" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ থাকিলেও গ্রন্থখানি অশ্লীলতাপূর্ণ। সেইজন্য সভ্য সমাজে প্রকাশযোগ্য নহে।" আমরা সে গ্রন্থ দেখি নাই।

গোপাল দাসের রচনা মৈথিল ও মিশ্র মৈথিল ভাষায় রচিত। রচনার ভাষার বিশেষত্ব এই যে তাহাতে একটী প্রাচীন রচনা-প্রণালীর ভঙ্গী সুস্পষ্ট, অনেকটা যেন প্রাকৃত ভাষার নিকটাত্মীয় বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার পদাবলী বেশ সুমিষ্ট। তাহাতে অবাধকবিত্বের সুবিমল উৎসধারা, কিম্বা কল্পনার ভোগবতী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। ভাবের প্রগাঢ়তাও তত দেখা যায় না, তবে সাধারণ ভাব সুমিষ্ট পদে ও সুন্দরছন্দে সুরঞ্জিত হইয়াছে। লেখায় লেখকের একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে —

সখ্যুক্তি।

বিরহ অনলে জদি দেহ উপেখবি।
খোঅবি আপন পরাণ।
তু অনুচর সখি কোই না জীঅবি
সবহু করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আঅবি গেহ।
তোঁহা দসা অব সো জব সুনইব
তব কি ধরিব সই দেহ
আপনক হাতে রমণী কুল ঘাতবি
হানবি স্যামরু চন্দ্র।
জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুআ ঘোসব
দোসর কর্ম্ম সুবন্ধ॥
সজল কমলফুলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোপাল দাস আসত পূরব
রাধামাধব সেব॥



ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে এইরূপই ভাবের কবিতা গোবিন্দদাসের পদাবলীতে আমরা দেখিয়াছি :—

বিরহে-অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত কোই না জীয়ত
সবহুঁ করবি সাবধান॥
সুন্দরী মাধব আওব গেহ।
তোহরি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥
আপনক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামর চন্দ।

জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
হোয়ব কলমষ্ বন্ধ ॥
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দ দাস কহ আশা তব না পূরব
রাজা মাধব সেব।

পূর্ব্বোক্ত পদটি কিন্তু গোপাল দাসের বলিয়া তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাস রচিত "রসমঞ্জরী" গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। সম্ভবত তাঁহার এ অসাবধানতা পিতৃভক্তির আধিক্যবশত ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা অমার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই।

রাধিকার কথায় সমস্ত অশ্রু সঞ্চিত করিয়া, অতি সহজ ভাষায়, কবি বিরহিণীর হৃদয়ের ভাব কি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন। নিম্নে সেই পদটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চৌদিকে বকুল বন গুঞ্জরে ভ্রমরা।
কোকিলী কুহুরে ডাকে পেখন ধরে মউরা ॥
বড় দুঃখ লাগে সই বড় দুঃখ লাগে।
রজনী জাগিএ আমি শ্যাম অনুরাগে ॥
সিরীস কুসুম দলে সেজ বিছাইঞা।
এ ঘর বাহির করি স্যাম পথ নিরখিআ ॥
দারুণ মদন মোরে জত দেঁই তাপ।
হেন মনে উঠে গো জমুনাএ দিএ ঝাঁপ ॥"

আর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চরণে ধরি তুহুঁ কত বেরি নিসেধলুঁ
বেরি বেরি সাধলুঁ হাম।
বিরস বঅনে হেরি মোহে তুহুঁ কোপলি
চিতে না গুনলি পরিনাম ॥
সুন্দর সরল হৃদঅ তোহাঁরি।
কুটিলক সঙ্গে প্রেম বাঢ়াঅলি
বঞ্চলি দিন দুই চারি ॥
গুরুজন বচন হিত নাহি মানলি
বসন পালটি নাহি পিন্ধ।
বিরহক বেদনে তনু-মন জারলি
অব তুআ ভাঙ্গল নিদ ॥
ধরণী শয়নে পাতর মহাবঞ্চসি
পুছইতে হেন নাহি কোই।
তুআ মুখ হেরি অবহু জীউঁ ফাটত
গোপালদাস মনু রোই ॥"

মুগ্ধাখণ্ডিতা নায়িকার উক্তি উপলক্ষে কবি বলিতেছেন :—*

* এই পদটাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে "পদকল্পতরু" গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে :—
ছল করে রাণী কতয়ে পরলাপসি
তোহারি বচন পরমাণ।
চারি প্রহর রাতি জাগিয়া পোহায়নু
আওলি রাতি বিহান ॥
মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ।
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
হেরি পাওল বড় সুখ ॥
ভালহি সিন্দুর কাজরে পূরল
বদনহি দশসথ রেখ।
হেরইতে তোহে জাল মোহে হোয়ত
যাবক রাগ পরতেক ॥
কমলিনী পাই সবরস তুলসি
না বুঝলি মালকী-গন্ধ।
কহই গোপালদাস না সমুঝিলি
কি ফুলে কিয়ে মকরন্দ ॥

ছল করি বানীআ আপন ঘরে আনলুঁ।
তুহারি বচন পরমাণে।
চারি চৌপর নিসি জাগি পুহাঅলুঁ
আঅলি রাতি বিহানে॥
মাধব আজি তুহুঁ দেঅলি বড় দুখ
ভাউই আরতি নাহি কোই তোহে
হেরি পাঅলুঁ সুখ॥
ভালহি সিন্দুরে কাজর সক পূরল
বদনহি দশনক রেখ।
হেরইতে তোহে মোহে লাজ লাগই
জাকর রাগ পরতেক॥
কমলিনী পাময় পরম রস ভাবলি
না বুঝলি মালতিক গন্ধ।
গোপালদাস কহে উনমত না জানাএ
কি অো ফুলে কি মকরন্দ॥"

কাজেই

"শীতলচন্দন গরল সম লাগাঅে
মলয়জ অনল হুতাস।
লোচনে নীর থির নাহি বাঁধই
কান্দই গোপালদাস॥"

সখীরা কৃষ্ণকে বলিলেন, "করিলে কি? এমনি করিয়া সরলা বালিকারে মুগ্ধ করিতে হয়; সে যে সর্ব্বস্ব তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছে; সে যে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না:—

"মাধবী তোহে কি বুঝিএহেন রীত।



বিদি দোষে বালিকা কাহে উপেখলি
নাবুঝলুঁ তোহারি চরিত॥
বদনে আঁচর দেহ থিতি মহা বিলুঠই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতী ভমরী মিলল নাঞি নোকসি
মাতলি নলিনী মধুপানে॥"

স্থানান্তরে নায়িকার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে—সুন্দর করুণচিত্র খানি কবির সহজ বর্ণে, বিচিত্র কল্পনার বর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে:—

বিরহ-ব্যাধি সমাধি নাঞি পাঅই
অনুখনে উচাটন গেহ
কাঞ্চন বরণ মলিন হেরই
উজাগরে বঞ্চই সেহ॥
মাধব অতিথীন ভৈলাল রাধা।
বিরহ বেআকুল তাহে তনুখীন ভেল
তাই কত উপজল বাধা॥
থিতি মোহে সুতই কতই তনু লোটই
খনে খনে হঅ উনমাদ।
ক্ষণে মোহ লোহ ভই কাঁপই খনে খনে
খনে তনু হঅ অবসাদ॥
ঐহে দসাদস শুনাইতে সহচরি
করই মরণ প্রতিকার।
গোপাল দাস চরণে ধরি সাধই
তোঁহে কি জাঅবি আর॥"

"বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ" হইতে সুধী পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র

নাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় যে পীতাম্বরদাসের "রসমঞ্জরী" মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পদকয়টী আছে।

"পদকল্পতরু" গ্রন্থে গোপালদাসের আর কয়টী পদ আছে,—দুইটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যূথে যূথে রঙ্গিনী বরজক কামিনী
যামিনী কানন মাহ।
সবজন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
করে ধরি রাইক বাহ॥
সজনি অবহরি কোন কানন মাহা গেল।
গুণবতী গুনহি মনহি মন বান্ধল
তাগর অনকুল ভেল।
ঠামহি ঠাম চরণ চিহ্ন হেরই
রাই করল যাঁহা কোর।
কুসুম তোড়ি রহঁ বেশ বনাওল
সুরত-রভসে ভেল ভোর॥
কিশলয়-শেজ ঠামহি ঠাম হেরই
টুটল কত ফুলমাল।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমলে কানন বাসন্দ
গুঞ্জরে মধুকর-জাল॥
ধনি ধনি রমণী শিরোমণী সুন্দরী
আরাধিলা মনমথ দেব।
গোপালদাস কহ তু সহচরী সহ
রাধা মাধব সেব॥

আর একটী পদ :—

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।



মধুর সুগোকুল নন্দ ছবিলে
শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র॥
মুরলীধর মধু সূদন মাধব
গোপীনাথ মুকুন্দ।
কেলি-কলা-নিধি কুঞ্জ বিহারী
গিরি-ধর আনন্দ-কন্দ॥
ব্রজনাগর ব্রজ- রাজকি নন্দন
ব্রজ-জন-নয়নানন্দন।
রাধা-রমণ রসিক রস-শেখর
রসময় হাসন মন্দ॥
গোপ-গোপাল গোপীজন বল্লভ
গোকুল-পরম-আনন্দ।
কমল-নয়ন করুণাময় কেশব
দাস গোপাল দেহ পদ-মকরন্দ॥

পূর্ব্বে যে সমস্ত পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, আশা করি তাহা হইতেই পাঠকবর্গ প্রেমরসার্দ্র কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাইবেন।

গোপালদাসের পদাবলীর স্থানে স্থানে তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়ের পরিচয় মনমুগ্ধ করে। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন :—

"ভূত ভবিষ্যৎ আর যত পাপী আছে।
সকল গণিতে অল্প হয় মোর কাছে॥
অপার গণিয়া পহুঁ লইলুঁ শরণ।
আপন গুণেতে কর মোর নাইক ভজন॥"

রঘু নন্দন ঠাকুর বংশীয় রতিকান্ত ঠাকুর তাঁহার ইষ্টদেব ছিলেন। গুরুদেবের তিনি এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"জয় জয় মুকুন্দদাস শ্রীনরহরি।
জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী॥
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাই।
ত্রিভুবনে যাঁর বংশের তুলনা দিতে নাই॥
জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম।
তাঁহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুণ ধাম॥
তাঁর বংশের মোর ইষ্ট ঠাকুর রতিকান্ত।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমদাতা পরম নিতান্ত॥"

গোপাল দাসের গুরুভক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার ইষ্টদেবের ইহধাম ত্যাগ করিলেন, কিন্তু গোপাল দাস তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলেন :—

"জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লাপঞ্চমী দিবসে।
অপ্রকট হইলা প্রভুলোকে এই ঘোষে॥
আমি সে প্রকটরূপ দেখি নিরন্তর।
জন্মে জন্মে হই যেন তাঁহার কিঙ্কর॥"

তাঁহার প্রিয়তমের মোহনমুরলী চিরদিন তাঁহাকে আকর্ষণ করিত, তিনি সংসারে আদৌ মন বাঁধিতে পারিতেন না। আক্ষেপ করিয়া সদাই বলিতেন :—

"হরি হরি আমার এমন কবে হ'বে।
বিষয়-দারুণ বিষ জঞ্জাল টুটিবে॥
দায়-সুখ-ভোগে মুক্তি হৈব বিরকত।
শরণ লইবশুক বৈষ্ণব ভাগবত॥
সংসার সুখের মুখে আনল জ্বালিয়া।
জাতিকুল—অভিমান সকল ছাড়িব।
গোপাল দাসের আশা কত দিবসে ফলিব॥

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

* * * * *



## কবির প্রতি।*

হে কবি তোমার শ্যাম মালঞ্চ সুন্দর
বসন্তে শুকাল কেন? প্রত্যাখ্যাতা আজি
বল কোন দুর্ব্বাসার শাপে তোমার সে
শকুন্তলা;—প্রিয়তমা কবিতা সুন্দরী?
আইনের হিমস্পর্শে শুকাল কি কবি
তোমার সে ভাবময়ী স্বর্ণ কমলিনী?
আধপথে থামিল কি বাঁশরী মধুর,
বরষায় শুকাল কি শ্যাম সরোবর?
ছেদিয়া মালতী লতা, মাধবী বিতান
করিল কি ধান্যক্ষেত্র অর্থ অভিলাষী?
ভাঙ্গি কবিতার পূত রম্য দেবালয়
বসাল কি হাট কোন ম্লেচ্ছ জমীদার?
না না কবি রুদ্ধদৃষ্টি হয়েছে আমার
প্রসূনে প্রসূনে ভরা মালঞ্চ তোমার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

* সুকবি মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের প্রতি।

# সমালোচনা।

পঞ্চমুখী—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা।—সমালোচ্য পুস্তকখানি পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। পাঁচটি গল্পই যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে একথা বলিতে পারি না—তবে বইখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। লেখকের ভাষার ভঙ্গী এবং নৈপুণ্যই তাহার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থখানিতে এমন একটি সুন্দর নবীনতা আছে যে পড়িতে পড়িতে ইহার দোষের কথা মনেই আসে না। "বিচিত্র বন্ধন" গল্পটি আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহার মধ্যে চরিত্রসৃজনের যে একটা নৈপুণ্য তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রকাশ বাবু যে চিরক্ষুণ্ণ পথ ছাড়িয়া সপত্নির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা মনোরম—বাস্তবিকই ইহা "নারী চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ।" আশা করি প্রকাশ বাবু 'পঞ্চমুখী'র মত ফুলদলে বঙ্গভাষায় উদ্যান সজ্জিত করিবেন।

হজরত মুহম্মদ—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত মূল্য ।০। আরতি হইতে পুনর্মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ বাবু লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক। তিনি যে, নিরপেক্ষ ভাবে এবং শ্রদ্ধার সহিত মোহম্মদ-চরিত্র অঙ্কিত,করিয়াছেন তাহা খুব প্রশংসার বিষয়। পুস্তকটি ক্ষুদ্র হইলেও—মোহম্মদের বিচিত্র জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনা বেশ মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত। বাংলাভাষার মুসলমান লেখকগণ যদি একটি সম্পূর্ণ মোহম্মদ-চরিত্র লেখেন তাহা হইলে বাংলায় একটী অভিনব সামগ্রী হইতে পারে। এবিষয়ে তাঁহারাই কেবল মূল কোরাণ প্রভৃতি হইতে বঙ্গভাষার ভাবরাজ্যে অনেক বহুমূল্য রত্ন উপহার দিতে সক্ষম।

---

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯


# সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ। } ১৩১১। { ১২শ সংখ্যা।


## হীরার কণ্ঠী।

সে মেয়েটি বড় সুন্দরী; তেমন মেয়ের কেরাণী ঘরে জন্মটা যেন বিধির ভ্রম বশতই ঘটিয়াছিল। তাহার বিয়ের পণের টাকা ছিল না, কাহারো নিকট কিছু পাইবার আশা ছিল না, ধনীর ছেলের মন হরণ করিয়া বড় ঘরে প্রবেশেরও কোন সুযোগ ঘটে নাই; অগত্যা তাহাকে একটি ছুটকে কেরাণীর সহিত বিবাহ বন্ধন স্বীকার করিতে হইল!

ইচ্ছামত সাজসজ্জা করিবার উপায়াভাবে সে শাদাসিধা ভাবে থাকিত বটে, কিন্তু বাপের বাড়ী অপেক্ষা নিচু ঘরে পড়িয়া মেয়েদের যে অবস্থা নাও হয় উহার তাই হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের ত আর অন্য জাতকুল নাই, রূপলাবণ্যেই তাহারা ছোট বড়। স্বাভাবিক লজ্জা, অশিক্ষিত-শোভনতা, যে-কোন অবস্থার সহিত বনিবনাও করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণে সামান্য গৃহস্থের বৌকে রাজরাণীর সমকক্ষ করিয়া তোলে।

সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিত যে, আরাম ও বিলাসের জন্যই সে গঠিত, সেই জন্য তাহার সব তাতে কষ্ট; স্বামি-গৃহের দৈন্যে কষ্ট,

আসবাবাদির দুরবস্থার কষ্ট, চাকচিক্য পারিপাট্যের অভাবে কষ্ট ; এই শ্রেণীর অন্য মেয়ের হয়ত এই সব চোখেই পড়িত না, কিন্তু এর জন্যই ইহার মন খারাপ হইয়া মেজাজ বিগড়াইয়া থাকিত।

তাহার মানস পটে সর্ব্বদা নানা চিত্র ভাসিয়া বেড়াইয়া তাহাকে আকুল করিত—বড় বড় দেউড়ীতে সব পোষাক পরা চাকর বাকর বসিয়া ঢুলিতেছে, প্রশস্ত প্রমোদশালার রেশমমোড়া আসবাব, রংচঙে পর্দ্দা, লম্বা লম্বা ঝাড়, চারদিকে দামী টুকিটাকি ছড়ান।

তিন-চার দিনের ময়লা-চাদর-পাতা গোল টেবিলটিতে খাইতে বসিলে যখন তাহাদের একমাত্র ব্যঞ্জনের ঢাকা খুলিয়া স্বামী তৃপ্তির স্বরে বলিত :—বাঃ! চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে! এর চেয়ে ভাল রান্না আর কি হতে পারে?—তখন স্ত্রী স্বপ্নরাজ্যে বড় বড় থানা দিতেছে ; আর ঘরের নক্সাকাটা দেওয়ালের উপর কত রাজা রাণী বন উপবনের মনোরম ছবি, রূপার চক্‌চকে বাসনে সাজান নানা রকমারী মুখ-রোচক সখের খাবার, বড় বড় অতিথি অভ্যাগতের সমাগমে কতরকম আমোদ আহ্লাদ, খোস্ গল্প কল্পনায় আনিতেছে।

তাহার বাহারে কাপড়ও ছিল না, গহনাও না, কিছুই না। অথচ তার স্থির ধারণা যে, সে এই সকলেরই উপযুক্ত, আর কোন জিনিষে তার মনই লাগে না! লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, সকলের বাহবা পাইবে, ইহাই তাহার জীবনের চরম সাধ।

তাহার ছেলেবেলার সহপাঠী এক ধনী বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বাড়ী ফিরিলে এত কষ্টই বোধ হইত যে, তার বন্ধুর ওখানে বড় একটা যাওয়াই হইয়া উঠিত না। আপশোষে আক্ষেপে ঈর্ষায় নৈরাশ্যে সে সেখানে থেকে আসিয়া কত দিন ধরিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর তাহার স্বামী দিগ্বিজয়ী পুরুষের মত বুক



ফুলাইয়া বাড়ী আসিল, তাহার হাতে একটা মস্ত লেফাপা। সে বলিল :

—তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছি।

স্ত্রী তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া, ভিতর হইতে একটি ছাপান কার্ড বাহির করিয়া দেখে তাহার স্বামীর আপিসের বড় সাহেবের বাড়ীতে লোয়াজেল মহাশয় ও ঠাকরুণের নামে নাচের নিমন্ত্রণ। কিন্তু স্বামীর আশানুরূপ আহ্লাদে মাতিয়া ওঠা দূরে থাক, সে বিরক্তি ভাবে কার্ড্‌-খানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিল :—

—এটা নিয়ে কি করতে হবে?

—কেন, প্রিয়ে, আমি ত মনে করেছিলাম তুমি পেয়ে খুসী হবে। তোমার বাইরে যাওয়া বড় একটা ঘটে না, এই একটা সুযোগ—মস্ত সুযোগ! আমি কত করে' এটা যোগাড় করেছি। একার্ড্‌গুল সকলেই চায়, সকলেই পাবার জন্য ধস্তাধস্তি করে, কেরাণীর ভাগ্যে চট্ করে' জোটে না। সেখানে যত বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী সকলকেই দেখ্‌তে পাবে।

স্ত্রী তাহার দিকে চোক রাঙাইয়া খিঁচাইয়া উঠিল :

—গায়ে কি চাপিয়ে সেখানে যাব?

স্বামী সে কথা ভাবে নাই, সে একটু থতমত খাইয়া বলিল :

—কেন? যে কাপড় পরে' থিয়েটারে যাও? সেখানা ত আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগে।

স্ত্রী কাঁদিতেছে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া থামিয়া গেল। তাহার চোখের কোণ হইতে ঠোঁটের কোণ পর্য্যন্ত দু'টি বড় বড় ফোঁটা টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

—কি হয়েছে? কি হয়েছে?—সে থতিয়ে মতিয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

স্ত্রী অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া ভিজে গাল মুছিতে মুছিতে ঠাণ্ডা ভাবে উত্তর করিল,—

—হবে আবার কি ? আমার কাপড়ও নেই, নাচে যাওয়াও হবে না। যার স্ত্রীর ভাগ্য আমার চেয়ে ভাল এমন কোন বন্ধুকে তোমার কার্ডখান দাওগে যাও।

স্বামী হতাশ। শেষে উত্তর করিল :

—দেখাই যাক্ না, মাতীল্‌দ, এই নাচের উপযুক্ত একটা পোষাক করতে কত পড়বে, একটা শাদাসিধা গোচের কিছু, যা এর পর অন্য ব্যবহারে লাগবে।

স্ত্রী খানিক চিন্তা করিল, মনে মনে হিসাবও করিল, কতটা বলিলে তাহার স্বামী আঁৎকাইয়া উঠিয়া পিছাইবে না তাহাও ভাবিল।

শেষে ভয়ে ভয়ে বলিল :

—আমি ঠিক করে' বল্‌তে পাচ্ছিনে, কিন্তু বোধ হয় দু'শ টাকা হলে এক রকম করে' তুল্‌তে পারি।

স্বামী একটু ফ্যাকাসে হইয়া গেল। একটা বন্দুক কিনিয়া জনকতক বন্ধুর সহিত মাঝে মাঝে আমোদ করিয়া শীকারে বাহির হইবে বলিয়া সে ঠিক ঐ টাকাটি জমাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে বলিল,—

—তা বেশ, আমি তোমায় দু'শ' টাকা দেব। দেখ' যেন বেশ মনের মত পোষাকটি হয়।

নাচের দিনও কাছে আসে আর লোয়াজেল ঠাক্‌রুণ কি রকম বিষণ্ণ, বিমর্ষ, ভাবিত হইতে থাকে। অথচ তার পোষাক ত ঠিক হইয়া রহিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার পর স্বামী জিজ্ঞাসা করিল,—

—কি হয়েছে, গো ? ক'দিন থেকে তোমায় যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। স্ত্রী তাতে উত্তর করিল,—

—আমার বড় বিরক্ত লাগছে ; না আছে গয়না, না আছে জহরৎ



গায়ে দেবার কিছুই নেই। আমায় দেখাবে যেন দৈন্যদশার একশেষ হয়েছে। এমন নাচে কি না গেলেই নয় ?

—কেন ? ফুল পর্‌লে ত হয়, এই সময়ে বড় বড় লোকের মধ্যে ফুল পরার খুব রেওয়াজ। টাকা পাঁচকের মধ্যে বেশ বেশ গোলাপ পাওয়া যাবে।

স্ত্রীর তাতে মন উঠিল না।

—না। রাজ্যের ধনীর মাঝখানে গরীবটি সেজে থাকার মত আর বিড়ম্বনা নেই।

স্বামী ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—

দেখ, তুমি কি বোকা ! তোমার বন্ধু ফরেষ্টিয়ে ঠাকরুণের কাছে গিয়ে কিছু গয়না চেয়ে নাওগে না। তার সঙ্গে তোমার এত ভাব, এতে কোন দোষ হবে না।

স্ত্রী উৎফুল্ল স্বরে চীৎকার করিল,—

—ঠিক ত ! সে কথা মনেই হয় নি।

পরদিনই সে বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাহাকে দুঃখের কথা জানাইল। ফরেষ্টিয়ে ঠাকরুণ তার কাচের আলমারী হইতে এক মস্ত গহনার বাক্স বাহির করিয়া তাহা লোয়াজেল ঠাকরুণের সামনে খুলিয়া দিল,—

—তোমার যা কিছু ইচ্ছে বেছে নাও, ভাই।

সে প্রথমে নানারকম হাতের গহনা দেখিল, তাহার পর একটী মুক্তার মালা, পরে একটি সুন্দর কাজকরা জহরৎ বসান সোনার ধুক-ধুকি। একে একে সেগুলি আয়নার সামনে গিয়া গায়ে পরিল, ইতস্তত করিল, ফিরিয়া রাখিতে আর হাত সরে না। থেকে থেকে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—

—আর কিছু নেই ?

—আছে বৈ কি। তোমার কি পছন্দ হবে তা ত বল্‌তে পারিনে, নিজে সব দেখে নাওনা, ভাই।

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কালো রেশম-মোড়া খাপের মধ্যে একা জম্‌কাল হীরারকণ্ঠী হঠাৎ তার চোখে পড়িয়া গেল। লোভের আতিশয্যে তাহার বুক ঢিব্‌ঢিব্‌ করিয়া উঠিল, তুলিয়া লইবার সময়ে হাত কাঁপিতে লাগিল। উচু গলা জামার উপরেই সেটা পরিয়া সে আয়নার সামনে নিজের চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল।

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

—এটি কি আমায় দিতে পারবে? খালি এটি, আমি আর কিছু চাইনে।

—বেশ ত, নেবে বই কি।

সে তৎক্ষণাৎ উচ্ছ্বাস ভরে বন্ধুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে একটি আবেগপূর্ণ চুম্বন করিল, তাহার পর সাধের ধনটি লইয়া বাড়ী মুখে ধাইয়া চলিল।

নাচের দিন উপস্থিত। লোয়াজেল ঠাকরুণের জয় জয় কার। সেই সুশোভিতা হাস্যময়ী আনন্দে উন্মত্তা সুন্দরী সে দিন সকলের উপর টেক্কা দিল। পুরুষগণ সকলেই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, কেহ নাম জিজ্ঞাসা করে, কেহ সাধিয়া আলাপ করিতে আসে, সকলেই উহার সহিত নাচিতে উৎসুক, বড় সাহেবের পর্য্যন্ত নজর পড়িল। নিজের সৌন্দর্য্য চারদিকের বাহবায় বিভোর হইয়া সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নাচিয়া চলিল।

রাত চারটের সময়ে সে বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিল। যাদের স্ত্রীরা আমোদে মাতিয়া রহিয়াছে এমন আর তিনটি ভদ্রলোকের সহিত তাহারও স্বামী পাশের একটি ছোট ঘরে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বাহির হইবার আগে সে স্ত্রীর জন্যে যে গরম উড়ানীটি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল



তাহা গায়ে দিল—নিত্য ব্যবহারের আট পৌরে কাপড়, নাচের নূতন পোষাকটির তুলনায় কত খেলো। স্ত্রী সে কথা বেশ বুঝিল, পাছে শাল দোশালা জড়ান ধনী মেয়েদের দৃষ্টি পড়ে বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পালাইবার চেষ্টা করিল।

লোয়াজেল বাধা দিয়া কহিল,—

—একটু দাঁড়াও, বাহিরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমি একটা গাড়ি ডেকে আনি।

কিন্তু সে শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া সিঁড়ি নাবিয়া গেল। রাস্তার বাহির হইয়া তাহারা গাড়ি পায় না, এ রাস্তা ও রাস্তা খুঁজিয়া বেড়ায়, দূরে চলতি গাড়ি দেখিলেই হাঁকাহাকি করে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এইরূপে অতিকষ্টে তারা নদীর দিকে চলিল! শেষে ঘাটের নিকট তাহারা একটি জীর্ণ শকট পাইল, অনেক রাত্রি ছাড়া পারীনগরে এ রকম ঘড়্‌ঘড়ে গাড়ি দেখাই দেয় না, দিনের বেলা এগুলি যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়া থাকে।

এই গাড়ি তাহাদিগকে বাড়ীর দুয়ারে নামাইয়া দিল। তাহারা বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে নিজ ঘরে উঠিয়া গেল। স্ত্রীর মনে হইতেছিল যেন তার সকলই ফুরাইল। স্বামী ভাবিতেছে কাল দশটার মধ্যে আপিস পৌঁছিতে হইবে।

স্ত্রী গায়ের উড়ানীখানা খুলিয়া নিজের সেই মোহিনী মূর্ত্তি শেষবার দেখিয়া লইবার জন্য একবার আয়নার সামনে দাঁড়াইল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল—গলায় তার সেই হীরার কণ্ঠীটা নাই!

স্বামী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল :—

—তোমার কি হল?

স্ত্রী পাগলের মত তাহার দিকে তাকাইল :—

—আমার গলায়—আমার গলায়—ফরেষ্টিয়ে ঠাকরুণের সেই কণ্ঠিটা আমার গলায় নেই।

স্বামী চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল :—

—কি ? কি বল্লে ? তা হতেই পারে না !

তারা উড়ানীখানা ঝাড়িয়া, পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে দেখিয়া, পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল, কিন্তু পাইল না। স্বামী জিজ্ঞাসা করিল :—

—সেখান থেকে বেরবার সময় তোমার গলায় ছিল, ঠিক জান ত ?

—হাঁ, আমি দেউড়িথেকে বেরবার সময় একবার হাত দিয়ে দেখেছিলাম।

—কিন্তু রাস্তায় পড়লে ত শব্দ হত ; নিশ্চয় গাড়ীতে র'য়ে গেছে।

—তা হতেও পারে, নম্বরটা কি দেখে' রেখেছিলে ?

—না, তুমি কি নজর কর নি ?

—না।

তারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ী করিতে লাগিল। শেষে লোয়াজেল আবার কাপড় চোপড় পরিয়া লইয়া বলিল,—

—আমি যাই, গাড়ি খুঁজতে যে পথটা হেঁটেছিলাম সেটার আগা-গোড়া খুঁজে আসিগে যাই।

সে ঘর হইতে বাহির হইল। স্ত্রী হতভম্ব হইয়া নাচের পোষাকেই সেই ঠাণ্ডায় এক চৌকীর উপর কুঁকড়ী সুঁকড়ী মারিয়া বসিয়া রহিল—তাহার শুইতে যাইবার ও শক্তি ছিল না, চিন্তা করিবার ও শক্তি ছিল না।

সকাল ৭ টার সময় স্বামী ফিরিল ; সে কিছুই পায় নাই।

তারপর থানায় খবর দিল, যত খবরের কাগজের আপিসে পুরস্কার কবুলের বিজ্ঞাপন দিল, গাড়ির আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিল, যেখানে বিন্দু-মাত্র আশা দেখিল সেখানেই দৌড়িল।



এই আসন্ন সর্ব্বনাশের মুখে স্ত্রী সমস্তদিন সেইরূপ হতাশ অবশ ভাবে কাটাইল।

লোয়াজেল রাত্রে বাড়ী ফিরিল, ফ্যাকাসে, গাল-বসা। সে কিছুই পায় নাই। সে বলিল :—

—তোমার বন্ধুকে লেখ যে, তার কণ্ঠির কবজাটা ভেঙ্গে গেছে, মেরামত করিয়া পাঠান যাচ্চে। তাহলে এদিক ওদিক দেখবার সময় পাওয়া যাবে।

স্ত্রী তার কথামত লিখিয়া দিল।

সপ্তাহের শেষে তাদের আশা ভরসা সবই গেল। লোয়াজেলের যেন আয়ুর ৫ বৎসর ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। সে বলিল :—

—ও রকম আর একটা যোগাড় করে' দেবার চেষ্টা দেখতে হয়।

সেই কণ্ঠির খাপের মধ্যে যে দোকানের নাম লেখা ছিল, পরদিন তারা সেখানে গেল। স্যাকরা বহি উলটিয়া বলিল :—

—আমি ত কোন কণ্ঠি বেচিনি, মশায়। আমি খাপ তৈরী করে' দিয়েছিলাম।

সেখান হইতে তাহারা এ দোকান সে দোকান করিয়া সেই কণ্ঠির জোড়া খুঁজিতে লাগিল। মনের কষ্টে দু'জনেই পাগল প্রায়।

শেষে মহাজন পটিতে এক মস্ত দোকানে তাহারা এক হীরার গহনা দেখিল উহা উভয়েরই অবিকল সেইটার মত মনে হইল। সেটার দাম বিশ হাজার টাকা, কিন্তু দোকানদার আঠার হাজারে দিতে সম্মত হইল।

তাহারা দোকানদারকে উহা তিন দিন আট্‌কাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিল, তাহার সহিত চুক্তি হইল যে এক মাসের মধ্যে হারটা পাওয়া গেলে এটা সতের হাজারে ফেরৎ লইবে।

লোয়াজেলের পিতা নয় হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। বাকি? বাকি ধার করিতে হইবে।

কাজেই সে ধার করিতে বসিল। কোথাও হাজার, কোথাও পাঁচশ, কারো কাছে পঞ্চাশ, কারো কাছে পঁচিশ। খৎ লিখিয়া দিল, সর্ব্বনেশে সব সর্ত্তে দস্তখৎ করিল, রাজ্যের সুদখোরের সহিত কারবার ফাঁদিল। অবশেষে জীবনের শেষাংশ একপ্রকার বন্ধক রাখিয়া, ভবিষ্যৎ ভাবনায়, আসন্ন দৈন্যের করাল ছায়ায়, অতঃপরে দৈনন্দিন খাওয়া পরার কষ্ট ও উৎকট মানসিক অশান্তির আতঙ্কে একান্ত অবসন্ন হইয়া সে সেই হীরার কণ্ঠী কিনিতে গেল, এবং দোকানদারকে আঠার হাজার টাকা গুণিয়া দিল।

লোয়েজেল ঠাকরুণ যখন ফরেষ্টিয়ে ঠাকরুণকে কণ্ঠীটি লইয়া দিয়া আসিল, সে একটু বিরক্তির সহিত বলিল:

—তোমার আরো আগে ফেরত দেওয়া উচিত ছিল, আমরা যদি এর মধ্যে দরকার হ'ত?

লোয়াজেল ঠাকরুণের বড় ভয় ছিল পাছে তার বন্ধু বদল বুঝিতে পারে, তাহা হইলে না জানি কি মনে করিবে, কি বলিবে, শেষ্টা কি নেহাৎই চোর ঠাওরাইবে? কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে খাপখানা খুলিয়াই দেখিল না।

এখন হইতে লোয়াজেল ঠাকরুণ খাঁকতির বিষম যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রথম থেকেই মন বাঁধিয়া সাধ্বীর মত ঘাড় পাতিয়া বোঝা তুলিয়া লইল। সর্ব্বনেশে দেনাটা না শুধিলেই নয়, সে পণ করিল যে যেমন করিয়াই হোক সে শুধিবেই। তাহারা চাকর বাকর ছাড়াইয়া দিল, বাসা বদলাইয়া চীলের ছাতের একটি ছোট ঘর ভাড়া লইল।

ক্রমে লোয়াজেল ঠাকরুণ ঘরকন্নার নিম্নতম কার্য্য সকলের সহিত



পরিচয় লাভ করিল। বাসন মাজিতে মাজিতে তাহার সুন্দর নখগুলির গোলাপী আভা কোথায় চলিয়া গেল। তাহাকে ময়লা কাপড় কাচিয়া দড়ীর উপর শুখাইতে দিতে হইত; বাড়ীর যত আবর্জ্জনা বহিয়া রাস্তায় ঢালিয়া দিয়া আসিতে হইত; আবার জল লইয়া প্রত্যেক সিঁড়িতে দম লইতে লইতে উপরে উঠিতে হইত। ইতর স্ত্রীলোকের মত বেশে তাহাকে চুবড়ী হাতে মুদি তরকারীওয়ালা মাংসওয়ালার দোকানে যাইতে হইত, দর কষাকষি করিতে হইত, কড়া কথা বর্দ্দাস্ত করিতে হইত, আধ্‌লা গুণিয়া গুণিয়া খরচ করিতে হইত।

ফী মাসে কোন না কোন খতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইত, তখন হয় টাকা ফেলিয়া দিতে হইত, নয় খৎ বদলাই করিতে হইত নয় কাঁদাকাটি করিয়া সময় লইতে হইত।

স্বামী, সন্ধ্যার পর এক মহাজনের খাতা লিখিয়া দিয়া কিছু রোজগার করিত। এবং অনেক সময়ে রাত জাগিয়া পৃষ্ঠায় পাঁচ পয়সা হিসাবে কাগজ নকল করিয়া দিত।

এই জীবন দশ বৎসর ধরিয়া চলিল।

এই দশ বৎসর পর তাহারা দেনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, সমস্ত, মায় সুদখোরের সুদ, সুদের সুদ পর্য্যন্ত।

লোয়াজেল ঠাকরুণকে দেখিলে মনে হয় যেন তিন কাল গিয়াছে। হীন অবস্থার স্ত্রীলোকগুলর মত তাহার শরীরে দড়া পাকাইয়া গিয়াছে, হাতে কড়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা এলোমেলো, অপরিষ্কার, যেমন তেমন পরিচ্ছদ, ধুপধাপ চলন, কর্কশ-কণ্ঠে বকাবকি। কিন্তু মাঝে মাঝে, স্বামী যখন আপিসে, সে জানলার ধারে আনমনে বসিয়া বহুদিন পূর্ব্বের সেই এক রাত্রির কথা ভাবিত, যে দিন তাহাকে এত সুন্দর দেখাইয়াছিল, যে দিন সে আনন্দে এত মাতোয়ারা হইয়াছিল।

কণ্ঠী না হারাইলে এতদিন না জানি কি হইত? কে জানে?

কে বলিতে পারে? জীবনের কি অদ্ভুত হেরফের, কত অল্পতে সর্ব্বনাশ, কত অল্পতে রক্ষা!

একদিন রবিবারে সপ্তাহের খাটনির পর লোয়াজেল ঠাকরুণ একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একটি স্ত্রীলোক ঠেলাগাড়িতে একটি ছেলে লইয়া চলিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটি ফরেষ্টিয়ে ঠাকরুণ, এখনো যুবতী, এখনো সুন্দরী।

লোয়াজেল ঠাকরুণ উতলা হইয়া পড়িল। উহার সঙ্গে কি কথা কহিবে? না কহিবেই বা কেন? এখন ত সে কণ্ঠির দাম চুকান হইয়া গিয়াছে, সে সব বৃত্তান্ত এখন বলা যাইতে পারে। দোষ কি? সে নিকট ঘেষিয়া গেল:

—কি খবর, সই?

অপরটি চিনিতেই পারিল না, একটি সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে এরূপ ঘনিষ্টভাবে সম্বোধন করায় সে একটু ভেব্‌ড়িয়া গিয়া কহিল:

—আপনি, আমি ত আপনাকে—আপনি বোধ হয় কিছু ভুল করছেন।

—না, আমি মাতীন্দ্‌ লোয়াজেল

তাহার বন্ধু চম্‌কিয়া উঠিল:

—আহা! মাতীন্দ্‌, সইরে, তুমি কি বদ্‌লে গেছ!

—হাঁ তোমার সঙ্গে শেষ দেখার পর আমার বড় দুঃসময়, বড় কষ্টের দিন গেছে—আমার সে সবই তোমার জন্যে!

—আমার জন্যে? সেকি?

—তোমার সে হীরের কণ্ঠীটার কথা মনে আছে, যেটা আমাকে বড় সাহেবের বাড়ীর নাচের দিন পরতে দিয়েছিলে?

হাঁ, তার কি?

—সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।



—সে কি রকম? সেটা ত ফেরৎ দিয়ে গিয়েছিলে।

—আমি ঠিক সে রকম আর একটা কিনে দিয়েছিলাম, তার দাম এই দশ বছর ধরে চুকচ্ছি। বুঝতেই ত পার আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা বড় সোজা নয়, আমাদের ত আর কিছু ছিল না। যাহোক সে সব এখন চুকে বুকে গেছে, এখন নিশ্চিন্ত হয়েছি।

—তুমি বল্‌ছ যে, আমার সেটার বদলে একটা হীরের কণ্ঠী কিনে দিয়েছিলে?

—হাঁ, তুমি টের পাওনি, না? ঠিক সেটার জোড়া ছিল।—এই কথা বলিতে বলিতে সে একটু শাদাসিদা অহঙ্কারের হাসি হাসিল।

ফরেষ্টিয়ে ঠাকরুণ মর্ম্মান্তিক বেদনাভরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

—মরে যাই মাতীন্দ্‌ রে, আমার সেটা ঝুটো ছিল। তার দাম জোর আড়াইশ' টাকার বেশী হবে না!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# প্রার্থনা।*

হে পরমপিতঃ হে পিতৃতম পিতৃণাম্‌, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য দশদিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহুতাশনের ঊর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে

* স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

কি শান্তিতে, কি অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্ত কল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগ্নিগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি!

আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ



হইয়াছিলেন—আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতি রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন; অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বাধাহীন, ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চ্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সময় তাহাদের মত অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চরিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, শান্তসংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিষস্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন

করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়িবন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল—তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি



আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই;—ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেশনশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেম্‌নি ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনিদরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল, তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে—ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কি পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা

আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্ম্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্ম্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্ম্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই —ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া, সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই! পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না,—ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদ-বিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্ একদিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ



লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অদ্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনবানের উর্দ্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির উর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন করিব!

হে বিশ্ববিধাতা, আজ আমাদের সমস্ত বিবাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও! সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপমমৃতং" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময় এই সমস্ত পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্য্যের কোনো ক্ষয় নাই—তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক্!

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধীরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং ঊষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক্, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে

মধু হউক, সূর্য্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।*

আমরা যাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনার জন্য আজ এই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা একান্ত কঠিন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপরিষদের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সেই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু পারিভাষিক হিন্দুধর্ম্ম বা পারিভাষিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। এবং পরম আহ্লাদের বিষয় যে, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,—দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্ম্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও উর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে

* গত ২২শে মাঘ জেনেরেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ হলে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত শোকসভায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক পঠিত। (বঙ্গদর্শন)





ধরিয়া আছে, আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে উর্দ্ধে দেবলোকে; ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানব সমাজে কর্ম্মরূপ ফুলফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মানবজীবনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি ধর্ম্মের তথায় অধিকার; সাহিত্যে মানবজীবনের স্ফূর্ত্তি; অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্ম্মের অভিপ্রায়—সাহিত্য লোকস্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়,—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শসাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহার সম্পাদনার্থ যে কিছু লৌকিক সাহিত্য বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষেয় বাণীর স্মৃতি ও অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্চ্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার করধৃত-পুস্তক-মধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়কালে মহাবরাহের দ্রংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম্ম তখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরা সমাজতরণী যখন স্বদেশের অজ্ঞানে ও বিদেশের অনাচারে

হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকস্থিতির আনুকূল্যের জন্য সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তর স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জা বোধ করি না, আমরা স্বদেশীকে বিদেশীর ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই এই অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্ব্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজ জীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই আশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই জানেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সেদিন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না; এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিরূপে দেখিতে পাই। অন্য উদাহরণের উল্লেখের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে ভাবের আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত



ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা-দুর্যোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যক্‌ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযমই ভারতসমাজের প্রধান লক্ষণ। আমরা যাঁহার তিরোভাবে শোকপ্রকাশের জন্য অদ্য এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারতসমাজের নেতা মহর্ষিগণেরই সন্তান ছিলেন, ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমই তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণস্বরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্যক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' যে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই, 'সার সত্যের আলোচনা'য় তাহা সংযমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'মানসী'র স্বাতন্ত্র্য 'স্বদেশী সমাজ'এর কল্যাণপ্রদ সংযমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করুক। তিনি যে মনস্বী পুত্রগণে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরণচিহ্ন আমাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবি হইয়া বঙ্গভারতীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করুন।

---

# শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি।

## ৬। পীতাম্বর দাস।

পীতাম্বর দাস গোপাল দাসের পুত্র, "রসমঞ্জরী" নামক সংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা। সেই গ্রন্থে তিনি আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি জাহার॥
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাথর্য্য মাধুর্য্য সাম্য গুনহয় জাহার॥
বামা দক্ষিণা ধীরাদি বিভেদ।
বিপ্রলব্ধ সম্ভোগ তাহার উদ্ভেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে জন্মএ।
আটঅট্টে চৌষট্টি তাহার ভেদ হএ॥
"রসকল্পবল্লী" গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিলা মোকে॥
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টাদশ মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, পীতাম্বরের গুরুর নাম শ্রীশচীনন্দন ঠাকুর; শ্রীখণ্ড নামক স্থানে তাঁহার নিবাস; তাঁহার পিতার রসকল্পবল্লী নামক এক গ্রন্থ ছিল, তিনি সেই গ্রন্থের অষ্টম কোরক অবলম্বন করিয়া তাঁহার রসমঞ্জরী গ্রথিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গোপালদাস বংশীয় শ্রীখণ্ডের শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বংশ তালিকা



অনুসন্ধান করিয়াও জানিয়াছি যে, তিনি গোপালদাসের পুত্র এবং জাতিতে বৈদ্য।

"রসমঞ্জরী" সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একটী সুপরিচিত গ্রন্থ। সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী "সাহিত্য পরিষদ" হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার মতে সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথমে মিথিলাবাসী গণপতি নাথের পুত্র ভানুদত্ত এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ভারতের পণ্ডিত সমাজে সর্ব্বত্র সেই গ্রন্থ সমাদৃত হয়। এইজন্য বিভিন্ন দেশবাসী আলঙ্কারিকগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের বহুটীকা টিপ্পনি প্রকাশ করিয়াছেন,—তন্মধ্যে অনন্ত পণ্ডিত রচিত বঙ্গার্থ কৌমুদী, আনন্দ শর্ম্মা রচিত বঙ্গার্থদীপিকা, নাগেশ ভট্টের রসিক-রঞ্জিনী, ব্যোপদেবের রসমঞ্জরীবিকাশ, শেষচিন্তামণিররসমঞ্জরী; পরিমল প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখ যোগ্য।

সেই আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় রসমঞ্জরী রচনা। ভারতচন্দ্রের ও পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীই তাহার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

রসমঞ্জরী গ্রন্থে :—

১। অভিসারিকা ও অভিসারের প্রকার ভেদ।
২। অষ্টবিধ বাসকসজ্জা।
৩। অষ্টবিধ উৎকণ্ঠিতা।
৪। অষ্টবিধ বিপ্রলব্ধা।
৫। অষ্টবিধ কলহান্তরিতা।
৬। অষ্ট প্রকার স্বাধীন ভর্তৃকা।
৭। প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি

নায়ক নায়িকার বিচিত্র প্রণয়লীলা, সংস্কৃত মৈথিল ও বঙ্গীয় কমলাকান্ত পদাবলীর উদাহরণ সহযোগে বর্ণিত হইয়াছে।

রায় গুণাকরের রসমঞ্জরী পীতাম্বরদাসের "রসমঞ্জরী" অপেক্ষা

অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সুন্দর রচনা কৌশলে অদ্ভুত শাব্দিকতায় ভা
চন্দ্রের "রসমঞ্জরীর" তুলনা নাই—বিশেষত' সমস্ত বর্ণনা ও উদা
তাঁহার স্বরচিত। কিন্তু ভাবগ্রাহীতায় পীতাম্বর শ্রেষ্ঠ। রচনা তাঁ
নিজস্ব নহে, তিনি উদাহরণোপযোগী সুন্দর সুন্দর পদপ্রসূন
বৈষ্ণব সাহিত্যের অমরনন্দনকানন হইতে চয়ন করিয়া যথাস্থ
সুশোভিত করিয়াছেন। এমন করিয়া বিষয়
কবিদিগের মধ্যে বিরল এবং সংকলয়িতার
নহে। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি পদ রচনা ক

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে যথাক্রমে রস
গীতাবলী, কাব্যসন্তোষ, ভগবতের দশমস্কন্ধ, গীত গোবিন্দ, রসকদ
পদাবলী সঙ্গীত শেখর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, এবং কৃষ্ণমঙ্গ
গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন, গোপাল দাস, রাধিকাদা
কবিশেখর, পুরন্দর খাঁন, ও ঘনশ্যাম দাসের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পীতাম্বর দাসের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় দ্বারান্তরে বলিবার ই
রহিল।

শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

---

# নিত্য প্রেম।

"প্রেম পৃথিবীকে স্বর্গ করে"—"মানুষকে দেবতা করে"—এইরূ
প্রেমের স্তুতিগান বহুদিন হইতে শুনিয়া শুনিয়া আমাদের এমনি অব
জন্মিয়াছে যে আমরা প্রেমের নামেই বিকল হইয়া পড়ি, তাহার প্রকৃ
বিচারের চিন্তাকেও আমরা মনে স্থান দিতে সাহস করি না।

এইরূপে অতি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়লালসা প্রকৃত প্রেমের পুণ্য সিংহাস
কলঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।